আমরা সবাই একসঙ্গে

রমাপদ চৌধুরী

রামায়ণী প্রকাশ ভবন

১০৬।১, আমহার্স্ট স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
১লা, বৈশাখ ১৩৬০

প্রকাশক
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
১০৬।১, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

মূল্য দশ টাকা

নতুন দিনের গল্পলেখকদের

এই লেখকের

এখনই

লালবাঈ

বনপলাশির পদাবলী

প্রথম প্রহর

গল্প-সমগ্র

ভারতবর্ষ

ফৌজী সংকেতে নাম ছিল বি এফ থ্রি-থার্টিটু। BF332। সেটা আদপে কোন স্টেশনই ছিল না, না প্লাটফর্ম, না টিকিটঘর। শুধু একদিন দেখা গেল ঝকঝকে নতুন কাঁটাতার দিয়ে রেললাইনের ধারটুকু ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ব্যস্, ঐটুকুই। সারাদিনে আপ ডাউনের একটা ট্রেনও থামত না। থামত, শুধু একটি বিশেষ ট্রেন। হঠাৎ এক একদিন সকালবেলায় এসে থামত। কবে কখন সেটা থামবে, তা শুধু আমরাই আগে থেকে জানতে পেতাম, বেহারী কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমরা পাঁচজন।

স্টেশন ছিল না, ট্রেন থামত না, তবু রেলের লোকদের মুখে মুখে একটা নতুন নাম চালু হয়ে গিয়েছিল। তা থেকে আমরাও বলতাম 'আণ্ডাহল্ট্'।

আণ্ডা মানে ডিম। আণ্ডাহল্টের কাছ ঘেঁষে দুটো বেঁটেখাটো পাহাড়ী টিলার পায়ের নীচে একটা মাহাতোদের গ্রাম ছিল, গ্রামে-ঘরে মুর্গী চরে বেড়াত। দূরে অনেক দূরে ভুরকুণ্ডার শনিচারী হাটে সেই মুর্গী কিংবা মুর্গীর ডিম বেচতেও যেত মাহাতোরা। কখন সাধের মোরগ বগলে চেপে মোরগ-লড়াই খেলতে যেত। কিন্তু সেজন্য বি এফ থ্রি-থার্টিটুর নাম আণ্ডাহল্ট হয়ে যায় নি।

আসলে মাহাতো গাঁয়ের ডিমের ওপর আমাদের কোন লোভই ছিল না।

আমাদের ঠিকাদারের সঙ্গে রেলওয়ের ব্যবস্থা ছিল, একটা ঠেলা-ট্রলিও ছিল তার, লাল শালু উড়িয়ে সেটা রেলের ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে এসে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে যেত। নামিয়ে দিয়ে যেত রাশি রাশি ডিম। বেহারী কুক ভগোতীলাল আগের রাত্রে সেগুলো সেদ্ধ করে রাখত।

কিন্তু সেজন্যেও নাম আণ্ডাহল্ট্ হয় নি। হয়েছিল ফুলবয়েল্ড্ ডিমের খোসা কাঁটাতারের ওপারে ক্রমশ স্তূপীকৃত হয়ে জমছিল বলে। ডিমের খোসা দিনে দিনে পাহাড় হচ্ছিল বলে।

ফৌজী ভাষায় বি এফ থ্রি-থার্টিটুর প্রথমেই যে দুটো অ্যালফাবেট,

আমাদের ধারণা ছিল তা কোন সংকেত নয়, ব্রেকফাস্ট কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ।

রামগড়ে তখন পি ও ডবলু ক্যাম্প, ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীরা সেখানে বেরনেটে আর কাঁটাতারে ঘেরা। তাদেরই মাঝে মাঝে একটা ট্রেনে বোঝাই করে এ-পথ দিয়ে কোথায় যেন চালান করে দিত। কেন এবং কোথায় আমরা কেউ জানতাম না।

শুধু আমরা খবর পেতাম ভোরবেলায় একটা ট্রেন এসে থামবে।

ঠিকাদারের চিঠি পড়ে আগের দিন ডিমের ঝুড়িগুলো দেখিয়ে কুক ভগোতীলালকে বলতাম, তিনশো তিশ ব্রেকফাস্ট।

ভগোতীলাল গুণে গুণে ছ'শো ষাট আর গোটা পঁচিশ ফাউ বের করে নিত। যদি পচা বের হয়। তারপর সেগুলো জলে ফুটিয়ে শক্ত ইট হয়ে গেলে তিনটে সার্ভার কুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোসা ছাড়াত।

কাঁটাতারের ওপারে সেগুলোই দিনে দিনে স্তূপীকৃত হত।

সক্কালবেলায় ট্রেন এসে থামত, আর সঙ্গে সঙ্গে কামরা থেকে ট্রেনের দু পাশে ঝুপঝাপ নেমে পড়ত মিলিটারী গার্ড। সঙ্গীন উঁচু করা রাইফেল নিয়ে তারা যুদ্ধবন্দীদের পাহারা দিত।

ডোরাকাটা পোশাকের বিদেশী বন্দীরা একে একে কামরা থেকে নেমে আসত বড়সড় মগ আর এনামেলের থালা হাতে।

দুটো বড় বড় ড্রাম উল্টে রেখে সে দুটোকেই টেবিল বানিয়ে সার্ভার কুলি তিনজন দাঁড়াত। আর ওরা লাইন দিয়ে একে একে এগিয়ে এসে ব্রেকফাস্ট নিত। একজন কফি ঢেলে দিত মগে, একজন দু পিস করে পাঁউরুটি দিত. আরেকজন দিত দুটো করে ডিম। ব্যস্, তারপর ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠত। কাঁধে আই ই, খাকি বুশ-সার্ট পরা গার্ড হুইস্‌ল্ দিত, ফ্ল্যাগ নাড়ত, ট্রেন চলে যেত।

মাহাতোরা কেউ কাছে আসত না, দূরে দূরে ক্ষেতিতে জনারের বীজ রুইতে রুইতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে দেখত।

ট্রেন চলে যাওয়ার পরে ভগোতীলালের জিম্মায় টেন্ট রেখে আমরা কোন কোনদিন মাহাতোদের গ্রামের দিকে চলে যেতাম সব্জীর খোঁজে। পাহাড়ের ঢালুতে পাথুরে জমিতে ওরা সর্ষে বুনত, বেগুন আর ঝিঙেও।

আওাহল্ট্, একদিন হল্ট-স্টেশন হয়ে গেল রাতারাতি। মোরম ফেলে

লাইনের ধারে কাঁটাতারে ঘেরা জায়গাটুকু উঁচু করা হল প্লাটফর্মের মত।

তখন আর শুধু পি ও ডবলু নয়, মাঝে মাঝে মিলিটারী স্পেশালও এসে দাঁড়াত। গ্যাবার্ডিনের প্যাণ্ট-পরা হিপ পকেটে টাকার ব্যাগ গোঁজা আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল। মিলিটারী পুলিস ট্রেন থেকে নেমে পায়চারী করত, দু একটা ঠাট্টাও ছুঁড়ত, আর সৈনিকের দল তেমনি সারি দিয়ে মগ আর থালা হাতে একে একে এসে রুটি নিত, ডিম নিত, মগ ভর্তি কফি। তারপর যে-যার কামরায় গিয়ে আবার উঠত, খাকি বুশ-সার্টের গার্ড হুইসল বাজিয়ে ফ্ল্যাগ নাড়ত, আমি ছুটে গিয়ে সাপ্লাই ফর্মে মেজরকে দিয়ে ও কে করাতাম।

ট্রেন চলে যেত, কোথায় কোনদিকে আমরা কেউ জানতে পারতাম না।

সেদিনও এমনি আমেরিকান সোলজারদের ট্রেন এসে দাঁড়াল। সার্ভার কুলি তিনটে ডিম রুটি কফি সার্ভ করছিল। ভগোতীলাল নজর রাখছিল কেউ ডিম পচা কিংবা রুটি স্লাইস-এণ্ড বলে ছুঁড়ে দেয় কিনা।

ঠিক সেই সময় আমার হঠাৎ চোখ গেল কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে।

কাঁটাতার থেকে আরো খানিক দূরে নেংটি-পরা মাহাতোদের একটা ছেলে চোখ বড় বড করে তাকিয়ে দেখছে। কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা ছেলেটাকে একটা বাচ্চা মোষের পিঠে বসে যেতে দেখেছি একদিন।

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল ট্রেনটা। কিংবা রাঙা-মুখ আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিল।

একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ 'হে-ই' বলে চিৎকার করল, আর সঙ্গে সঙ্গে নেংটি-পরা ছেলেটা পাঁই পাঁই করে ছুটে পালাল মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে। কয়েকটা আমেরিকান সৈনিক তখন হা হা করে হাসছে।

ভেবেছিলাম ছেলেটা আর কোনদিন আসবে না।

মাহাতোরা কেউ আসত না, কেউ না। ক্ষেতিতে কাজ করতে করতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা শুধু অবাক অবাক চোখ মেলে দূর থেকে দেখত।

কিন্তু তারপর আবার যেদিন ট্রেন এল, ট্রেন থামল, সেদিন আবার দেখি কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা কাঁটাতারের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আরেকটা ছেলে, তার চেয়ে আরেকটু বেশী বয়েস। গলায় লাল সুতোয় ঝুলোন দস্তার তাবিজ, ভুরকুণ্ডার হাটে একদিন গিয়েছিলাম,

রাশি রাশি বিক্রী হয় মাটিতে ঢেলে, রাশি রাশি সিঁদুর, তাবিজ, তামার পিতলের দস্তার, বাঁশে ঝোলান থাকে রঙিন সুতলি পুঁতির মালা। একটা ফেরিওলাকে দেখেছি কখনও কখনও এক হাঁটু ধুলো নিয়ে, কাঁধে অগুন্তি পুঁতির ছড়, দুর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে যায়।

ছেলে দুটো অবাক অবাক চোখ মেলে কাঁটাতারের ওপারে দাঁড়িয়ে আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিল। প্রথম দিনের বাচ্চাটার চোখে একটু ভয়, হাঁটু তৈরি, কেউ চোখে একটু ধমক মাখালেই সে চট করে হরিণ হয়ে যাবে।

আমি হাতে ফর্ম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলাম, সুযোগ পেলে হেসে হেসে মেজরকে তোয়াজ করছিলাম। একজন সৈনিক তার কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে ছেলে দুটোকে দেখে পাশের জি আইকে বললে, অফুল!

আমার এতদিন মনে হয় নি। ওরা তো দিব্যি ক্ষেতে খামারে কাজ করে. গুলতি নয়ত তীরধনুক নিয়ে খাটাস মারে, নাটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার মত কখনও টানটান হয়ে রুখে দাঁড়ায়। নেংটি-পরা সরু শরীর, কালো, রুক্ষ। কিন্তু ব্যাটা জি আই-এর 'অফুল' কথাটা যেন আমাকে খোঁচা দিল। ছেলে দুটোর ওপর আমার খুব রাগ হল।

সৈনিকদের কে একজন গলা ছেড়ে এক কলি গান গাইল, দু একজন হা হা করে হাসছিল, একজন চটপট কফির মগে চুমুক দিয়ে সার্ভার কুলিটাকে চোখ মেরে আবার ভর্তি করে দিতে বললে। গার্ড এগিয়ে দেখতে এল আর কত দেরী। পাঞ্জাবী গার্ড কিন্তু দিব্যি চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বললে মেজরের সঙ্গে।

তারপর হুইস্‌ল বাজল, ফ্ল্যাগ নড়ল, সবাই চটপট উঠে পড়ল ট্রেনে হাতে চওড়া লাল ফিঁতে বাঁধা মিলিটারী পুলিসরাও।

ট্রেন চলে গেলে আবার সেই শূন্যতা, ধূ ধূ বালির মধ্যে ফণিমনসার গাছের মত শুধু সেই কাঁটাতারের বেড়া।

দিনকয়েক পরেই আবার একটা ট্রেন এল। এবার পি ও ডবলু গাড়ী, ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীরা রামগড় থেকে আবার কোথাও চালান হচ্ছে। কোথায় আমরা জানতাম না, জানতে চাইতাম না।

ওদের পরনে স্ট্রাইপ দেওয়া অন্ত পোশাক, মুখে হাসি নেই, রাইফেল উঁচিয়ে সারাক্ষণ ওদের ট্রেনটা চারিদিক থেকে গার্ড দেওয়া হত। আমাদেরও

একটু ভয়-ভয় করত। ভুয়কুণ্ডায় গল্প শুনে এসেছিলাম, একজন মাঝি ধুতিপাঞ্জাবী পরে পালাবার চেষ্টা করেছিল, পারে নি। বাঙালী বলেই আমার আরও ভয় ভয় করত।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম, কাঁটাতারের ওপারে শুধু সেই বাচ্চা ছেলে দুটো নয়, খাটো কাপড়ের একটা বছর পনেরর মেয়ে, দুটো পুরুষ ক্ষেতের কাজ ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন চলে যাওয়ার পর ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করল, হাসল, কলকল করতে করতে ঝর্ণার জলের মত মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে চলে গেল।

একজন, দুজন, পাঁচজন—সেদিন দেখি জন দশেক মাহাতো-গাঁয়ের লোক ট্রেন আসতে দেখেই মাঠ থেকে দৌড়তে শুরু করেছে। ট্রেনের জানলায় জানলায় খাকি রঙ দেখেই বোধহয় ওরা বুঝতে পারত। দিনে দুখানা প্যাসেঞ্জার মেল ট্রেনের মত হুস্ করে বেরিয়ে যেত, দু একখানা গুড্স্ ট্রেন ঠুং ঠুং করতে করতে। তখন তো কই থামবে ভেবে মাহাতো-গাঁয়ের লোক আসত না ভিড় করে!

একদিন গিয়ে বলেছিলাম মাহাতো বুড়োকে, লোক পাঠিয়ে আমাদের আণ্ডাহন্টের তাবুতে বেচে আসতে সব্জী আর চিংড়ি, সরপুটি, মৌরলা।

বুড়ো হেসে বলেছিল—ক্ষেতির কাজ ছেড়ে যাবো নাই।

তাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কাল কাল নেংটি-পরা লোকগুলোকে, খাটো শাড়ির মেয়েগুলোকে। শুধু খালি গা মাহাতো বুড়োর পায়ে একটা টাঙি জুতো, গেঁদা মৃধার কাছে বানান টাঙি জুতো, এসে সারি দিয়ে ওরা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে দাঁড়াল।

ট্রেন ততক্ষণে এসে গেছে। ঝুপঝাপ নেমে পড়ে আমেরিকান সৈনিকের দল সারি দিয়ে চলেছে মগ আর থালি হাতে।

দু শো আঠারো ব্রেকফাস্ট তখন রেডি বি এফ থ্রি-থার্টিটুতে। বি এফ থ্রি-থার্টিটু মানে আণ্ডাহন্ট।

তখন একটু শীত শীত পড়তে শুরু করেছে। দূরের পাহাড়ে কুয়াশার মাফলার জড়ান। গাছগাছালি শিশির ধোঁয়া সবুজ।

একজন সৈনিক ইয়াঙ্কি গলায় মুগ্ধতা প্রকাশ করল।

আরেকজন কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁটাতারের ওপারের রিক্ততার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ কফির মগটা ট্রেনের পা-দানিতে রেখে

সে হিপ পকেটে হাত দিল। ব্যাগ থেকে একটা চকচকে আধুলি বের করে ছুঁড়ে দিল মাহাতোদের দিকে।

ওরা অবাক হয়ে সৈনিকটার দিকে তাকাল, কাঁটাতারের ভিতরে মোরমের ওপর পড়ে থাকা চকচকে আধুলিটার দিকে তাকাল, নিজেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই রইল।

ট্রেনটা চলে যাবার পর ওরা নিঃশব্দে ফিরে চলে যাচ্ছিল দেখে আমি বললাম, সাহেব বখশিস দিয়েছে, বখশিস, তুলে নে।

সবাই সকলের মুখের দিকে তাকাল, কেউ এগিয়ে এল না।

আমি আধুলিটা তুলে মাহাতো বুড়োর হাতে দিলাম। সে বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর সবাই নিঃশব্দে চলে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই।

আমার এই ঠিকাদারের তাঁবেদারি একটুও ভাল লাগত না। জনমনুষ্য নেই, একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ায় না, তাঁবুতে ভগোতীলাল আর তিনটে কুলি। নির্জন, নির্জন। মাটি রুক্ষ, দুপুরের আকাশ রুক্ষ, আমার মন।

মাহাতো গাঁয়ের লোকরাও কাছে ঘেঁষত না। মাঝে মাঝে গিয়ে সব্জী কিংবা চুনো মাছ কিনে আনতাম। ওরা বেচতে আসত না, কিন্তু ভুবকুণ্ডার হাটে যেত তিন ক্রোশ পথ হেঁটে।

দিনকয়েক কোন ট্রেনের খবর ছিল না। চুপচাপ, চুপচাপ।

হঠাৎ সেই কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা একদিন এসে জিগ্যেস করল, টিরেন আসবে না বাবু?

হেসে ফেলে বললাম, আসবে, আসবে।

ছেলেটার আর দোষ কি, বেঁটে বেঁটে পাহাড়, রুক্ষ জমি, একটা দেহাতী ভিড়ের বাস দেখতে হলেও দু ক্রোশ হেঁটে যেতে হয় খয়ের গাছের ঝোপের মধ্যে দিয়ে। সকালে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন একটুও স্পীড না কমিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে যেত, বিকেলের ডাউন ট্রেনটাও থামত না, তবু কয়েক মহূর্ত জানালায় জানালায় ঝাপসা মুখ দেখার জন্যে আমরা তাঁবুর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতাম। মানুষ না দেখে আমরা হাঁপিয়ে উঠতাম।

তাই আমেরিকান সৈনিকদের স্পেশাল ট্রেন আসছে শুনলে যেমন বিব্রত বোধ করতাম তেমনি আবার স্বস্তিও ছিল।

দিনকয়েক পরেই প্রথমে এল খবর, তার পরদিন মিলিটারি স্পেশাল। ঝুপঝাপ করে জি আইরা নামল, সারি দিয়ে সব ডিম রুটি মগ ভর্তি কফি নিল।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে মাহাতো-গাঁয়ের ভিড় ভেঙে পড়েছে। বিশ হতে পারে, তিরিশ হতে পারে, হাঁটু সমান বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কত কে জানে। খাটো শাড়ির মেয়েগুলোও বোকা বোকা চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল। ওদের দেখে আমার কেমন ভয় ভয় করল। ভগোতীলাল কিংবা সার্ভার কুলি তিনটে মাহাতো-গাঁয়ের দিকে যেতে চাইনে আমার বড় ভয় ভয় করত।

প্ল্যাটফর্ম তো ছিল না, শুধু উঠতে নামতে সুবিধের জন্যে লাইনের ধারটুকু মোরম ফেলে উঁচু করা হয়েছিল। আমেরিকান সৈনিকরা কফির মগে চুমুক দিতে দিতে পায়চারী করছিল। দু একজন স্থির দৃষ্টিতে মাহাতো-গাঁয়ের কাল কাল মানুষগুলোকে দেখছিল।

হঠাৎ একজন ভগোতীলালের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিপ পকেট থেকে ব্যাগ বের করল, ব্যাগ থেকে একখানা দু টাকার নোট, তারপর জিগ্যেস করলে, কয়েন্‌স্ আছে? নোট-ভাঙান খুচরো সৈনিকরা কেউ রাখতেই চাইত না, পয়সা ফেরত না নিয়ে দোকানী কিংবা ফেরীওয়ালা কিংবা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলত, ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাঁচিতে গিয়ে কয়েকবার দেখেছি।

এক আনি, দু আনি আর সিকি মিলিয়ে ভগোতীলাল ভাঙিয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ দেখি কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে ভিড়ের ভিতর থেকে কোমরের ঘুনসিতে লোহার টুকরো বাঁধা সেই ছেলেটা হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে কি চাইছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভগোতীলালের কাছ থেকে সেই খুচরো আনি দু আনিগুলো মুঠোর মধ্যে নিয়ে সেই আমেরিকান সৈনিক মাহাতোদের দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমার তখন সাপ্লাই ফর্ম ও কে করান হয়ে গেছে, গার্ড হুইস্‌ল দিয়েছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, অমনি মাহাতোদের দিকে ফিরে তাকালাম। ওরা তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, তাকিয়ে ছিল। তারপর হঠাৎ, লাল মোরমের ওপর, ছড়ান পয়সাগুলোর ওপর কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ল কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলেটা, আর গলায় লাল সুতলিতে দস্তার তাবিজ বাঁধা ছেলেটা।

সেই মুহূর্তে টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো ধমক দিয়ে বলে উঠল, খবর্দার! এমন জোরে চিৎকার করল যে আমি নিজেও চমকে উঠেছিলাম।

কিন্তু বাচ্চা ছুটো ওর কথা শুনল না। তারা দু জনে তখন যে-যত পেয়েছে আনি দু আনি কুড়িয়ে নিয়েছে। মুখ খোসা ছাড়ান কচি ভুট্টার মত হাসছে। মেয়ে পুরুষের সমস্ত ভিড় হাসছে।

টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো রেগে গিয়ে তাদের ভাষায় অনর্গল কি সব বলে গেল। মেয়ে পুরুষের ভিড় হাসল।

মাহাতো বুড়ো রাগে গজগজ করতে করতে গাঁয়ের দিকে চলে গেল একাই। মাহাতো-গাঁয়ের লোকগুলোও চলে গেল কলকল কথা বলতে বলতে, খলখল হাসতে হাসতে।

ওরা চলে যেতেই আগুাহন্ট্ আবার নির্জন নিস্তব্ধ শূন্যতা। আমার এক এক সময় ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেত। দূরে দূরে পাহাড়, মহুয়ার বন, খয়েরের ঝোপ পার হয়ে একটা ছোট্ট জল চোঁয়ানো ঝর্ণা, মাহাতো-গাঁয়ের সবুজ ক্ষেত। চোখ জুড়িয়ে যায়, চোখ জুড়িয়ে যায়। তার মধ্যে কাল কাল নেংটি-পরা মানুষ।

এদিকে মাঝে মাঝেই আমেরিকান সোলজারদের ট্রেন আসে, থামে, ডিম রুটি মগ ভর্তি কফি খেয়ে চলে যায়। মাহাতো-গাঁয়ের লোক ভিড় করে আসে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে সারি দিয়ে দাঁড়ায়—

সাব বখশিস, সাব বখশিস!

একসঙ্গে অনেকগুলো দেহাতী গলা চিৎকার করে উঠল।

মেজরের কাছে ফর্ম ও কে করাতে গিয়ে আমি চমকে ফিরে তাকালাম।

দেখলাম, শুধু বাচ্চা ছেলে ছুটো নয়, কয়েকটা জোয়ান পুরুষও হাত বাড়িয়েছে। খাটো শাড়ির একটা তুখোড় শরীরের মেয়েও।

একদিন সজ্জী কিনতে গিয়েছিলাম, ঐ মেয়েটা হেসে হেসে জিগ্যেস করেছিল, টিরেন কবে আসবে।

এক একদিন অকারণেই ওরা দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে থাকত, অপেক্ষা করে করে চলে যেত।

কাঁধে স্ট্রাইপ তিন চারটে আমেরিকান ততক্ষণে হিপ পকেট থেকে মুঠো

মুঠো আনি দু আনি বের করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষা করে নি, ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল পয়সাগুলোর ওপর। হুড়োহুড়িতে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে হাত পা ছড়ে গেল কারও, কারও বা নেংটির কাপড় ফেঁসে গেল।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম ওদের। মনে হল মাহাতো-গাঁয়ের আধখানাই এসে জড়ো হয়েছে। সবারই মুখে ফুর্তির হাসি, সবাই কিছু না কিছু পেয়েছে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই টাঙি-জুতোর মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেলাম না। মাহাতো বুড়ো আসে নি। সেদিন ওর আপত্তি, ওর ধমক শুনেও পয়সাগুলো ফেলে দেয় নি ছেলে ছুটো। তাই বোধ হয় রেগে গিয়ে আর আসে নি।

আমার ভাবতে ভাল লাগল বুড়োটা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে একা একা মাটি কোপাচ্ছে।

আমাদের দিন, কুক ভগোতীলালকে নিয়ে আমাদের পাঁচজনের দিন আগুাহন্টের তাঁবুর মধ্যে কোন রকমে কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এক একদিন সৈনিক বোঝাই ট্রেন আসছিল, থামছিল, চলে যাচ্ছিল। মাহাতো গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসে কাঁটাতারের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াত, হাত বাড়িয়ে সবাই 'সাব বখশিস, সাব বখশিস' চ্যাঁচাতো।

হঠাৎ এক একদিন মাহাতো বুড়োকে দেখতে পেতাম। কোনদিন ক্ষেতের কাজ ফেলে দু হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হনহন করে এগিয়ে আসত, রেগে গিয়ে ধমক দিত সকলকে। ওর কথা শুনছে না বলে কখনও বা অসহায় প্রতিবাদের চোখে গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত।

কিন্তু ওর দিকে কেউ ফিরেও তাকাত না। সৈনিকরা হিপ পকেটে হাত দিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে মুঠোভর্তি পয়সা ছুঁড়ে দিত। মাহাতো গাঁয়ের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ত সেই পয়সাগুলোর ওপর, নিজেদের মধ্যে কাড়াকড়ি করতে গিয়ে ঝগড়া বাধাত। তা দেখে সৈনিকরা হা হা করে হাসত।

শেষে পর পর কয়েকদিনই লক্ষ্য করলাম টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো আর আসে না। মাহাতো বুড়ো ওদের দেখে রেগে যেত বলে, মাহাতো বুড়ো আর আসত না বলে আমার এক ধরণের গর্ব হত। কারণ এক

একসময় ঐ লোকগুলোর ব্যবহারে আমরা—আমি আর ভগোতীলাল খুব বিরক্তি বোধ করতাম। ভিতরে ভিতরে লজ্জা পেতাম। ওদের কালকুলো দীন-দরিদ্র বেশ দেখে সৈনিকের দল নিশ্চয় ওদের ভিখিরি ভাবত। ভাবত বলেই আমার খুব খারাপ লাগত।

সেদিন কাঁটাতারের ওপার থেকে ওরা বখশিস বখশিস বলে চিৎকার করছে, কাঁধে আই ই থাকি বুশ-সার্টের গার্ড জানকীনাথের সঙ্গে আমি গল্প করছি, আমাদের পাশ দিয়ে একজন অফিসার মচমচ করে যেতে যেতে চিৎকার শুনে থুতু ফেলার মত গলায় বলে উঠল, ব্লাডি বেগার্স।

আমি আর জানকীনাথ পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। আমাদের মুখ অপমানে কাল হয়ে গেল। মাথা তুলে তাকাতে পারলাম না। শুধু অক্ষম রাগে ভিতরে ভিতরে জলে উঠলাম।

ব্লাডি বেগার্স, ব্লাডি বেগার্স।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মাহাতোদের ওপর। ট্রেন চলে যেতেই আমি ভগোতীলালকে সঙ্গে নিয়ে ওদের তাড়া করে গেলাম। ওবা কুড়োন পয়সা ট্যাকে গুঁজে হাসতে হাসতে পালাল।

তবু ওদের জন্যে সমস্ত লজ্জা আমি একটা অহঙ্কারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে সেই অহঙ্কারটা আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত মাহতো বুড়োর চেহারা নিয়ে।

কিন্তু সেদিন আমার বুকের মধ্যের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

ভুরকুণ্ডায় ঠিকাদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই খবর পেয়েছিলাম।

সার্ভার দু জন কুলি তখন টেবিল বানান ড্রাম দুটোকে পায়ে ঠেলে ঠেলে আগুহন্টের কাঁটাতারের ওপারে সরিয়ে দিচ্ছিল। তাঁবুর দড়ি খুলছিল আরেকজন। ভগোতীলাল ড্রামটার গায়ে একটা জোর লাথি মেরে বললে, খেল খতম, খেল খতম।

হঠাৎ হই হল্লা শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি মাহাতো গাঁয়ের লোক ছুটতে ছুটতে আসছে।

আমরা অবাক হয়ে তাকালাম তাদের দিকে। ভগোতীলাল কি জানি কেন হেসে উঠল।

ততক্ষণে কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হুইস্‌ল্ শুনতে পেলাম, ট্রেনের শব্দ কানে এল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রেনটা বাঁক নিয়ে আণ্ডাহল্টের দিকেই আসছে, জানালায় জানালায় খাকি পোশাক।

আমরা বিব্রত বোধ করলাম, আমরা অবাক হলাম। তা হলে কি খবর পাঠাতেই ভুলে গেছে ভুরকুণ্ডার আপিস? না, যে খবর শুনে এসেছি সেটাই ভুল।

ট্রেনটা যত এগিয়ে আসছে ততই একটা অদ্ভুত গম গম আওয়াজ আসছে। আওয়াজ নয়, গান। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল সমস্ত ট্রেন, ট্রেন ভর্তি সৈনিকের দল পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, গলা ছেড়ে গান গাইছে।

বিভ্রান্তের মত আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম, একবার কাঁটা-তারের ভিড়ের দিকে। আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়ল সেই মাহাতো বুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বখশিস, সাব বখশিস!

উন্মাদের মত, ভিক্ষুকের মত তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো।

কিন্তু আমেরিকান সৈনিকদের সেই ট্রেনটা অন্যদিনের মত এবারে আর আণ্ডাহল্টে এসে থামল না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর মতই আণ্ডাহল্টকে উপেক্ষা করে হুস্ করে চলে গেল।

আমরা জানতাম [illegible] আর থামবে না।

ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো গাঁয়ের সবাই ভিখিরি হয়ে গেল ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব -সব ভিখিরি হয়ে গেল।

চাবি

আমার যেন কোথায় যাওয়ার কথা ছিল। আমার হঠাৎ মনে হল কোথাও যেন যেতে হবে। কোথায়, আমার মনে পড়ল না। আসলে আমি জেগে রয়েছি, না তন্দ্রাচ্ছন্ন, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এরকম আমার মাঝে মাঝেই হয়। হয়ত সকলেরই হয়। ঘুমের মধ্যে আমরা কখনও কখনও জেগে থাকি। জেগে থেকেও কখন মনে হয়···হ্যাঁ, সন্দেহ হয় জেগে আছি কিনা।

আমার তো মনে হল আমি জেগেই আছি। শুধু চারপাশের পরিবেশ আমাকে ঘুমের মত শীতের চাদর হয়ে জড়িয়ে আছে। আর অস্পষ্টভাবে আমার মনে হল, আমার যেন কোথায় যাওয়ার কথা আছে। কোথায়? কোথায়? আমার কিছুতেই মনে পড়ল না। তবু আমার ভিতরটা সেখানে যাবার জন্যে ছটফটিয়ে উঠল। আমি অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে তাকিয়ে কিছু খুঁজে পাবার চেষ্টা করলাম। হাত বাড়ালেই বেড্ সুইচটা জ্বালা যায়, কিন্তু যা খুঁজে বের করতে চাই সে-তো অন্ধকারেই আছে। অন্ধকারেই তার থাকবার কথা।

বালিশের ওপর থেকে মাথাটা তুলে কনুইয়ে ভর দিয়ে আমি ছোট্ট টেবিলটার দিকে তাকালাম। ওষুধের শিশি, বইপত্তর, অ্যাশ ট্রে ইত্যাদির কিছুই দেখা গেল না। সব অন্ধকারে মিশে আছে। তবু আমি বেশ বুঝতে পারলাম ওগুলো আছে, কারণ ওগুলো ওখানেই ছিল। দেয়ালে, ঐ টেবিলের বিঘৎখানেক ওপরে তিনটি সাদা সাদা রেখা দেখতে পেলাম। সেগুলো চোখের সামনে বড় হতে হতে এক সময় হাসপাতালের পাশাপাশি তিনটে সাদা চাদরের বেড হয়ে গিয়ে আবার ছোট হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, আসলে জানলার খড়খড়ির ভিতর দিয়ে আলো কিংবা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। এতক্ষণে টাইমপিসটার ঝিকঝিক আওয়াজ কানে এল, রেডিয়াম ডায়ালের সংখ্যাগুলো জ্বলছে দেখা গেল। কিন্তু আমার ঘড়ির দিকে তাকানোর একটুও

ইচ্ছে হল না। কারণ সেই মুহূর্তে আমি চাবির গোছাটা দেখতে পেলাম, দেখে চিনতে পারলাম।

একটা গোল রিং, আর নানা আকারের পাঁচ সাতটা চাবি তাকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর। অন্ধকার মেখে কাল কাল রঙ হয়ে গেছে তাদের। আলো নেভান রাস্তায় হট্টগোলের রাতে একদিন একটা ডাস্টবিনের পাশে ছ সাতটা লোক বন্দুকের গুলিতে এমনি ছড়ান ছিটান শবদেহ হয়ে পড়েছিল।

চাবির গোছাটা দেখেই আমার হঠাৎ মনে হল, আমি বোধহয় সেটা খুঁজে পেয়েছি। অথচ আমি কি খুঁজছিলাম কিছুতেই মনে পড়ল না।

তবু, আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। দ্রুত হাত বাড়িয়ে, হাতটা ব্যগ্রতায় তখন থাবার মত, চাবির গোছাটা চেপে ধরলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল আমি ভীষণ একা।

কয়েক মুহূর্ত আমি নিঃশব্দে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকারের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে আমি একা, সমস্ত বাড়িটাই প্রাণহীন। একা। আমার মনে পড়ল, কারা যেন ছিল। খুব আপনার জন কে কে। তারা বোধহয় কোথাও গেছে, কোথায় মনে পড়ছে না। মনে হল আমার কোথায় যেন যাওয়ার কথা। কোথায় যেন পৌঁছতে হবে।

চাবির গোছাটা হাতের মধ্যে ঝনঝন শব্দ করল। সেই শব্দের মধ্যে চাবির গোছাটা কি যেন বলতে চাইল। হয়তো মনে পডাতে চাইল কোথায় যেতে হবে।

কিন্তু তার আগে অ থাকে কি যেন খুঁজে পেতে হবে। কি যেন খুঁজছি, অন্ধকারে। কারণ, যা খুঁজে বের করতে হয় তা তো অন্ধকারেই থাকে। আলোর মধ্যে কিছু খুঁজে বের করার কোন মানে হয় না।

কেন জানি না, আমি চাবির গোছাটা নিয়ে গডরেজের আলমারিটার কাছে গেলাম। সেটা খুলতে গিয়ে একটা বিচ্ছিরি শব্দ হল। আমার মনে হল কার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। অথচ, আমি জানি, আমি এখন একা। সমস্ত বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে, কেউ কোথাও নেই।

আলমারির ডালাটা খুলতেই রাশি রাশি পোশাক দেখতে পেলাম। রাশি রাশি শাড়ি, ফ্রক, চাদর, রুমাল···সব, সব, অথচ আমি অন্ধকারে সত্যি সত্যি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

অন্ধকারের মধ্যেই আমার ধুতি পাঞ্জাবি ইত্যাদি ছুঁয়ে আমি চিনতে পারলাম। মনে হল অনেকদিন ধরে আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এরা আমার হয়ে গেছে। মানে 'আমি' হয়ে গেছে।

আমি তাড়াতাড়ি আলমারিটা বন্ধ করলাম। তারপর টেবিলের দেরাজ খুললাম। একটার পর একটা দেরাজ। আর অন্ধকারে খস্‌খস্‌ শব্দ··· কাগজ, কাগজের স্তূপ, জমিয়ে রাখা অসংখ্য কাগজ। সেগুলো সাবধানে নাড়াচাড়া করলাম, কারণ মনে হল সেগুলো সবই জমিয়ে রাখার মত ভীষণ দরকারী।

দেরাজ বন্ধ করে আমি কাঠের আলমারিটার কাছে গেলাম। পাল্লায় আঁটা বিরাট আয়না একটা, আমি কিন্তু সেটার দিকে একবারও তাকালাম না। এবার চাবি লাগিয়ে আলমারি খুললাম। আলমারির মধ্যে আবার দুটো দেরাজ। একটা দেরাজ খুলতেই দেখি তার মধ্যে অসংখ্য চাবির গোছা। এক রাশ চাবির রিঙ, রিঙে লাগান চাবি, চাবি, চাবি। এত চাবি কিসের। কেন, তা বুঝতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ আমি সেই চাবির দেরাজের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমার মনে হল এগুলো সব অকেজো চাবি। হয়তো তালা হাবিয়ে গেছে। তালা নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা এ-চাবি দিয়ে হয়তো কিছু খোলা যায়—ট্র্যাঙ্ক, স্যুটকেশ, কিংবা কোন দরজা। কিন্তু আমি তো কিছু খুলতে চাই না, আমি বোধহয় কিছু খুঁজছি।

কি খুঁজছি আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল। বোধহয় খুঁজছি, কোথায় যেতে হবে। কোথায়? কোথায়?

আমার হঠাৎ মনে হল দেরি হয়ে যাবে। দেরি হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি আমি জামাকাপড় বদলে নিলাম। টাকার ব্যাগটা পকেটে নিয়ে আমি খাটের তলা থেকে স্যুটকেশটা বের করলাম। খান কয়েক ধুতি পাঞ্জাবি ভরে নিলাম স্যুটকেশে। তারপর দ্রুত আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কেবলই মনে হতে লাগল দেরি হয়ে যাবে।

আমি স্টেশনে এসে পৌছলাম। কি করে স্টেশনে এসে পৌছলাম আমি জানি না। আমার মনে পড়ল না।

স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলাম। মাইকের ভেতর দিয়ে একটা ঘং ঘং কণ্ঠস্বর কি যেন বারবার বলছিল। শোনবার চেষ্টা

করলাম। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। কোথায় যেতে হবে সে কণ্ঠস্বর তা বলছিল না। কোন ট্রেন কোথায় যাবে তাও বলছিল না। কোন প্লাটফর্মে এসে কোন ট্রেন দাঁড়াবে, কোন প্লাটফর্ম থেকে ট্রেন ছাড়বে শুধু সে-কথাই বলছিল। আমি তো কারও আসার অপেক্ষায় এখানে আসি নি। আমি তো এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতে আসি নি। আমি কোথাও যেতে চাই, কোথাও পৌছতে হবে আমাকে। কোথায়? আমার মনে পড়ল না।

আমি শুধু দেখলাম অসংখ্য লোক ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখলাম কার যেন সময় নেই। মনে হল সবারই যেন দেরি হয়ে গেছে। এক এক দল এক একদিকে ছুটছে।

আমি কিছুই ঠাহর করতে না পেরে একটা দলের পিছনে পিছনে ছুটে গেলাম।

তারা টিকিটের জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একে একে সকলেই টিকিট কিনল। এক একজন এক-একটা নাম বলছিল।

আমাব কোন নাম মনে পডল না।

আমার সামনে তখন আর দুজন মাত্র। একজন বললে, আসানসোল। পরের জন বললে, বর্ধমান।

আমি বোকার মতো টিকিটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ঐ—ঐ।

সে জিগ্যেস করল, আ...নসোল না বর্ধমান?

কিন্তু ও দুটো, আমার কেমন মনে হল, শুধুই স্টেশনের নাম। কোন গন্তব্য নয়। যেখানে পৌছতে চাই তাব নাম আছে কিনা জানি না, থাকলেও আমার মনে পড়ল না।

তবু একখানা টিকিট আমার হাতের কাছে এসে গেল।

আমি দেখলাম সকলেই দৌড়াচ্ছে। আমিও স্যুটকেশ হাতে দৌড়তে শুরু করলাম।

ব্যাণ্ডেল, বর্ধমান, আসানসোল—আমি নানারকম স্টেশনের নাম শুনতে পাচ্ছিলাম তখনও। কোনটা যাত্রীদের মুখে, কোনটা সেই মাইকের ঘং ঘং কণ্ঠস্বরে। কিন্তু ওগুলো তো শুধু স্টেশনের নাম, যেখানে ট্রেন কিছুক্ষণের জন্য

থামবে। আমি তো থামতে চাই না, আমি কোথাও পৌঁছতে চাই। কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিল।

আমি প্লাটফর্মের চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আমার জন্যে কোন ট্রেন আছে কিনা। কোন্ ট্রেনটা আমার, আমি নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না।

লটবহর নিয়ে জনকয়েক লোক দ্রুত হেঁটে চলেছিল। আমিও তাদের পিছনে পিছনে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলাম। তাদের সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটা কামরায় উঠে পড়লাম।

কামরাটা তখন একটু ফাঁকা ফাঁকা। আমি জানলার পাশে কোণের আসনটায় বসবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ততক্ষণে অন্য একজন সেইখানে ধপাস করে বসে পড়ল।

আমার যে কোথাও যাওয়া দরকার, কোথাও পৌঁছতে হবে, সেকথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলাম। ঐ কোণের জানলাঘেঁষা আসনটা না পেয়ে, কেউ একজন সেখানে আগেই বসে পড়েছে দেখে আমার সমস্ত মন বিষাক্ত হয়ে গেল। আমার মনে হল যেন ঐ কোণের আসনটা পাবার জন্যেই আমি এসেছি।

আমি বিরস মুখে সেই লোকটার পাশে বসলাম। আমার পাশে অন্য কে কে এসে বসল। আমি তাকিয়ে তাদের মুখও দেখলাম না। কারণ ততক্ষণে আমার চোখ সামনের দিকে, যেখানে আরও চারজন যাত্রী উঠেছে। তাদের মধ্যে একজনকে ভোরের আলোর মত মনে হল। সে কেমন লাজুক স্নিগ্ধ একটা বাতাস তার মুখে বারবার মেখে নিচ্ছিল।

আমার ইচ্ছে হল মেয়েটি আমার সামনের আসনে এসে বসুক। কিন্তু তখনই আমার মনে পড়ল, কাঠের আলমারিটায় বড় একটা আয়না সাঁটা আছে। কিন্তু আমি সে আয়নায় নিজেকে দেখি নি।

আমার ইচ্ছে হল আয়নায় আমি একবার নিজেকে দেখে নিই। তাই আমি বার বার সেই স্নিগ্ধ মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে চাইছিলাম।

আমার পাশের লোকটিকে কে যেন জিগ্যেস করল, কোথায় যাবেন?

লোকটি উত্তর দিল, ব্যাণ্ডেল। ওখানেই আমার বাড়ি।

আমি বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, তার কথার কোন

অর্থ বুঝতে পারলাম না। 'ওখানেই আমার বাড়ি!' কিন্তু সেখানে তো যাওয়া যায় না। বাড়ি! বাড়িতে তো আমরা বারবার শুধু ফিরে আসি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা সকলেই কোথাও যেতে চাই। সেই যাওয়ার জায়গা খুঁজে পাই না, তাই ক্লান্ত হয়ে শেষ অবধি আবার ফিরে আসি। অথচ লোকটাকে প্রশ্ন করা হল, কোথায় যাবেন, আর লোকটা অক্লেশে বলল, ব্যাণ্ডেল। ওখানেই আমার বাড়ি।

আমি একবার স্যুটকেশটা খুলে সেদিনের খবরের কাগজটা এনেছি কিনা দেখলাম। জামা কাপড়ের নীচে হাত ঢুকিয়ে খুঁজলাম, পেলাম না। তখন সেটা আবার বন্ধ করলাম।

মেয়েটির পায়ে বোধ হয় সেটা লাগছিল, সে বললে, শুনুন!

আমি মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকালাম। সে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। সে আমাকে ডেকেছে!

সে আবার বললে, ওটা এর নীচে রেখে দিন।

আমি স্যুটকেশটা বেঞ্চের তলায় রেখে দিলাম। তারপর আমি জানলার ফাঁক দিয়ে আখের ক্ষেত, পানের বরোজ, সবুজ ঘাস, শঙ্খচিল দেখতে লাগলাম। ভোরের হাওয়া আমার খুব সুন্দর লাগছিল। আমি ভুলে যাচ্ছিলাম আমাকে কোথাও যেতে হবে, কোথাও পৌঁছতে হবে।

আপনার কাছে দেশলাই আছে? আমার পাশের লোকটিকে একজন জিগোস করল। আর পাশের লোকটি নির্বিকারভাবে পকেট থেকে দেশলাই বের করে তাকে দিল।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা তো জানতে চেয়েছে দেশলাই আছে কি-না। কোন জিনিস আমার থাকলেই কি সেটা বের করে দিতে হবে। আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম, আমার কি আছে, আমার মধ্যে কি আছে। অথচ যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে পৌঁছাতে না পারলে আমি জানতেই পারছি না আমার কি আছে।

মেয়েটি কি একটি পত্রিকা পড়ছিল, আর মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল। আমি এতক্ষণ মাঝে মাঝে ওর পায়ের নীচে বেঞ্চির তলায় রাখা স্যুটকেশটা দেখছিলাম। আমার কেবলই ভয় হচ্ছিল, ওটা চোখের আড়াল হলেই হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার হঠাৎ মনে হল, আমি অনেকক্ষণ স্যুটকেশটার দিকে তাকাই নি, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আমি নিজেকে নাড়া দিয়ে বললাম, না, না, আমাকে যেতে হবে, আমাকে কোথায় যেন পৌঁছতে হবে। কোথায় পৌঁছনোর কথা সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

ট্রেনটা মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় সেটা আবাব দাঁড়িয়ে পড়ল। আর একরাশ লোক, কয়েকটি বাচ্চা কলরব করতে করতে কামরায় উঠল। দেখলাম, তারা ওঠায় সকলেই বিরক্ত হয়েছে। আমি নিজেও বিরক্ত হলাম।

জানলাঘেঁষা কোণের আসনে যে লোকটা বসেছিল, সে হঠাৎ একজনের নাম ধরে ডাকল, অবিনাশ!

যারা নতুন উঠেছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন সাড়া দিল।

কোণের আসন বললে, আয়, এখানে বোস, আমি নামব।

বলে সে লোকটা উঠে দাঁড়াল, অবিনাশকে বসতে দিয়ে সে নেমে গেল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ঐ জানলাঘেঁষা কোণের আসনটা তো আমারই। কারণ আমি মনে মনে প্রথম থেকেই ওটাকে ইচ্ছা করেছিলাম।

লোকটা নেমে গেলে ওটা আমিই পাব ভেবেছিলাম। আমার আশে-পাশে আরও যারা ছিল, তারাও ঠিক সেইরকমই ভেবেছিল। ওরা জানত কোণের আসন যদি শূন্য হয় তা হলে সেখানে আমিই সরে গিয়ে বসব। এবং তারা তখন নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করত না। কিন্তু কোণের আসনের লোকটি অবিনাশ নামের লোকটিকে ডেকে বসে দেওয়ায় কেউই অবাক হল না। তাদের মনে হল ঐ জানলার পাশটুকুতে অবিনাশেরও অধিকার আছে। কারণ যিনি উঠে গেলেন অবিনাশকে তিনি বসতে বলে গেছেন। যেন, দেশলাই আছে কিনা জিগ্যেস না করে তাঁকে যদি জিগ্যেস করা হত আপনার কি কি আছে, তা হলে উনি বলতেন—কি কি বলতেন জানি না, কিন্তু সবশেষে নিশ্চয়ই বলতেন, 'আর এই কোণের আসনটা।'

জানলার বাইরে টেলিগ্রাফ পোস্টগুলো দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে তখনও। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, একটা ঘোমটা-টানা বউয়ের চোখ ছলছল, একজন বৃদ্ধ কাশছে, সামনে বসা স্নিগ্ধ মেয়েটি কার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছে।

আমি শুনছিলাম, দেখছিলাম, হাসছিলাম তাদের কথার পিঠে। সব

ভুলে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিল আমি থেমে আছি, আমি থেমে গেছি। এই চলন্ত ট্রেন যেন একটা দৃঢ় ভিৎওয়ালা বাড়ি, নড়ছে না, নড়বে না ঝড় এলেও। কিন্তু আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার যে কোথায় যেতে হবে! কোথাও পৌছতে হবে। কোথায় তা আমার মনে পড়ল না। আর তখনই আমি বুঝতে পারলাম আমি একটা চলন্ত ট্রেনের মধ্যে রয়েছি।

ঝং ঝমা ঝং কঁ্যাওচ কঁ্যাচ শব্দ তুলে ট্রেনটা হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। সবাই কৌতূহলে জানলার বাইরে তাকাল। কি ব্যাপার! স্টেশন নয়, মাঝপথেই হঠাৎ থেমেছে ট্রেনটা। কিসের একটা গোলমাল ভেসে আসছে।

হুড়মুড় করে অনেকে উঠে পড়ল, দরজা খুলে বাইরে কি হচ্ছে, ট্রেন কেন থেমেছে, দেখার জন্যে কেউ কেউ নেমে পড়ল।

ট্রেন চলবে না, ট্রেন চলবে না, কেউ একজন চিৎকার করে বলল বাইরে থেকে।

যাত্রীদের মধ্যেই কারও কারও মুখ দেখে মনে হল; তারা বেশ মজা পেয়েছে, কারও মুখে উৎকণ্ঠা, কেউ বিরক্ত।

কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে, পৌছতে হবে।

আর সকলকে নেমে যেতে দেখে আমিও নেমে যাচ্ছিলাম। সামনে বসা মেয়েটি বললে, আপনার স্যুটকেশ। বলে পা দুটি গুটিয়ে ওপরে তুলল। আমি স্যুটকেশ হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম।

বাইরে এসে দেখি প্রচণ্ড ভিড়, গোল হয়ে জমায়েত কিছু লোক, তার ভিতরে কেউ একজন কিছু বলছে, কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না, তবু ভিড় করে আছে।

আমি সেই ভিড়ের মধ্যে বারবার উঁকি দেবার চেষ্টা করলাম।

গাড়ি চলবে না, চলবে না। কেউ একজন আবার বলল। কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে। আমার যে যাওয়ার কথা আছে।

কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে আমার মনে পড়ছিল না। সেই মুহূর্তে আমি কেন জানি না অস্ফুটে বলে উঠলাম, চাবিটা? আমার মনে পড়ল, এবার আমার স্পষ্ট মনে পড়ে গেল, আমি নিজে না যেতে পারলেও আমাকে···হ্যাঁ আমার যাওয়া না হলেও আমাকে যেমন করে হোক চাবিটা চাবির গোছাটা পৌছে দিতে হবে।

আমি তাড়াতাড়ি স্যুটকেশ খুললাম। কাপড়চোপড়, টাকা, কাগজ-পত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে…কোথায়? কোথায়? আমি পাগলের মত চাবিটা খুঁজলাম। পেলাম না। তবে কি? হ্যাঁ, একবার বোধহয় খুলেছিলাম কামরার মধ্যে। তখনই হয়তো পড়ে গেছে। না কি, আমি আনতেই ভুলে গেছি চাবিটা! টেবিলের ওপরই ঠিক তেমনি পড়ে আছে, ছায়া মেখে, অন্ধকারে, রাস্তার ডাষ্টবিনের পাশে ছড়ান ছিটান পাঁচ সাতটা শবদেহের মত। ঠিক আমার মতই যারা পৌঁছতে পারে নি, পৌঁছে দিতে পারে নি তাদের মতই।

আমি তাড়াতাড়ি সেই শূন্য কামরায় ফিরে এলাম। যেখানে বসে ছিলাম নিজে, কিংবা যেখানে স্যুটকেশ রেখেছিলাম—চারপাশ আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও চাবিটা পড়ে গেছে কিনা, এখনও আছে কিনা।

না, চাবির গোছাটা নেই। কোথাও নেই। কিন্তু তখনই একটা হুইসল শুনলাম, ঘণ্টি বেজে উঠল হঠাৎ আর একরাশ লোক হুড়মুড় করে উঠে পড়ল।

সেই ট্রেন চলতে শুরু করল আবার। আর আমার মনে হল এখন ট্রেনে বসে থাকার কোন মানেই হয় না। কারণ, এখন যদি আমার মনেও পড়ে, কোথাও যেতে হবে, যদি সত্যি সত্যিই সেখানে পৌঁছে যাই, তা হলেও লাভ নেই। কারণ যে চাবির গোছাটা পৌঁছে দেয়ার কথা সেই চাবির গোছাটাই আমার সঙ্গে নেই। হারিয়ে গেছে কিংবা ফেলে এসেছি।

এখন আর সেখানে যাওয়ার কোন মানে হয় না। কোথাও পৌছোন এখন অর্থহীন। চলন্ত ট্রেনে বসেও আমার ভিতরটা ছটফটিয়ে উঠল ফেরার জন্যে। টেবিলের উপর সেটা এখনও আছে কিনা, ফিরে এসে দেখার জন্যে। আমি জানি ট্রেনটা যতই দুরন্ত বেগে ছুটতে থাকবে, আমি—আমার ভিতরটা ফেলে আসা চাবির গোছাটার দিকে হাত বাড়িয়ে ততই দ্রুত পিছন পানে ছুটতে চাইবে।
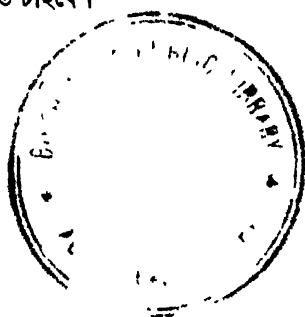
দিনকাল

আমাদের বড় মেয়েকে নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সে একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির, ছেলেবেলা থেকেই একটু বেশী লাজুক, এবং আমাদের দুজনেরই খুব বাধ্য ছিল। তার বি. এস-সি. পরীক্ষার ফল বের হওয়ার আগেই হঠাৎ একটু ভাল যোগাযোগ হয়ে গেল, অরুণা বললে ছেলেটি চমৎকার, তার বাড়ির পরিবেশটিও আমার পছন্দ হয়েছিল, আমি অরুণার সামনেই একদিন রুবিকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, এ বিয়েতে তোর মত আছে তো রুবি? রবি বিষম লজ্জিত মুখ করে আমার সামনে থেকে পালিয়ে গেল। পরে অরুণার কাছে শুনলাম সে নাকি বলেছে, আমার আবার মত কি, মেয়ের কিসে ভাল, বাবা-মা ছাড়া আর কেউ বোঝে নাকি! শুনে আমার সত্যি খুব ভাল লেগেছিল। সৌভাগ্য আমাদের, ওরা সুখী হয়েছে।

আমার একমাত্র ছেলে অন্তুর বয়স এখন একুশ। অন্তুর ভাল নাম নিরুপম। ও যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল তখন ওকে দেখে নিতান্তই বালক মনে হত। অন্তু কখনও কখনও আমাদের লুকিয়ে চুলকাটার সেলুনে দাড়ি কামিয়ে আসত, আমরা বুঝতে পারতাম, এবং ওর বড় হওয়ার চেষ্টা দেখে আমি ও অরুণা চোখাচোখি ভাবে নিঃশব্দে হাসতাম। ঐ বয়স তো একদিন আমারও ছিল, তখন কি করে নিজেকে পূর্ণবয়স্ক যুবক বলে ভাবতাম জানি না। আমার যতদূর মনে পড়ে যায় ঐ বয়সেই আমি প্রথম প্রেমে পড়ি। এবং সেটাই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম। সে-সব দিনের কথা অরুণা কিছুই জানে না, জানলেও ও খুব একটা বিচলিত হত বলে মনে হয় না। তবু আমার সেই কলেজ-জীবনের পরিচ্ছন্ন প্রেমটুকুকে বিশুদ্ধ রাখার জন্যেই অরুণার কাছে তার কোন আভাস কোনদিনই দিই নি। এমন কি আমার কখনও কখনও মনে হয়েছে সেই পরম বঞ্চনা ও চরম আঘাতের কথা কাউকে বলতে গেলে এই বাহান্ন বছর বয়সেও হয়তো আমার চোখের পাতা ভিজে যেতে পারে।

অন্তুকে নিয়ে সে-জন্যেই আমার দুর্ভাবনার শেষ ছিল না। যৌবনের

সেই হঠকারিতার পর থেকে প্রেম আমার কাছে একটি বিভীষিকা। তিরিশ বত্রিশ বছর কেটে গেছে, সমস্ত স্মৃতি এখন ঝাপসা, কিন্তু প্রেমের মধ্যে, বিশেষ করে ব্যর্থপ্রেমের মধ্যে কি অসহনীয় কষ্ট, কি দুরন্ত জ্বালা, তা আমার আজও মনে আছে। আছে বলেই অন্তুকে নিয়ে আমার এত ভাবনা।

রুবি অন্তুর চেয়ে দু বছরের বড়। তার ফলে রুবির সঙ্গে কলেজে যে মেয়েরা পড়ত তাদের দু একজন আমাদের বাড়ি আসত। তারা কিন্তু কেউই অন্তুকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। আমাদের কাছে অবশ্য সেটুকুই সান্ত্বনা। আমি হাসতে হাসতে অরুণাকে একদিন বলেছিলাম, ভাগ্যি রুবি ওর ছোট বোন নয়! শুনে অরুণা অবাক হয়ে হেসে ফেলেছিল।—কি যে বল, প্রেম কি এত সস্তা নাকি!

আমি বলতে পারতাম না যে প্রেম খুব সুলভ নয় বলেই আমার এত ভয়।

আসলে অন্তুকে আমরা দুজনেই যে খুব ভালবাসি, দুজনেই যে তার জন্যে খুব গর্বিত, এটাই শেষ কথা নয়। আমরা তাকে রুবির মতই সুখী দেখতে চেয়েছিলাম। এবং প্রেম সম্পর্কে আমার নিজের আতঙ্ক আমি নিশ্চয়ই অন্তুর উপর চাপিয়ে দিতে চাই নি। আমি মনে মনে এমন একটা উদার চিন্তাকেও লালন করেছি যে অন্তু যদি কোন মেয়েকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে আমি সম্মতি দেব তো নিশ্চয়ই, এমন কি অরুণার মনে কোন দ্বিধা থাকলেও আমি তা দূর করে দেব। প্রকৃতপক্ষে প্রেমে আমার কোন ভয় ছিল না, ভয় ছিল ব্যর্থপ্রেমে।

আমার সমবয়স্ক সহকর্মীদের কয়েকজনকে আমার রীতিমত বৃদ্ধ মনে হত। অথচ আমি নিজে কিছুতেই আমার নিজের বয়েসকে অনুভব করতে পারতাম না। সেজন্য সমবয়স্কদের সঙ্গে আমার তেমন মেলামেশা ছিল না। তাদের আলোচনায় আমি কোন আকর্ষণ বোধ করতাম না, তাদের সুখ দুঃখ আমাকে স্পর্শ করত না। কারণ চিন্তা ভাবনায় বা মানসিকতায় আমি এখন যুবক। বাহান্ন বছরের যুবক চাকরি থেকে অবসর নিতে আর ক' বছর বাকী আছে সে হিসেব একদিন অন্যের মুখে শুনে আমি বিষণ্ণ বোধ করেছিলাম। তবে আমার সেই সহকর্মীর মত বিব্রত বোধ করি নি। কারণ লেখাপড়ায় অন্তু খুব উজ্জ্বল না হলেও তার পরীক্ষার ফল কখনও তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানিকে আমার চোখে নিষ্প্রভ করে দেয় নি। অন্তু চিরকালই

অত্যন্ত উৎফুল্ল চরিত্রের ছেলে। এবং অত্যন্ত কোমল স্বভাবের। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত হবার কারণ ছিল না।

পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অন্তু স্বাভাবিক ব্যবহার করত। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কখনও কখনও সে রাস্তায় যখন কথা বলত বা কোন বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করত তখন তার মধ্যে কোন জড়তা থাকত না। অল্পবয়স থেকেই সেই মেয়ে কটির সঙ্গে সে বড় হয়েছে, রাস্তায় ক্রিকেট খেলেছে, একদল হয়ে সরস্বতী পুজো করেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কারও সম্পর্কে অন্তুর কোন দুর্বলতা আছে কিনা আমি অকারণেই কখন কখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কখন মনে হয়েছে তেমন কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারলে আমি খুশীই হব, অরুণার সঙ্গে ভাগাভাগি করে মজাটুকু উপভোগ করব।

অন্তু যেবার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হল সেই বছরই আমি প্রথম নিজেকে একটু বয়স্ক মনে করতে পারলাম। রুবির বিয়ের সময় এই অনুভূতিটা আসে নি, বরং মনে হয়েছিল রুবির বিয়েটা আমাকে জোর করে বয়স্কদের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। কিন্তু ছেলে বড় হলে নিজেরই বুড়ো হতে ইচ্ছে করে।

একবার অরুণার সঙ্গে পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছিলাম, সঙ্গে অন্তু কিছুতেই যেতে চায় নি, তবু অরুণা তাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল একালের জামাইদের পছন্দ জানতে এবং রুবির জন্য শাড়ি বাছার কাজে সাহায্য পাবে বলে। সেখানে ভিড়ের মধ্যে লাজুকভাবে ও যে দুটি মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখেছিল আমি সে-দুটি মেয়েকে লক্ষ্য করেছিলাম। এবং অন্তুর রুচি ও পছন্দ দেখে খুশী হয়েছিলাম।

তাই প্রথম যেদিন ওর কাছে একটি টেলিফোন এল আমি ভয় পাই নি। ভীষণ মজা পেয়েছিলাম।

টেলিফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই একটি মধুর মেয়েলি কণ্ঠ জিগ্যেস করল, নিরুপম আছে?

আমি বললাম, না, সে একটু বাইরে গেছে, এক্ষুনি ফিরবে।

আমি প্রথমটা বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমাদের সময়ে কোন মেয়ে এভাবে টেলিফোন করে নি। মেয়েদের গলা শোনবার জন্যে অন্যের বাড়ি থেকে আমরা তিনটি বন্ধু একবার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সময় জানতে চেয়ে ফোন করেছিলাম, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অপারেটর মিষ্টি গলায় জবাব দিয়েছিল

এটুকুই মনে আছে। সেকেলে অটোমেটিক টেলিফোন ছিল না, অপারেটর বেশীর ভাগই ছিল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

যে মেয়েটি নিরুপমের খোঁজ করছিল তার নাম জিগ্যেস করতে আমার সঙ্কোচ হল, তাছাড়া আমি একটু বেশী বেশী নরম গলায় উত্তর দিলাম। কারণ আমি শুনেছিলাম আজকাল ঐ বয়সের ছেলেদের অনেক মেয়ে বন্ধু থাকে, আমি বিস্মিত হয়েছি বা অপছন্দ করছি কোনক্রমে জানতে পারলে মেয়েটি নিশ্চয় কলেজে তা রাষ্ট্র করে নিরুপমকে লজ্জায় ফেলবে।

তাই আমি মেয়েটিকে জিগ্যেস করলাম, নিরুপম ফিরে এলে তাকে কি কিছু বলতে হবে?

মেয়েটি এক নিমেষের জন্যে কি যেন ভাবল, তারপর বললে, না, আমিই আবার ফোন করব।

মেয়েটি নাম বলল না বলেই আমার মনে ঈষৎ খটকা লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই নিরুপম এল। আমি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, তোর ফোন এসেছিল, এখনি আবার রিং করবে বলেছে।

আমার মনে হল নিরুপম একটু অস্বস্তি বোধ করল।

মিনিট পনেরো বাদে টেলিফোন বেজে উঠল আবার। নিরুপম রিসিভার তুলল। আমি সে ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলাম, যাতে নিরুপম না মনে করে আমি তার দিকে কান পেতে আছি।

মেয়েটির এই ফোন করার ঘটনাটা আমার বাহান্ন বছরের মনে তোলপাড় আনল, শুধু কৌতুকই নয়, রোমাঞ্চের স্পর্শও ছিল ঘটনাটিতে। আমি অরুণাকে এক সময়ে সে-কথা বললাম, যদিও আমার মনে দ্বিধা ও ভয় ছিল যে অরুণা হয়তো ঘটনাটিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পাববে না। অরুণা কিন্তু অবাক হয়ে সশব্দে হেসে উঠল, হাসি থামলে ওর মুখের ওপর একটা মুগ্ধভাব ফুটে উঠল। আমার মনে হল ছেলের জন্য অরুণার কোন দুশ্চিন্তা নেই, ও যেন একটু গর্বই বোধ করছে। এবং ঠিক তখনই আমার নিজেরও মনে হল আমিও একটু গর্বিত বোধ করছি।

মেয়েটি টেলিফোনে অন্তুকে কি বলেছিল আমার জানার কথা নয়। তার নাম হয়তো অন্তুকে জিগ্যেস করলেই জানতে পারতাম। কিন্তু আমি কিছুই জানতে চেষ্টা করি নি, যদিও আমার সে বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। ফলে, কল্পনায় তিন চারটি একালের সুন্দর সুন্দর নাম নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া

করেছিলাম, এবং ভেবে নিয়েছিলাম মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্তুর সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করার কথা বলেছে। কারণ, আমার মনে আছে, তখন অন্তুর কলেজে পর পর তিন দিন ছুটি ছিল।

একটি মেয়ে আমার একুশ বছরের ছেলেকে বাড়িতে টেলিফোন করেছে—এই ছোট্ট ঘটনাটি আমার মনে এমনি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যে আপিসের দু একজন সহকর্মী বন্ধুকে না বলে পারি নি। তারা কেউ এ ঘটনার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, কেউ একটি প্রেমোপাখ্যান শোনার মত মুখভাব করে তা উপভোগ করেছে এবং তাদের নিজেদের যৌবনকাল কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে তা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। বলা অপ্রয়োজন যে আমিও সেই কপট দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সুর মিলিয়েছি।

এর পর অন্তুর কাছে আরও কয়েকবার আরও ঘন ঘন মেয়েলি গলার টেলিফোন এসেছে। সে-সব সময়ে কখন আমি নিজেই রিসিভার তুলেছি, কখন অরুণা। তখন আর আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা 'মজা' নয়, বরং কখনও কখনও মনে হয়েছে অন্তু আমাদের যেন উপেক্ষা করছে, কিংবা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করছে না। তা না হলে সে নিশ্চয় তার বান্ধবীদের বাড়িতে ফোন করতে নিষেধ করে দিত। অন্তু যে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই সিগারেট খাওয়া ধরেছে আমি জানতাম, তার পকেটে একখানা চিঠি পোস্ট করার জন্যে রাখতে গিয়ে দেশলাই দেখেছিলাম একদিন। আরেকদিন ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পরই আমি ঢুকতে গিয়ে একরাশ ধোঁয়া এবং সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিলাম। এই বয়সে সিগারেট খাওয়াকে আমি খুব দোষের মনে করত্‌ম না, কিন্তু সেজন্যে আমার চোখের সামনে টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট রাখলেও সহ্য করতে হবে এতখানি উদার আমি হতে পারি নি। ও অবশ্য তা করেও নি কোনদিন এবং সম্ভবত ঐ বয়সে পুরো প্যাকেট সিগারেট কেনায় ওরা অভ্যস্তও হয় না। আমি নিজে ঐ বয়সে খুচরো একটি সিগারেট কিনে দোকানের দড়িতে ধরিয়ে নিতাম। সে যাই হোক, ঘন ঘন টেলিফোন আসা আমার কাছে প্রায় চোখের সামনে সিগারেট ধরানোর সামিল মনে হত।

প্রথম দিকে ব্যাপারটা উপভোগ করলেও অরুণার কাছেও এটা আর কৌতুক রইল না। দেখতাম, অরুণাও বিরক্ত হত, এবং আমি জানতাম

বিরক্তিটা আসলে ওর রাগ। 'জানি না', বা 'বলতে পারি না' গোছের উত্তর দিয়ে ও কোন কোনদিন রিসিভার নামিয়েও দিয়েছে।

আমি ঘরে বসে থাকলে অন্তু টেলিফোনে কাটা কাটা কথা বলত, অস্পষ্ট ভাবে উত্তর দিত, এবং আমার তা শুনে বেশ মজা লাগত।

—মেয়েটা কে রে? বেশ বিরক্তির সঙ্গেই একদিন অরুণা ওকে জিগ্যেস করেছিল। আমি তখন অন্তুর চোখের দিকে তাকাতে পারি নি।

কলেজের দু একটি মেয়ের নাম অরুণার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, কারণ তাদের কথা অন্তু সেদিনই হাসতে হাসতে বলেছিল। তাদের কথা বলার সময়ে অন্তু এমন ভাব করল যেন তারা নিতান্তই নাবালিকা এবং নির্বোধ, বোকার মত কথা বলে এবং অন্তু যেন তাদের গ্রাহ্যই করে না।

অরুণা একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বলল টুকটুক মেয়েটাই তো ওকে বেশী ফোন করে, জিগ্যেস করলাম কেমন দেখতে, অন্তু নাক সিঁটকে যা বর্ণনা দিল, কোন ভয়ই নেই।

টুকটুক নামটা আমি আগেও একদিন শুনেছিলাম। তার ভাল নাম যে ঋতা তাও অরুণা বলেছিল। আর আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, কলেজের মেযেদের ডাক নামে পবিচিত হওয়া এ আবার কোন ধরণেব আধুনিকতা। তাতে রুবি সেদিন এসেছিল, বললে, তুমি বাবা একেবারে সেকেলে। আমাদেব সময়েও সব ছিল মিনি দত্ত, টুলি মিত্র, ফুচু সান্যাল।

কিন্তু অন্তু টুকটুকের রূপের যে বর্ণনা দিক না কেন, একদিন আপিস থেকে ফিরতেই অরুণা চাযের কাপ রেখে হাসতে হাসতে বললে, ছেলের তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

অরুণা হাসল, বললে, সেই টুকটুক! সে আজ এসেছিল।

তারপব একটু থেমে বললে, কি মিষ্টি চেহারা তুমি ভাবতে পারবে না, আর কি ভাল যে মেয়েটা! অন্তু কিনা ওকে দেখেও নাক সিঁটকোয়। ও ছেলের তাহলে কোন মেয়েই পছন্দ হবে না।

আমি বললাম, ছেলের বউ করার জন্যে তাকে বুঝি তোমার খুব পছন্দ হয়েছে?

অরুণা হেসে ফেলে বললে, তা বলছি না, কিন্তু সেদিন যে অন্তু

বললে, টুকটুক দেখতে তেমন ভাল না! এর চেয়েও সুন্দর মেয়ে কি ওর কপালে জুটবে নাকি।

আমার মনে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খটকা লাগল। আমার মনে হল টুকটুক সম্বন্ধে আমাদের যাতে কোন সন্দেহ না হয়, সেজন্যেই ঐ মিষ্টি চেহারার মেয়েটাকে অন্তু খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করছে। টুকটুককে দেখার জন্যে আমার তখন খুবই আগ্রহ; আমি ফিরে আসার আগেই ওরা দুটিতে চলে গেছে শুনে আমার খারাপ লাগল। ভাবলাম, আরেকটু আগে কেন আসি নি।

এর দিন কয়েক পরেই দুপুরের দিকে আপিস থেকে বেরিয়েছি ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম জমা দিয়ে আসতে, হঠাৎ মেট্রোর নীচে অন্তুকে দেখলাম, সঙ্গে রীতিমত সুশ্রী একটি মেয়ে। স্নিগ্ধ চেহারা, এক মাথা শ্যাম্পু করা হাল্কা চুল। চোখ দুটি......সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটিকে এক নজরে দেখে নিয়েই আমি উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলাম, পাছে অন্তু আমাকে দেখে ফেলে। অর্থাৎ লজ্জা যেন আমারই।

আমি অরুণাকে এসে ফিসফিস করে বর্ণনা দিলাম মেয়েটির আর অরুণা বলল, বা রে, ঐ তো টুকটুক।

টুকটুককে ভাল করে দেখার, কাছে বসে তার সঙ্গে কথা বলার আমার ভীষণ ইচ্ছে হত। এবং আমার সবচেয়ে বড় কৌতূহল ছিল তাকে দেখে বা তার সঙ্গে কথা বলে মেয়েটিকে যাচাই করে নেবার। আমার ধারণা ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে আমি তার ভিতরের চরিত্রটি আবিষ্কার করতে পারব এবং সেই সঙ্গে ধারণা করে নিতে পারব সে সত্যিই অন্তুকে ভালবাসে কি না। কারণ, টুকটুক যথেষ্ট সুশ্রী বলেই আমার সেই পুরোন ভয়টা মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে উঁকি দিত। আমার কেবলই আশঙ্কা হত, শেষ অবধি অন্তু না সেই চরম আঘাতটা পেয়ে বসে।

পুত্রসন্তান যুবক হয়ে উঠলে বাহান্ন বছর বয়সের বাপকেই সব সময়ে তটস্থ থাকতে হয়। আমি মাঝে মাঝে আপিসের ছুটির পর সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে চৌরঙ্গীর দু একটি রেস্টোরেন্টে গিয়ে খেতে খেতে আড্ডা দিতাম, কোনদিন বা শ্রান্ত ক্লান্ত বোধ হলে তাদের সঙ্গে আউটরাম ঘাটের দিকে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে বায়ু সেবনের জন্যে বেড়াতে যেতাম। অস্বীকার করব না, বাহান্ন বছর বয়সেও আমার বুকের ভেতরটা যুবক রয়ে গেছে

বলেই আমি ঐ সব সুদৃশ্য জায়গায় বেড়াতে গিয়ে কখনও কখনও সুদৃশ্য রমণীর দিকেও কয়েক পলক তাকিয়ে দেখেছি। কিন্তু ঐ সব স্থানগুলি প্রেমের তীর্থস্থান জানতাম বলেই আমার বেড়ানোর জায়গাও সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। কারণ, তখন একটাই আতঙ্ক, কোথাও না ওদের দুটিকে অর্থাৎ অন্তু ও টুকটুককে দেখে ফেলি। ওদের কোনদিন যদি লজ্জায় ফেলি, আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের সুন্দর সন্ধ্যা যদি নষ্ট হয়, তাহলে আমার অনুশোচনার যেন শেষ থাকবে না।

এই সময়েই অন্তুদের কলেজে পুজোর ছুটি হল। অরুণার কাছে শুনলাম, টুকটুক তার বাবা-মার সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে যাচ্ছে। টুকটুক নিজেই নাকি তাকে বলে গেছে।

অরুণা বললে, ছেলেটা একেবারে অমানুষ। আমার সামনেই টুকটুক বললে, নিরুপম চিঠি দেব, উত্তর না দিলে দেখবে মজা। অন্তু কি বললে জান? বললে, রিপ্লাই কার্ড দিও, আর নয়তো এখনই খাম পোস্টকার্ডের পয়সা দিয়ে যাও। সত্যি সত্যি ওর কাছ থেকে দুটো টাকা নিল, আমার বকুনিতে কানই দিল না।

টুকটুক যে দিল্লী চলে গেছে তা কয়েকদিন পরেই টের পেলাম। কারণ, অন্তুর নামে যে চিঠিখানি এল, তার ঠিকানা দেখেই বোঝা গেল সেটি কোন মেয়ের লেখা। আমি সে চিঠি নিজেই রেখে দিলাম, নিজেই অন্তুর হাতে তুলে দিলাম, অরুণাকে জানতেও দিলাম না। কারণ আমার ভয় ছিল, অরুণা সে চিঠি খুলে পড়তে পারে বা পড়ার পর ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে। ফলে ওদের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি ঘটতে পারে। এবং মা বা বাবা সে-চিঠি পড়েছে বা নষ্ট করেছে জানতে পারলে অন্তু তখন নিশ্চয় আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে।

কিছুদিন পরেই অরুণার কাছে শুনলাম টুকটুক ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই সে নাকি অরুণাকে ফোন করেছিল। অরুণা বললে, যাই বল, টুকটুক আমাদের খুব ভালবাসে, চিঠি পায় নি কদিন অন্তুর কাছ থেকে খুব ভাবনা হয়েছিল তার, বাড়ি ফিরে ফোন করে জিগ্যেস করল আমরা কেমন আছি।

সত্যি সত্যিই টুকটুককে একদিন দেখলাম। দেখলাম মানে তাকে আমিই ডেকে আনলাম।

আমাদের ফ্ল্যাটখানা তিনতলায়, সামনে একটুখানি ব্যালকনি আছে।

সেদিন শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না, বছর শেষ হয়ে আসছে অথচ ক্যাজুয়েল লীভ পাওনা অনেক। ইচ্ছে করেই আপিস যাই নি। বিকেলে হঠাৎ শুনলাম, নীচে রাস্তা থেকে কোন একটি মেয়ে চিৎকার করে কাকে ডাকছে। দু বার শোনার পর মনে হল মেয়েটি অন্তুকে ডাকছে। আমি ব্যালকনিতে বেরিয়ে দেখি নীচে রাস্তায় টুকটুক চিৎকার করে ডাকছে, অন্তু, অন্তু! ও তখন তিনতলার দিকে চোখ তুলে ডাকছিল, আমাকে দেখেই লজ্জা পেল। ও হয়তো স্যাট্ করে সরে পড়ত, মাথা নামিয়ে নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, তাই আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি ওপরে এস, এস না!

মেয়েটি সিঁড়ির দিকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখে হাসি ছড়িয়ে উঠে এল, আমি তখন সিঁড়ির মাথায়।

আমি বললাম, তুমি টুকটুক, না?

টুকটুক ঘাড় কাৎ করল। আর আমি বললাম, অন্তু না থাকলে ওপরে বুঝি আসা যায় না?

অরুণাও ততক্ষণে এসে পড়েছে, হেসে বললে, সে কথা বল না, আমার সঙ্গে তো ও কতদিন এসে গল্প করে গেছে।

আমি টুকটুককে সামনে বসিয়ে নানান গল্প শুরু করে দিলাম। আমি প্রায় তার সমবয়স্ক হবার চেষ্টা করলাম। হাসলাম এবং হাসালাম। আমি নিজেকে যথেষ্ট মডার্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলাম।

টুকটুক চলে যাবার পর আমি অরুণাকে বললাম, যদি সত্যি সত্যি তেমন কিছু হয়, ভালই হয়, কি ব ?

অরুণা মৃদু হেসে বললে, মেয়েটা ভীষণ ভাল, তাই না?

আমরা রাত্রে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে অন্তু এবং টুকটুককে নিয়ে কোন কোন দিন চাপা গলায় আলোচনা করেছি, আমাদের চোখকে ফাঁকি দেবার যখনই ওরা চেষ্টা করেছে, আমরা হেসেছি, কখন কখন আবার স্বপ্নও দেখেছি।

এরপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। টুকটুক ফোন করলে আমি যদি রিসিভার তুলতাম তাহলে ও আগে আমার খবরাখবর নিত, অরুণার, আর তারপর আমি নিজেই বলতাম, ধর, অন্তুকে ডেকে দিচ্ছি. কিংবা অন্তু তো এখনও ফেরে নি, কলেজে যাও নি তুমি? টুকটুক যখন বাড়িতে আসত, আমি থাকলেও কখন সটান অন্তুর ঘরে চলে যেত, কখন রান্নাঘরে অরুণার কাছে, আবার অন্তুর ঘরে

যাবার আগে এক মিনিট দাঁড়িয়ে কোন কোনদিন আমার সঙ্গে কথাও বলত।

মাঝখানে হঠাৎ কি যে হয়েছিল আমি জানি না, বেশ কিছুদিন টুকটুক আসতও না, ফোনও করত না সেই সময়ে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। অরুণাকে জিগ্যেস করেছিলাম, টুকটুকের কি খবর বল তো? অরুণা বললে, ঝগড়া করেছে, আবার কি। এত বলি, একদিন আসতে বলিস, কেবল এ'ড়িয়ে যায়।

শুনে আমার মনটা দমে গেল। আমার বিশ্বাস হল না। আমি মনে মনে ভয় পেলাম। আমি ভাবলাম, যে আতঙ্কটা আমার মনের মধ্যে বরাবর উঁকি দিয়েছে, সেটাই বোধ হয় সত্যি হল। আমার কেবল ইচ্ছে করত, আগের মতই অন্তুর ঘর থেকে ওদের দুজনের সশব্দ হাসি বা হট্টগোল বা তুচ্ছ ঝগড়াঝাঁটি ভেসে আসুক। একটা কাঠের বাজনা শুনেছিলাম ছেলেবেলায়, ওদের কথা-কাটাকাটি ঠিক তেমনি মিষ্টি লাগত।

আমি সে-সময় অন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। ও মাঝে-মাঝেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেত, একটু খিটখিটেও হয়েছিল। খাবার টেবিলে বসে আমি লক্ষ্য করতাম, ওর খিদে ঠিক আগের মত নেই। আমি কি করব ঠিক করতে পারতাম না, আমি শুধু মনে মনে চাইতাম, ও যেন আঘাত না পায়, কষ্ট না পায়।

তখন গরমকাল, অন্তু বলল, বাবা, চল না এবার দার্জিলিং যাই।

আমি ভাবলাম, কলকাতা ওর কাছে এখন একটা যন্ত্রণা। ও এখান থেকে পালাতে চাইছে। পালাতে।

আমি অরুণাকে বললাম, তাই চল, অন্তু যখন বলছে···

আমি অরুণাকে বললাম, দোষ তোমারই। তুমি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিলে, অথচ, শেষরক্ষার কথা ভাবলে না।

অন্তুর জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হত, অনেক রাত অবধি আমার ঘুম আসত না। অরুণাও তার ব্যথা, তার কষ্ট চেপে রেখেছিল, হঠাৎ একদিন রাত্রে কেঁদে ফে'লে বসল, আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। একটু থেমে হঠাৎ বললে, আচ্ছা আমি যদি টুকটুকদের বাড়ি যাই? আমি নিষেধ করলাম। বললাম, ওঁদের কাউকে তো আমরা চিনি না। কি জানি কি মনে করে বসবেন ওঁরা, তাছাড়া অন্তু জানলে রেগে যাবে, ওর হয়তো সম্মানে লাগবে।

শেষ অবধি তাই দার্জিলিঙেই আমরা গেলাম। ক্যাপিটল সিনেমার কাছেই হোটেলে কুণ্ডুতে গিয়ে উঠলাম। সেদিনই বিকেলে বেড়াতে গেলাম ম্যালে।

আমরা কেউই দেখতে পাই নি, টুকটুক ছুটে এল একমুখ হাসি নিয়ে। অন্তু, তুমি? গ্র্যাণ্ড হয়েছে, কাকাবাবু আপনারাও এসেছেন। বলে তার বাবা-মা ভাই-বোনেদের দিকে ফিরে তাকাল। আমাদের ডেকে নিয়ে গেল।

আলাপ হল সকলের সঙ্গে। বোঝা গেল অন্তুকে ওঁরা খুব ভাল করেই চেনেন, অন্তু ওঁদের বাড়ি অনেকবার গেছে।

টুকটুকের বাবা খুব সজ্জন, মা বেশ মিশুকে।

প্রতিদিন সকাল বিকেল আমাদের দেখা হত, কখনও ম্যালে বেড়াতে এসে, কখনও দোকানে বাজারে, কখনও দল বেঁধেই আমরা এখানে-ওখানে যেতাম। কিন্তু অন্তু আর টুকটুক সব সময়ে আলাদা। হয় ওরা আমাদের সকলের পিছনে পিছিয়ে যেত, কিংবা তড়বড় করে অনেক আগে আগে চলে যেত। আবার এক একদিন ওরা দুজনেই একেবারেই দলছাড়া হয়ে কোথায় যেত কে জানে।

আমি অরুণাকে বললাম, যাক বাবা ঝগড়া মিটে গেছে?

অরুণা বললে, ঝগড়া না ছাই।

—তার মানে? আমি বুঝতে পারলাম না অরুণা কি বলতে চায়।

অরুণা হাসল।—সব প্ল্যান, সব প্ল্যান করে এসেছে, বুঝতে পারছ না। তা না হলে হঠাৎ দার্জিলিং আসতে চাইবে কেন অন্তু।

ওদের দুজনকে দেখে আমরা আবার হাসাহাসি করলাম। আর অরুণা বললে, দুটিতে বেশ মানায় কিন্তু।

একদিন আমরা অতটা ওপরে উঠতে পারি নি, মাঝখানেই থেমে গিয়েছিলাম, আর অন্তু-টুকটুক অনেকখানি ওপরে উপরে উঠে গিয়ে একটা বিশাল পাথরের ওপর বসেছিল। ওদের দুজনের বসার ভঙ্গিটা ছিল ছবির মত। ওরা খুব হাসছিল আর গল্প করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে আমি ফিসফিস করে অরুণাকে বললাম, ভাখ ভাখ, ঠিক যেন মেড ফর ঈচ আদার!

অরুণা হেসে উঠে বললে, সত্যি!

দার্জিলিং থেকে ফিরে এলাম খুব একটা খুশী মন নিয়ে। সমস্ত বুকের

ভেতরটা যেন ভরাট। মনে হল জীবনে এত খুশী আমি কখন হই নি। অন্তুও ট্রেনে আসবার সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, ওয়াণ্ডারফুল, দার্জিলিং এত সুন্দর ভাবতেই পারি নি। আমি আর অরুণা চোখ-চাওয়াচাওয়ি করে হাসি চেপেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে আবার সেই অসহ্য গরম, অন্যদিকে মন দেবার জোটি ছিল না। তবু এরই মাঝে আমি সহকর্মী বন্ধুদের কাছে দার্জিলিংয়ের ঘটনা সবিস্তারে বলেছি, বলে আনন্দ পেয়েছি, আর কপট আক্ষেপের গলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, আরে মশাই, কি নির্লজ্জ, কি সাহস মেয়েটারও আমরা যেন বাপ-মা নই, স্রেফ অচেনা পাবলিক।

বন্ধুরা মজা পেয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, এখনকার হালচালই ওরকম, কি আর করব, আমরাও সহ্য করে যাচ্ছি। তাদের মধ্যে দু একজন আবার গোঁড়া, বাহান্নতেই বৃদ্ধ, তারা দোষ দিয়েছে আমাকে, আস্কারা দিয়ে দিয়ে আপনারাই তো ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছেন।

আমি মনে মনে হেসেছি। এবং আমি মনে মনে স্বপ্ন দেখেছি। তারা তাদের ছেলেদের জন্যে অনেক কিছু চাইত, ভাল রেজাল্ট, ভাল চাকরি উন্নতি, আরও কত কি। আমার চাওয়া শুধু একটিই। অন্তু যেন সুখী হ অন্তুর এই একুশ বছরের স্বপ্নমাখা নরম বুকে যেন কেউ আঘাত না দেয়। এই বয়সেই সে যেন আমার মত ভেঙে না পড়ে। আমার একুশ বছরের মত।

অরুণার কাছে শুনেছিলাম, টুকটুক আবার এসেছিল একদিন, সারা দুপুর অন্তুর ঘরে বসে গল্প করেছে, অরুণা আচার রোদে দিয়েছিল, চেয়ে নিয়ে চেটে চেটে খেয়েছে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে বসে গল্প করার কথায় আমার একটু ভয় হত, একটু অস্বস্তি। ঐ বয়েসটাকে বিশ্বাস করতে পারতাম না আমি, ভাবতাম শেষে কিছু একটা ··পরমুহূর্তে মনে হত ওরা এত খারাপ হবে না, আমাদের মনটাই খারাপ।

রুবি একদিন এসে বললে, জান মা, তোমার জামাই বলছিল অন্তুর নাকি আজকাল খুব পাখা গজিয়েছে।

অরুণা হেসে বললে, তা আর কি করা যাবে, দিনকালই যে বদলে গেছে।

রুবি বললে, আমার বেলায় তো খুব কড়া শাসন ছিল তোমার।

সত্যি কথা বলতে কি, রুবিকে আমরা একটু আগলে আগলেই রাখতাম। কিন্তু রুবি তো সুখী হয়েছে।

পরে শুনলাম, রুবি বলেছে অরুণাকে, তোমার জামাই দেখেছে, একটা ছিপছিপে মেয়েকে নিয়ে কি একটা হোটেল থেকে বেরুচ্ছে। (অরুণা বললে) তোমাকে বলি নি, ভেবেছিলাম চোখের ভুল, সেদিন দুপুরে···

অরুণা হঠাৎ অন্তুর ওপর রেগে গেল। আমাকে বললে, এভাবে বেশী দিন ভাল নয়, বিয়েটিয়েই যদি করতে চায় করুক না।

কিছু একটা ঘটে যেতে পারে এই ভয় তারপর থেকে আমাকে পেয়ে বসল। যদি কিছু ঘটে, আমি ভাবতাম, তা হলে আমাদের প্রশ্রয়ই তার জন্যে দায়ী। আবার ভাবতাম অত ভয়ের কি আছে, ওরা বিয়ে করতে চাইলে টুকটুকের বাবা নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। তিনি তো আরও মডার্ন।

তবু ভয় হত বলেই অরুণাকে বলেছিলাম, অন্তুকে স্পষ্ট করে জিগ্যেস করতে। তবে পাস করার আগে, কোন চাকরি না পেয়ে ওর বিয়ে করার কথা আমি ভাবতাম না।

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ টুকটুক একদিন এসে হাজির।—নিরুপম আছে কাকাবাবু।

আমি ওকে দেখে বেশ খুশী হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, না।

টুকটুক সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম, নিরুপম ছাডা কি আব কারও সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভাল লাগে না? আমরা বুড়ো হয়েছি বলে কি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেও পারি না!

টুকটুক মাথা নীচু করে লাজুক হাসল।

আমি বললাম, বস এখানে।

ও চুপটি করে সামনের চেয়ারে বসল বড লম্বা ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে।

আমি বললাম, কি খবরটবর বল তোমার। অন্তু এখুনি ফিরবে, ওকে ওষুধ কিনতে পাঠিয়েছি।

টুকটুক মাথা নীচু করেই বললে, খবর ... টা আছে কাকাবাবু। মৃদু সলজ্জ হেসে বলল, আমার বিয়ে।

বিয়ে? আমার বুকের মধ্যে কেউ যেন দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।—কবে? কোথায়? কি করে ছেলেটি?

আমি ঠিক কি প্রশ্ন করেছিলাম, আমার নিজেরই মনে নেই।

টুকটুক ব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বের করে দিল, আমি পড়লাম, কিন্তু কিছুই মাথার মধ্যে ঢুকল না। সব অক্ষরগুলো ঝাপসা লাগল। আমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠল। আমার ভিতরটা কেবল বলতে লাগল, এ কি হল, এ কি হল।

কোনরকমে মুখে হাসি এনে বললাম, ভাল ভাল।

আর টুকটুক উঠে বলল, আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি। নিরুপমকে একটু থাকতে বলবেন কাকাবাবু।

টুকটুক চলে গেল, আর তখনই অরুণা এসে বললে, টুকটুকের গলা শুনছিলাম না ?

আমি অরুণাকে সব বললাম, অরুণা আমার সামনে এসে বসল, আমরা পরস্পরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হওয়ার পর নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে বসে রইলাম। ফিসফিস করে বললাম, এই বয়সে, বেচারী, প্রথম থেকেই আমার এই এক ভয় ছিল।

অরুণা বললে, এইটুকু ছেলে, ও সহ্য করবে কি করে।

আমার সত্যি কান্না পাচ্ছিল। আমার নিজের একুশ বছর বয়সের সেই আঘাতটার কথা মনে পড়ছিল। অন্তু ফিরে এসে ওষুধটা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল, আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না। এমন কি টুকটুক এসেছিল বা থাকতে বলেছে সে-কথাও বলতে পারলাম না।

মিনিট কয়েক পরেই টুকটুক ফিরে এল, আমি ওকে অন্তুর ঘর দেখিয়ে দিলাম ইশারায়, শুধু বললাম, আছে।

আমি আর অরুণা অন্তুর ঘরের দিকে তাকাতে পারলাম না। শুধু চুপ করে বসে রইলাম আতঙ্কে অপেক্ষায়। যেন, এখনই একটা ভূমিকম্প হয়ে যাবে অন্তুর বুকের মধ্যে এখনই একটা ভূমিকম্প হবে!

হঠাৎ একটা হট্টগোল ভেসে এল ওর ঘর থেকে। চিৎকার, উল্লাস, হই হই। 'তুমি একটা ইডিয়েট', অন্তুর গলা। 'নিরুপম ভাল হবে না বলছি, তুমি না হলে…'

আমি অরুণার চোখের দিকে তাকালাম। অরুণা আমার চোখের দিকে তাকাল।

একটু পরেই অন্তু আর টুকটুক বেরিয়ে এল।

অন্তু চিৎকার করছে, আচ্ছা বাবা, মা, তুমি বল, স্টুপিড বলব না ওকে? ওর পরশু বিয়ে, একটা বন্ধুকে এখনও নেমন্তন করে নি।

টুকটুক সাক্ষী মানল অরুণাকে।—আচ্ছা কাকীমা, আমি কাল পরশু দু দুবার ফোন করি নি? নিরুপম, তুমি বাড়ীতে থাক নাকি কোন সময়ে?

ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল বন্ধুদের নেমন্তন করতে।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম। পরস্পরের দিকে তাকালাম একটু অবাক হয়ে।

অরুণা হঠাৎ বললে, তুমি এবার নিশ্চিন্ত হলে তো!

বললাম, জানি না, বুঝতে পারছি না।

ফ্রীজ

বাবা, তুমি একটা ফ্রীজ কেনো না গো। কুটকুট বললে। আমার পাঁচ বছর বয়সের ছেলে কুটকুট সাদা হাফ প্যাণ্টের দু পকেটে দুটো খুদে খুদে হাত ঢুকিয়ে বললে। আমি চমকে উঠলাম। নীলিমা চমকে উঠল। আমি আর নীলিমা চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললাম।

কুটকুট কে নাম রেখেছিল? টিনকুমাসী না? ঠিক। তখন থেকেই ওই কুটকুট করে কথা। ফ্রীজ। ওর মুখে, কুটকুটের মুখে, ফ্রীজ কথাটা শুনে অবাক লাগল, বেশ লাগল, মজা লাগল।

সেই খুব ছোট ছিল যখন, মুখে আধো আধো বুলি ফুটেছে, তখন হাত নেড়ে নেড়ে টা টা করলে যেমন মজা লাগত, তেমনি।

মেজ্‌জ্যাঠা সেবার যাবার সময় সবে সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, কুটকুট কেমন হাত নেড়ে নেড়ে স্বর টেনে টেনে টা টা বলল, আর মেজ্‌জ্যাঠাও তেমনি রসিক মানুষ, কুটকুটের দিকে হাত নেড়ে বললেন, না, টা টা নয়, বিড়লা, বিড়লা।

আমরা তো হেসে লুটোপুটি!

ওর মুখে 'ফ্রীজ' শুনে তেমনি হাসি পেল। ভালও লাগল। আমরা তো সাহেব হতে পারলাম না। না ছিল সঙ্গতি, না বাসনা। কি ছাই স্বাধীনতা, স্বদেশীয়ানা, ঐতিহ্য…বাজে বুলি সব! বিশ্বাস করে পস্তাতে হল! কায়দা করে ইংরেজী বুকনি কিছুটা যদি শিখতাম, গ্যাবার্ডিনের স্যুট অবশ্য: পরি, কিন্তু হাঁটাচলার কায়দা? যে যাই বলুক কুটকুটকে মিশনারী ইস্কুলে দিয়ে ভালই করেছি। জীবনে উন্নতি করতে পারবে। দিশী ইস্কুলগুলো…

—ইস্কুল আবার কি, বল স্কুল।

—বেশ বাবা বেশ। তোর অত মাস্টারি সহ্য হয় না। নীলিমা হাসতে হাসতে বলেছিল। জানি, মুখে যাই বলুক, ওটুকু শুনতে ওর ভালই লাগে।

—ফ্রীজটাও বুঝি ইস্কুলে শিখেছিস? আমি জিগ্যেস করলাম।

—পাগল হয়েছ? হাসল নীলিমা। এই, বল্ সত্যি করে, মিঠুপিসীদের কাছে শুনে এসেছিস, না?

—বাঃ রে। শুনব কেন, মিঠুপিসীদের বাড়িতে তো আছে।

মিঠুপিসী আর মিঠুপিসী। গড়িয়াহাটের মোড়ে এই চারতলার ফ্ল্যাটে থেকেও শাস্তি নেই।

ফ্ল্যাটটা অবশ্য ভালই। দুখানা ঘর, ভাড়া দুশো টাকা। তা হোক। মাটি অনেক দূর বটে, কিন্তু আকাশ অনেক কাছে। কলকাতায় কজন আর আকাশ পায়!

কিন্তু দোতলার ওই মিঠুপিসীরা এক সমস্যা। শুধু কুটকুটকে দোষ দিয়ে কি হবে, নীলিমাও। জান, মিঠুরা নাকি সুন্দর একজোড়া ইংলিশ খাট কিনেছে। খাট তো কাঠেরই হয়, তার আবার ইংলিশ আর বেংগলি আছে নাকি। হয় হয়তো। শুধু হয় বললেই তো হবে না, তক্তপোশ বিদেয় দিয়ে আনতেও হয়েছে। বাঃ, এ পাড়ায় থাকতে হলে…সেই যে বলে না, ডু অ্যাজ দি রোমানস, রোমানরা যা করে।

হেসে বলেছিলাম, রোমান্সও করে।

—করব।

আবার কখনও: মিঠুদের একটা রেডিওগ্রাম এসেছে, কি মিষ্টি আওয়াজ, না শুনলে বিশ্বাস করবে না।

কুটকুট সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছে, হ্যাঁ বাবা, সত্যি।

অতএব পুরনো রেডিওটা খারাপ হওয়ার পর আর মেরামত করতে দিই নি। বছরখানেকের চেষ্টায় শেষ অবধি একটা রেডিওগ্রামও এনেছিলাম। তারপর বেশ কিছুদিন শান্তিতে ছিলাম।

এখন আবার ফ্রীজ। নীলিমা অসুখে পড়েছিল, মিঠুদের ফ্ল্যাটে যেতে পারে নি। তাই খবরটা তার কাছেও নতুন।

আমার মুখ দিয়ে বড় জোর রেফ্রিজারেটর কথাটাই বের হতে পারে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি। 'ফ্রীজ' শুনেছি বৈ কি, কিন্তু উচ্চারণ করতে কেমন অস্বস্তি।

আর কুটকুট: বাবা, তুমি একটা ফ্রীজ কেনো না গো।

নীলিমা হাসল কুটকুট আবার ওই কথা বলতেই। তারপর শাসন করল। —আবার গো বলছিস?

বললাম, ফ্রীজ মানে রেফ্রিজারেটর কিনতে হলে—গো নয় গন, গেছি।

—তোমার তো সবতাতেই ওই এক কথা।

—তোমার অসুখে…

—অত অসুখ অসুখ শুনিও না, এবারই নয় হয়েছে। তার আবার উঠতে বসতে কথা শোনাচ্ছ। ডাক্তার না ডাকলেই পারতে।

—ডাকলে যে ওরা যেতে চায় না তা কি করে জানব। চেহারাটা তোমার খারাপ হলে হয়তো…

নীলিমা চোখ পাকাল! তারপর হাসল। —শরীরটা আমার অনেক ভাল হয়েছে এখন, তাই না?

—একটু।

—তোমার সবতাতেই ওই। ভারী খুঁতখুঁতে তুমি। আমি নিজে বুঝতে পারছি…

হাসলাম। বললাম, তোমার অসুখ হয়ে একদিক থেকে ভালই হয়েছে। মেজদি আর আসে নি।

নীলিমা গম্ভীর হল।—আসবে কেন, সাহায্য হত যে। ওদের যত ভাব-ভালবাসা তো টাকার।

চুপ করতে হল। নীলিমার মুখে কথাগুলো শুনতে ভাল লাগে না। যখন আসে, চায়, দিতে পারি না, কিংবা কষ্টেসিষ্টে কিছু দিই, তখন ভিতরে মেজদির ওপর রাগ হয়। কেন রে বাবা, আরও তো তিনটে ভাই আছে, তোমার শ্বশুরবাড়ি আছে…

তবু বললাম, বিধবা মানুষ, দু দুটো ছেলের পড়ার খরচ!

—ওঃ! কত দরদ, অসুখে একবার খবর নিতে এল?

—তোমার মাসীমাই বা কেমন, এমন একটা অসুখের খরচ, তবু, বুলির বিয়েতে কমদামী শাড়ি দিয়েছি বলে…

—মাসীর দোষ কি বল, পাঁচজনের সামনে তো বলতে হয়েছে, নীলুর বর এই দিয়েছে।

তা ঠিক।

নীলিমা হাসল।—ফ্রীজ কিন্তু একটা কিনতে হবে, থাকলে কত সুবিধে।

সুবিধে? হয়তো হবে। চার তলার ওপর থাকা মানে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকা। একটা ফেরিওলা ওঠে না, একটা ছুঁচ কিনতে সিঁড়ি

ভেঙে নামো। তখন মনে হয়েছিল অনেকখানি আকাশ পাওয়া যাবে। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যেবেলায় থালার মত হলদে চাঁদটা মনে হয় জানলায় আটকে আছে। কিন্তু তার জন্যে সারা মাস ঝামেলা। শুধু খবরের কাগজওয়ালাটা কেমন তাক করে ছুঁড়ে দেয়, ঠিক জানালা গলে ভিতরে এসে পড়ে। সিঁড়ি ভাঙতে হবে ভাবলে বাজার যেতে ইচ্ছে হয় না। দু একটা জিনিস রোজই ভুলে যাই। আপিস থেকে ফিরে একবার এখানে এসে পৌছলে আর নামতে মন চায় না। এর চেয়ে একতলার সেই গলি অনেক ভাল ছিল।

—একটা ফ্রীজ থাকলে কিন্তু···

বলেছিলাম, একটি হাজার টাকা। তা জান?

—মাসে মাসে কিস্তিতে নাকি পাওয়া যায়?

কি উত্তর দেব, মনে মনে ভাবলাম, মেয়েরা কি অবুঝ। এর চেয়ে সেকালের বউরা অনেক ভাল ছিল। অতশত খবর রাখত না। হায়ার পারচেজ! কিস্তির টাকাটা যেন টাকা নয়। মাসের শেষে এমনিতেই তো টানাটানি। নেই বললেই তোমাদের দায় খালাস। কিস্তি শোধ দেব কোত্থেকে শুনি।

—সেকালের বউরা ভাল ছিল? ঠোঁট ওল্টাল নীলিমা। বললে, এক গা গয়না ছিল না তাদের? আমার কি আছে?

—সে তো তারা বাপের বাড়ি থেকে আনত। তুমিও আনলেই পারতে।

বাস্। সে কি চাউনি। পারলে ভস্ম করে দেয়।

অতএব দুজনেই স্পীকটিনট। কুটকুট ব্যাপার বুঝে কখন কেটে পড়েছে। হয়ত মিঠুপিসীদের ফ্ল্যাটে। আরও নতুন কি এসেছে তার খোঁজ নিতে।

আর আমার হঠাৎ মেজদির কথা মনে পড়ল। এক গা গয়না তার ছিল। তারপর রেলের অ্যাকসিডেণ্টে···ওঃ ভাবতেও সারা শরীর শিউরে ওঠে। মেজদির কতই বা বয়েস তখন, তেইশ চব্বিশ···সাদা ধবধবে থান পরা মুখখানা প্রথম যেদিন দেখলাম, এখনও মনে পড়লে বুকটা টনটন করে ওঠে।

ফ্রীজ কিন্তু শেষ অবধি একটা কিনতেই হল। উইণ্ডফল। আপিসে বোনাস নিয়ে যুদ্ধ চলছিল, মিটে গেল হঠাৎ। নগদ নশো টাকা, ভাবতেও পারি নি, হঠাৎ এভাবে পেয়ে যাব। টাকাটা পাওয়ার খবর পেয়ে মনে মনে একটা বাজেট কষে ফেলেছিলাম। নশো টাকা। অনেক কিছু করা যাবে। দুশো টাকা ভাড়া গুনতেই মাইনের টাকা প্রায় অর্ধেক। শ'চারেক থাকে,

কুটকুটের ইস্কুল, ইলেকট্রিক, ঝি, ডাক্তার ওষুধ, অমুকের বিয়ে। বাড়তি টাকাটা পেলে ভাবলাম, কুটকুটের পড়ার টেবিলটা করে ফেলব। নীলিমা অনেকদিন থেকে বলছে, কাঁসার থালাগুলো ফেটে গেছে, স্টেনলেস স্টীলের এক সেট বাসন···আর, মেজদির জন্যে সত্যি কষ্ট হয়, নীতার বিয়ে যদি ঠিক হয়···অন্তত শ'পাঁচেক টাকা মেজদিকে দিতেই হবে। টাকাটা হাতে পেয়ে সব হিসেব ঠিক করে রেখেছিলাম। বাড়ি ফিরতেই কিন্তু সব নস্যাৎ হয়ে গেল।

—আমি জানি, ফ্রীজ কেনা হবেই। বোনাসের টাকা পেয়েছি শুনেই নীলিমা একমুখ খুশী নিয়ে বলে উঠল।

ফ্রীজ! আমি এ কমাসে ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই কবে কুটকুট এসে বলেছিল, তারপর একবারই বোধহয় নীলিমা মনে পড়িয়েছিল।

—সে অনেক সুবিধে, তুমি ভাবতেই পারবে না। মিঠু তো বলছিল। মাছ, মাংস, ডিম, ফলটল ·

আপত্তির স্বরে বললাম, মাছ মাংস তো টাটকাই পাওয়া যায়।

—ধর একদিন বাজারে যেতে পারলে না। তারপর কমলা নেবুগুলো তো আনতে না আনতে পচে যায়।

যুক্তির অভাব নেই।—কত কম সময়ে বরফ করা যায় জান? ওই যে অসুখের সময় তোমাকে রাত্রে ছুটতে হত···

সত্যি, এতগুলো সমস্যা সৃষ্টি করে তার সমাধান করে দিয়েছে যে লোকটি···কে আবিষ্কার করেছিল?

নাঃ জিনিসটা সত্যি বড় সুন্দর। বাড়ীতে ফ্রীজটা পৌঁছে দিয়ে চালু করে দিতেই মনটা ফুর্তি ফুর্তি লাগল। বেশ সুন্দর দেখতে কিন্তু। সাদা ধবধবে। ঘরটাও সুন্দর হয়ে উঠল। বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে তো। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি, কাগজ পড়ছি, কথা বলছি, আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি ওটার দিকে। কুটকুট যেমন পড়তে পড়তে জন্মদিনে পাওয়া খেলনাটার দিকে তাকাত, তেমনি। আমরা দুজনেই যেন কুটকুট হয়ে গেছি। নীলিমার মনটাও খুশী। মুখে হাসি লেগেই আছে। একটু ভিতরে ভিতরে গর্বও হচ্ছে। দরকার ছিল না, এক ডজন ডিম আর আপেলটাপেল কিনে এনে ফ্রীজের ভেতর রেখেছে নীলিমা।

পুডিং বানিয়ে ফেলল একদিন। অত কি হবে? বাঃ ফ্রীজ তো রয়েছে, রেখে দেব! যদি হঠাৎ কেউ আসে, সন্দেশ তো নেই, দেওয়া যাবে।

যদি হঠাৎ কেউ আসে। যদি আসে, না, এল। মেজদি। ধুতিপাড় সাদা ধবধবে শাড়ি পরে, শুকনো মুখে। কেমন আছিস টাছিস বলার পর ফ্রীজটা দেখল আড়চোখে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সুখে আছিস দেখছি, সুখে থাকলেই ভাল। আমার যে কিভাবে দিন যাচ্ছে···

মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, কি যে বল, টানাটানির শেষ নেই। সত্যি টানাটানির শেষ নেই। পড়ার টেবিল আর স্টীলের বাসনে দেখতে না দেখতে তিনশো টাকা উড়ে গেল। ছশো টাকা জমা দিয়ে এখন মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকার কিস্তি। শোধ দাও এক বছর ধরে। এদিকে ফ্রীজটা আসার পর থেকে ইলেকট্রিকের বিল যত না বেড়েছে, ফ্রীজের ভেতর কিছু না রাখলে খারাপ দেখায় বলে বাজার খরচ ডবল।

সে কথা তো মেজদিকে বলা যায় না!

মেজদি কিন্তু খোঁটা দিতে ছাড়ল না।—ঠাণ্ডা কল কিনেছিস, তোদের আবার টানাটানি!

মাথাটা গরম হয়ে উঠল। মেজদির ওপর নয়, ফ্রীজটার ওপরই রেগে গেলাম।

যাবার সময় কুড়িটা টাকা চাইল মেজদি, কিন্তু কি করে দেব! বললাম, তুমি বুঝতে পারছ না···

—সব বুঝিরে, সব বুঝি। গরীব মেজদিটার জন্যেই টাকা নেই, এদিকে গাড়ি কর, বাড়ি কর···তোরা সুখে থাকলেই হল।

বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মেজদি। আর কোন কথার জুৎসই উত্তর দিতে না পেরে ভিতরে ভিতরে গজরালাম।

চলে যাবার পর বললাম, দেখলে তো। ফ্রীজ চাই! প্রায় ভেংচি কাটলাম। —কেনো এবার।

আত্মীয়স্বজন কেউ আসছিল না, ফ্রীজটা দেখাতে না পেরে নীলিমার তৃপ্তি ছিল না। যদি বা মেজদি এল, কোথায় খুলে সব খুঁটিনাটি দেখাবে, খুশী খুশী মুখে মেজদি তারিফ করবে, ছোটদাদের বাড়িতে গিয়ে গল্প করবে—তা নয়, ফ্রীজটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলই না।

চলে যেতেই বললাম, ফ্রীজ চাই। কেনো এবার।

নীলিমা সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ল।—সব জানা আছে, অপরের ভাল কেই বা দেখতে পারে। ওরা তো পারবেই না। শুধু টাকার সম্পর্ক।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ছুজনেই হেসে উঠে আলোচনা। —আচ্ছা, বিনুদের বাড়িতেও তো খবর পৌঁছে যাবে? কি বলবে বল তো ওরা? হিংসে ঠিকই হবে। শুনুক না। সেবার একটা টেপ রেকর্ডার কিনে ওদের কি অহঙ্কার।

নীলিমা হেসে উঠল।—আর দিদি জামাইবাবু এসে যদি দেখে ··একটা ভাঙা ঝরঝরে গাডি কিনেছে তাতে কি দম্ভ। নীলিমা মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি কাটল।—গাড়ি পাঠিয়ে দেব, যাস একদিন! কেন, ট্রামবাস নেই, ট্যাক্সি নেই!

ওর মুখ ভ্যাংচানি দেখে হেসে ফেললাম। ভালও লাগল। তা ঠিক, ফ্রীজটা কিনে ভালই হয়েছে।

কে কখন কোথায় কি গর্ব করেছে, কতখানি অহঙ্কার দেখিয়েছে সব একে মনে পডতে লাগল। আর ইচ্ছে হল তাদের সকলের চোখের সামনে ফ্রীজটা তুলে ধরি। ওটা দেখে কার মনে কতখানি হিংসে হবে ভাবলাম, ছুজনে আলোচনা করলাম, হাসলাম।

শুধু থেকে থেকে মেজদির কথাটা খোঁচা দিল। বেচারী। যেখানেই যায়, সকলেই মুখ বাঁকায়। নীতার বিয়েটা যদি সত্যি ঠিক হয়ে যায়, কি যে করবে ভেবে পেলাম না। আমিই বা কি করি।—আমার সব ভাই কটা যদি ছু পাঁচশো করে দেয় ··মেজদি বলেছিল। দিই কি করে?

ফ্রীজটা দেখে মেজদি তো খুশী হবেই না। কিন্তু, কিন্তু ওটা দেখে কে খুশী হবে খুঁজে পেলাম না।

নীলিমা শুধু বললে, মা কিন্তু খুশী হবে।

কুটকুট ঘুমোয় নি। ইস্, ছেলেটা চুপ করে ঘুমের ভান করে পডে পডে সব শুনেছে।

হঠাৎ তাই বলে উঠল, আমি কিন্তু মিঠুপিসীকে শুনিয়ে দিয়েছি।

—ঘুমো! ধমক দিয়ে উঠল নীলিমা।

গল্প করতে করতে আমি নিজেও কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর রাত্রে হঠাৎ কেন জানি ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার, চতুর্দিক অন্ধকার। আলো নিবিয়ে দিয়ে নীলিমাও কখন ঘুমিয়েছে।

ওদিকে চাঁদটা কখন জানালার পাশ থেকে সরে গেছে। চোখ ফেরাতেই হঠাৎ শিউরে উঠলাম। মেজদি না? মেজদি? ধুতিপাড় সাদা ধবধবে শাড়ি পরা মেজদির মত মনে হল, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি বেড সুইচটা টিপে আলো জ্বালালাম। তরতর করে ভয়টা নেমে গেল।

না, সাদা ফ্রীজটা! তেরছাভাবে এক ফালি চাঁদের আলো পড়েছে।

নিশ্চিন্তে এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি।

জাল

দোকানদার লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। একটু যেন উপহাস, একটু বিরক্তি। তারপর আমার দশ টাকার নোটখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা জাল নোট।

আমি সত্যি সত্যি চমকে উঠলাম। —জাল ?

ভদ্রলোক কোন কথাই বললেন না। ততক্ষণে তিনি অন্য খদ্দেরের দিকে মন দিযেছেন। আর আমাব সমস্ত ব্যক্তিত্ব সেই মুহূর্তে মাটিতে মিশে গেছে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলে ঠিক এমনই মনে হয় কিনা জানি না। আমাব নিজের কাছে নিজেকে ভীষণ হতাশ লাগল। দোকানদাব ভদ্রলোক কি ভিতরে ভিতরে হাসছেন। খুব একটা খুশী খুশী মুখ কবে অন্য খদ্দেরেব সঙ্গে তিনি তখন কথা বলতে শুরু কবেছেন। একজন জেনেশুনে একটা জাল নোট চালাতে এসেছিল, ঠিক ধরে ফেলেছেন, তাই একটা যুদ্ধজয়ের আনন্দ তাঁর মুখে। আমাব নিজেকে ভীষণ ছোট লাগল। কেনা প্যাকেটটা ফেলে রেখে আমি বেরিয়ে এলাম। আনন্দ আর টুকুকে টানতে টানতে।

দোকান থেকে বেবিয়ে আসতেই লজ্জায় মুখ লুকোন ব্যক্তিত্বটা প্রচণ্ড বাগ হয়ে উঠল। বাগটা ছিলই, যতক্ষণ দোকানের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণও। চাপা ছিল, এখন উপহাসের কিংবা ঘৃণার চোখ দুটোব কাছ থেকে পালিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাগটা ভূমিকম্প হযে উঠতে চাইল। এইমাত্র যে দোকানে একশো টাকার নোট দিয়ে জিনিসের দাম মিটিয়েছি রাগটা তারই বিরুদ্ধে।

আমার পকেটে এখনও কয়েকটা একশো টাকার নোট রয়েছে। দশ টাকার নোটও গোটা কয়েক। তবু জাল নোটের বদলে আবার একটা নতুন নোট দেয়ার কথা মনেই হল না। আসলে ঐ বাকী পাঁচখানা দশ টাকার নোটকে বোধহয় সাক্ষী রাখতে চাইলাম। সত্যি কি তাই ? না, দোকানদার ভদ্রলোকের কাছে প্রমাণ করতে চাইলাম যে আমি সৎ, আমি অনেষ্ট।

অর্থাৎ আমার কাছে আর টাকা নেই। জেনেশুনে কেউ কি শুধু একটা-জাল নোট নিয়ে জিনিস কিনতে আসে!

জানি না, এতশত কথা ভাবি নি, ভাবার মত মনের অবস্থা ছিল না। এমনিতেই বিরক্তির শেষ নেই। পূজোর বাজার করতে বেরিয়েছি, সঙ্গে আমার ছেলে আনন্দ আর মেয়ে টুকু। ওদেব চোখের সামনে এতখানি ছোট হতে হল বলে আরেক লজ্জা।

ফুটপাথ ধরে আমি তখন হনহন করে চলেছি। সেই আগের জুতোর দোকানটার দিকে। ওদের হাতে দু তিনটে করে প্যাকেট। আমার হাতেও।

আমাব রাগটা বোধহয় আসলে অহঙ্কার, আমি জ্ঞানত কাউকে ঠকাই না. ট্রামের টিকিট কাটা না হলে নামবার আগে কনডাক্টারকে ডেকে পয়সা দিই। ইচ্ছে থাকলে ঘুষ না হোক, দু চারটে প্রেজেণ্টেশন পেতে পারতাম। নিই না। অন্যায় সহ্য করতে পারি না, প্রতিবাদ করে বসি। আর সেই আমাকে কিনা অপদস্থ হতে হল?

টুকু বয়সে ছোট। ও আমার সঙ্গে তাল দিয়ে হাঁটতে পারছিল না। এক একবার পিছিয়ে পড়ছিল, এক একবার ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলছিল।

ও হঠাৎ বললে, জাল নোট কি বাবা?

আমি কোন উত্তর দিলাম না। তখনও আমার মধ্যে প্রচণ্ড রাগটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আনন্দই ওব কথার উত্তর দিল। বললে, জাল মানে জানিস না? নকল, নকল। মানে মিথ্যে আর কি।

টুকু তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। বললে, নোট আবার মিথ্যে হয় নাকি?

আমার তখন ওসব কথার দিকে কান নেই। মন নেই বোঝাবার।

এইমাত্র জুতোব দোকান থেকে জুতো কিনেছি দুজনেব। কি ভিড, কি ভিড়। ডাকাডাকি চেঁচামিচি করে সেলসম্যানকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করতেই পনের মিনিট লেগেছে। তারপর আরও পনের মিনিট। জুতোর প্যাকেট দুটো বগলদাবা করে ক্যাশে একশো টাকার নোট দিয়েছি। তখন আমার কাছে আর একটাও দশ টাকার নোট ছিল না। বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ক্যাশিয়ার একশো টাকার নোটখানা নিয়ে ছ'খানা দশ টাকার নোট

আর কিছু দু টাকা এক টাকা ফেরৎ দিয়েছিল। কিন্তু এত বড় দোকান, তারা কেন জাল নোট দেবে? নেবার সময় তো দিব্যি দেখেশুনে নিচ্ছে।

আমি গটগট করে সেই জুতোর দোকানে ফিরে এলাম। জাল নোটখানা এগিয়ে দিয়ে বললাম, নোটটা বদলে দিন, এটা নিতে চাইছে না।

ক্যাশিয়ার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বোঝাবার জন্যে বললাম, এক্ষুনি নিয়ে গেছি একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে, এই দেখুন বাকী পাঁচখানা···পকেট থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বের করে দেখালাম।

ক্যাশিয়ার নিজের কাজ করতে করতে বললেন, তখনই দেখে নেওয়া উচিত ছিল।

দেখে নেওয়া যে উচিত ছিল সেটা আমিও জানি। জানি বলেই তো ভিতরে ভিতরে এত রাগ। রাগটা বোধহয় নিজের ওপরই। তবু তখনও একেবারে নিরাশ হই নি বলেই রাগটা চেপে রাখার চেষ্টা করলাম। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, দেখে নিলে তো তখনই ফেরত দিতাম।

আমি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আশায় আশায়। আনন্দ আর টুকু আমার মুখের দিকে তাকাল একবার। ওদের কাছে তো বাবার চেয়ে বড় কেউ নেই। বাবা কোন মিথ্যে কথা বলে না। তা হলে লোকটা টাকা বদলে দিচ্ছে না কেন? আর বাবাই বা এমন মুখ কাচুমাচু করে বলছে কেন!

কিন্তু ক্যাশিয়ার যেন আমাব কথা ভুলেই গেছেন। দিব্যি ক্যাশমেমো মিলিয়ে টাকা নিচ্ছেন, মেশিনে টকটক করে অঙ্ক টিপে ঘটাং করেছেন, বাকী খুচরো ফেরত দিচ্ছেন। আমি লোকটা যেন ফালতু, জোচ্চুরি করতে এসেছি। মিথ্যে কথা বলছি। আমাকে বিশ্বাস করা যায় না।

আমি আবার বললাম, শুনছেন, আমার এই নোটটা···

নোটটা যে জাল সে কথা কিন্তু আমি বলতে চাইলাম না। আমার কেমন ভয় হচ্ছিল নোটটা জাল একথা শুনলে কিছুতেই বদলে দেবে না। তাই বললাম, কেউ নিচ্ছে না এটা।

ক্যাশিয়ার এক ফাঁকে তাকিয়ে শুধু টাঙানো নোটিশটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ওটা দেখার দরকার ছিল না, সব দোকানেই টাঙান থাকে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাড়াহুড়োয় কে-ই বা এত ভাল করে নোটগুলো দেখে নেয়।

আমার তখন নিজের বোকামির জন্যে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। আর ঠিক তখনই টুকু বললে, বাবা চল না, বড্ড গরম।

আনন্দ বললে, ঘেমে যাচ্ছি।

আমি আরও অধৈর্য হয়ে রাগে ফেটে পড়তে চাইলাম। তবু বিনয়ে গলে যাবার মত করে বললাম, নোটিশ তো চিরকালই আছে, দেখে নিই নি বলেই তে' এখন আপনার কৃপাপ্রার্থী। কথাটায় নিঃসন্দেহে একটু ঠাট্টাও ছিল।

ক্যাশিয়ার বললেন, বললাম তো হবে না। তখনই দেখে নিলে পারতেন।

আর এবার সত্যি সত্যি আমি রাগে ফেটে পড়লাম। বললাম, তখন দেখে নিলে শুধু ফেরত দিতাম না। জাল নোট চালাতে চাইছেন বলে কষে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতাম।

ক্যাশিয়ার চমকে চোখ তুলে তাকালেন. তারপর আবার মাথা নীচু করে কাজ শুরু করলেন। যেন কিছুই হয় নি।

দু একজন খদ্দের আমাকে উপদেশ দিলেন, কি আর করবেন, ওটা গেছে মনে করুন। কিন্তু তাঁরাই নোটগুলো ফেরত নেবার সময় দু তিনবার করে আলোর সামনে ধরে পরীক্ষা করে নিলেন। একজন তো আমার নোটটা দেখে বললেন, কেন খারাপ বলুন তো? চিনে রাখি বরং।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, জানি না।

—তা হলে দেবেন না বদলে? আমি চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললাম। ইচ্ছে হল নোটটা ক্যাশিয়ারের সামনেই ছিঁড়ে কুচিকুচি করে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারি। কিন্তু পারলাম না।

তখন কেমন একটা ক্ষীণ আশা রয়েছে দশ টাকার নোটখানা জাল নাও হতে পারে। কিংবা জাল হলেও কোথাও হয়ত চালিয়ে দিতে পারব।

আসলে দশটা টাকা এমন কিছু বড় কথা নয়। বিশেষ করে এই পুজোর মুখে। সদ্য সদ্য মোটা টাকা বোনাস পেয়েছি। এখনও পকেটে কয়েকখানা একশো টাকার নোট রয়েছে। একখানা দশ টাকা লোকসান হলে এমন কিছু ভিখিরি হয়ে যাব না। কিন্তু এমন বোকা বানিয়ে দিল আমাকে এটাই রাগের আসল কারণ। আরেকটা রাগ, আমাকে লোকটা বিশ্বাস কবল না। অথচ আমি বিশ্বাসী এটাই তো আমার একমাত্র অহঙ্কার। বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে একদিন ভুলে একটা টাকা বেশী ফেরৎ দিয়েছিল, আমি বেশ কিছুটা চলে এসে সেটা আবিষ্কার করে আবার ফিরে গিয়ে ফেরত দিয়ে এসেছিলাম।

—তা হলে দেবেন না বদলে? আমি চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলে এক

মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, তারপর 'ঠিক আছে' বলেই বেরিয়ে চলে এলাম দোকান থেকে। আনন্দ আর টুকুকে টানতে টানতে।

কেন যে বললাম 'ঠিক আছে' তাও জানি না। কারণ, কিছুই তো করার নেই।

এতক্ষণ ওঁর দয়ার ভিখিরি ছিলাম, পেলে খুব ধন্যবাদ টন্যবাদ দিতাম। ভিক্ষে না পেয়ে এক একটা ভিখিরি যেমন রেগে গিয়ে যা তা বলে যায় আমিও ঠিক তাই করলাম। শাসিয়ে এলাম, যদিও জানি আমার মত অসহায় এখন আর কেউ নেই। আমি তো ওর কিছুই করতে পারব না।

বাইরে বেরিয়ে এসেই এক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া মেখে রাগটা পড়ে গেল। তখন শুধুই দশটা টাকার দুঃখ। এইমাত্র যা বলে এসেছি সে কথা ভেবে নিজের মনেই হেসে ফেললাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুর কথা মনে পড়ল।

অনু মানে আমার স্ত্রী, যে আমাকে সারাজীবন প্রাকটিক্যাল করার চেষ্টা করে ইদানীং হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার তো এমনিতেই ধারণা আমার মত বোকা আর একটিও নেই। আমাকে সকলেই ঠকায়, তার উপদেশ না মেনেই সেবার ফরাক্কায় পকেটমার হয়েছিল।

এই জাল নোট তার হাতে আরেকটা উপকরণ এনে দেবে এই আশঙ্কায় আমি নিজের মনেই হেসে ফেললাম। তারপর আনন্দ আর টুকুকে বললাম, এই, মাকে গিয়ে যেন তোরা কিছু বলবি না। কেমন ?

—কি বলব না বাবা ? টুকু জিগ্যেস করল সরল নিষ্পাপ গলায়।

আমার পকেটে তখন একটা পাপ। সেটা লুকোবার চেষ্টায় আমি তখন আত্মমগ্ন।

বললাম, কিছু না।

কিন্তু লিস্ট মিলিয়ে বাকী জিনিস কটা কেনার দিকে আমার তখন আর মনই নেই। তখন একটাই লক্ষ্য, দশ টাকার জাল নোটখানা চালাতে হবে। ওটা চালাতে পারলেই সব অপরাধ মাপ হয়ে যাবে, সব বোকামি চাপা পড়ে যাবে।

নিজে হেরে গেছি, নিজেকেই এবার জিততে হবে।

ইস্কুলে পড়ার সময় 'পিণ্টু' বলে আমার এক বন্ধু ছিল, একবার একটা অচল সিকি চালাতে গিয়ে কি হালই না হয়েছিল তার। দোকানদার একটা জাঁতি দিয়ে সীসের সিকিটা কেটে দিয়ে ফেরত দিয়েছিল। পিণ্টুর মুখ তখন

সীসের মতই ফ্যাকাশে। দেখে তখন আমারও দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু মনে মনে বলেছিলাম, পিণ্টুরই তো দোষ, জেনেশুনে একটা অচল সিকি ও চালাতে গেল কেন।

এতকাল পরে পিণ্টুর কথা মনে পড়ল, পিণ্টুকে নির্দোষ মনে হল। অর্থাৎ সেই ক্লাস সিক্সের ছেলেটিকে কবর থেকে খুঁড়ে এনে মুকুট পরানোর মানে একেবারে সাদা। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা। কারণ এখন আমার যে একটাই কাজ, জাল নোটখানা চালানো।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি, আর প্রত্যেকটি দোকান দেখছি। দোকানদারদের মুখগুলো। কোন লোকটাকে বেশ বোকাসোকা মনে হয়।

আনন্দ বললে, বাবা, ঐ জিনিসগুলো নেবে না?

অর্থাৎ নোটটা জাল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যে জিনিসগুলো নেওয়া হয় নি। তখন আমরা সেই দোকানটার পাশ দিয়েই চলেছি কিনা, তাই আনন্দ মনে পড়াল।

বললাম, নেব, নেব। ঐ দোকানে নয়।

অর্থাৎ অন্য দোকানে নিলে নোটখানা চালাবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

টুকুর জন্যে দুটো রেডিমেড ফ্রক কিনতে হবে। ভাবলাম সেখানেই আগে চেষ্টা করে দেখি। এইসব পুজোর বাজার-টাজার আমার একবারে বরদাস্ত হয় না। ওসব প্রতিবার অনুই করে। ওর কাছে তো দোকানে যাওয়া কোন পরিশ্রম নয়। আসলে ওর কাছে এক ধরনের ফুর্তি। ঘুরে ঘুরে জিনিস কেনায় কি যে মজা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এবার ও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ডাক্তার হাঁটাহাঁটি করতে বারণ করেছে তাই আমার ওপর সব ভার।

অনু অবশ্য বলেছিল, ডাক্তাররা অমন বারণ করেই থাকে, কিচ্ছু হবে না, আমিই যাই।

কিন্তু আমি রাজি হতে পারি নি।

এখন যদি শোনে দশটা টাকা···

একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম। ফ্রকট্রক দেখলাম, পছন্দ হল না। যদিও পছন্দ অপছন্দ তখন বড় কথা নয়। জাল নোট চালানোই আসল উদ্দেশ্য। একটা বাজে জিনিস কিনে চালাতে পারলেও যেন বেঁচে যাই। বেশ ফ্রক না হোক, শার্ট আছে কিনা আনন্দের দেখার জন্যে কাউণ্টার

বদলালাম। আর রেডিমেড শার্টের স্তূপ দেখতে দেখতে এক একবার ক্যাশ কাউণ্টারের লোকটিকে তাকিয়ে দেখলাম। সে কতখানি ব্যস্ত, চালাক-চতুর মনে হচ্ছে কিনা।

আনন্দকে একটা শার্ট পরিয়ে দেখলাম। বেশ ভালই লাগল, খুব একটা ভাল ফিট না করলেও নোটখানা চালানোর আশায় বললাম, দিয়ে দিন।

সেলসম্যান জামাটা প্যাক করে দিল, আর একজন ক্যাশমেমো কেটে টাকা চাইল। সেই ঘুরে ঘুরে ক্যাশে টাকা জমা দিচ্ছিল। কেন জানি না সেই মুহূর্তে আমার নার্ভ ফেল করল। কিছুতেই জাল নোটখানা দিতে পারলাম না। ভাল নোটই বের করে দিলাম।

জামাটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে মনটা নিজের ওপরই বিষিয়ে গেল। নিজেকে ভীতু মনে হল। এই তো একটু আগে দিব্যি নোটখানা দিতে পেরেছিলাম, তখন জানতামই না ওটা জাল। এবারেও তো সেই ভাবেই এগিয়ে দিতে পারতাম। না হয় ফেরতই দিত।

হতাশ মুখে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভাবছি এবার কি করা যায়, টুকু সেই মুহূর্তে বললে, বাবা, আমার ফ্রক কিনবে না?

—কিনব, কিনব। দাঁড়া না। আমি প্রায় ধমক দিয়েই ওকে চপ করিয়ে দিলাম। মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। একটু নিঃশ্বাস নিতে চাই, একটু ভাবতে চাই। কিভাবে নোটখানা চালানো যায়।

তারপর হঠাৎ একটা বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সের কথা মনে পড়ল। ঠিক, ঠিক, ঐ রকম ভিড়ের দোকানেই নোটখানা চালানো সম্ভব।

কথাটা মনে আসতেই বেশ ফুর্তি ফুর্তি লাগল। সিগারেটে দুটো টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আনন্দ আর টুকুকে বললাম, দোকানে গিয়ে যখন টাকা দেব, তখন কিন্তু কোন কথা বলবি না তোরা।

আনন্দ বুঝল। বলল, না, না, কিচ্ছু বলব না। ছোট বোনকে সেই সাবধান করে দিল।

টুকু কিছু বুঝল কিনা জানি না। সেও ঘাড় নেড়ে বললে, নাম্না।

ওরা তখন নোটখানার কথা ভাবছেই না। আনন্দর তখনও শার্ট প্যাণ্ট, টুকু ভাবছে তার ফ্রকের কথা।

কিন্তু দোকানটায় কি ভিড়, আর কি গরম। সকলেই তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্তর কিনে নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

একজন কে যেন বললে, এরা এয়ারকণ্ডিশন করে না কেন!

অসহ্য গরম, অসহ্য গরম।

ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছু জিনিসের মেমো করিয়ে ফেললাম। কসমেটিকস, বিছানার চাদর, ওদের দুজনের ফ্রক আর শার্টও পছন্দ হয়ে গেল।

মেমোগুলো নিয়ে এবার ক্যাশে টাকা দিতে হবে। তারপর প্যাকেটগুলো পাওয়া যাবে ডেলিভারি কাউন্টারে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। লাইন দিয়ে খদ্দেরের দল টাকা দিচ্ছে।

আমি এবার জাল নোটখানা দশ টাকার নোটগুলোর মাঝখানে রেখে অপেক্ষা করছি। যেভাবে দ্রুত টাকা পয়সা নিচ্ছে ক্যাশিয়ার, মনে আশা উঁকি দিচ্ছে, হয়ত চালাতে পারব। তবু বুক দুরদুর করছে এক একবার।

একটু একটু করে এগিয়ে আসছি, এগিয়ে আসছি। যত এগোচ্ছি ততই ভয় বাড়ছে।

তখন সকলেই তাড়া দিচ্ছে, ধমক দিচ্ছে ক্যাশিয়ারকে।—তাড়াতাড়ি করুন না মশাই।

একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, স্লো মোশনের ছবি মাইরি।

যে যা ইচ্ছে টিপ্পনি কাটছে, আর এক পা এক পা এগিয়ে আসছে।

একজন বললে, দোকান নয় ফার্নেস।

আর একজন, তারপরই আমি। আমি চরম ভালমানুষের মত মুখ করে লোকটিকে বললাম, আমরা তো তবু আ ন্টার জন্যে এসেছি মশাই। ওঁর কথা ভাবুন তো, সারাদিন খাটছেন, এই গরমে।

ক্যাশিয়ার হঠাৎ সহানুভূতি পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। খুব খুশী খুশী মুখে। কাজ করতে করতেই বললেন, সারাদিন তো শুধু গালাগালি খাচ্ছি, আপনি তবু সত্যি কথাটা বললেন।

আমি হাসলাম। বিনয়ের কণ্ঠে বললাম, মুশকিল কি জানেন, সবাই নিজের দিকটাই ভাবে। আমি তো যতবার এসেছি, দেখেছি আপনি নিঃশ্বাস ফেলার সময় পান না।

একজন পিছন থেকে বললে, এয়ারকণ্ডিশন করলেই তো পারেন।

আমি হেসে বললাম, ওঁদের বলে কি লাভ, আসল জায়গায় গিয়ে বলুন তা হলে ওঁরাও বেঁচে যাবেন।

ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। খুব খুশী হয়েছেন মনে হল। ততক্ষণে আমার টার্ন এসে গেছে। হাত বাড়িয়ে নোটগুলো এগিয়ে দিলাম, মেমোগুলোও। হাসি হাসি মুখ করে বললাম, আপনি তো তবু মাথা ঠিক রেখে চটপট নিয়ে নিচ্ছেন, এক এক জায়গায় এত দেরী করে!

ক্যাশিয়ার নোটগুলো গুনে নিয়ে কল টিপলেন, ঘটাং করলেন, বোধহয় আমাকে খুশী করার জন্যে একটু তাড়াতাড়িই করলেন। তারপর খুচরো আর মেমোগুলো ফেরত দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম ডেলিভারি কাউন্টারে। এখন ধরা পড়লেও আমি বলব, তখন দেখে নেন নি কেন? বলব, ও টাকা আমি দিয়েছি তার প্রমাণ কি।

তাড়াতাড়ি প্যাকেটগুলো ডেলিভারি নিয়ে আনন্দ আর টুকুকে টানতে টানতে রাস্তায় এসে হাজির হলাম। আর কি ভাগ্য, সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি, যা কখন পাওয়া যায় না।

সে কি আনন্দ! কি আনন্দ! সারাক্ষণ মনে হল যেন আমি মুক্ত। আমার সব বোকামি এখন ধুয়ে মুছে গেছে। সব অপরাধ চাপা পড়ে গেছে। আমি জিতে গেছি।

ট্যাক্সিতে গা এলিয়ে দিয়ে আমি একটা সিগারেট ধরাতেই আনন্দ বলে ফেলল, নোটটা চালিয়ে দিয়েছ, না বাবা?

আমি শুধু ঘাড় নাড়লাম।

বাড়ি ফিরে আসতেই আনন্দ তার মার কাছে বর্ণনা শুরু করল, কিভাবে জাল নোট নিয়ে ফেলেছিলাম, কিভাবে জুতোর দোকানে ঝগড়া করেছি সেটা বদলে দিতে বলে।

আর আমি যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলে গেলাম, কিভাবে আরেকটা দোকানে ক্যাশিয়ারকে মিষ্টি মিষ্টি কথায় খুশী করে শেষ অবধি চালিয়ে দিয়েছি নোটখানা।

অনু শুনছিল আর হাসছিল। সব শুনে খুশীতে বলে উঠল, তুমি একেবারে পাকা জালিয়াৎ।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আনন্দও।

দু'বার বাঁচা

শহরলুটিয়া চেনেন ? শহরলুটিয়া ?

সত্তর বছর আগে প্রথম যে ইংরেজ ব্যবসায়ী ওখানকার মাটির নীচে খনিজ তেলের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী দেহ রেখেছিলেন পেট্রোলিয়ামের গন্ধ-মাখা ঐ পাথুরে মাটিতে। আর সেই মৃত স্ত্রীর নাম থেকে ঐ অয়েল টাউনের নাম হয়েছিল শার্লোট। কুলিকাবাড়ীদের মুখে মুখে একদিন সেই শার্লোট হয়ে গেল শহরলুটিয়া—লুটের শহর।

অনর্থক এ নামকরণ নয়, কারণ অয়েল টাউন শার্লোটের পথে পথে তখন অনর্থ লেগেই থাকত। লুট রাহাজানি ছিল নিত্যদিনের খবর। মাঝে মাঝে খুনখারাবি যে দু চারটে না হত তা নয়।

শহরলুটিয়া মানে লুটের শহর।

সায়ন্তন বলত লুটের শহরই তো। শালার কোম্পানি লুটছে তেল, ঠিকাদার লুটছে টাকা, আর কাঠিয়ালরা

বলে দাঁতে দাঁত ঘষত সায়ন্তন।

ও তখন ড্রিলিং ডিপার্টমেন্টের অ্যাপ্রেন্টিস।

একটু গোঁয়ার টাইপের মজবুত চেহারা ছিল সায়ন্তনের, শার্লোট শহরের পাহাড়ী শীতকে জব্দ করবার জন্যে ও তখন মোটা উলের ফুলহাতা একটা নীল সোয়েটার পরত, আর ওর কোমরের বেল্টে মিথুন-চামড়ার খাপে থাকত একটা কুকরি।

ওর বাইরের রুক্ষ চেহারাটার সঙ্গে কোমরের বেল্টে বাঁধা মিথুন-চামড়ার খাপটা দিব্যি মানিয়ে যেত। তবু কেউ যদি বা রসিকতা করে সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসত, তাহলে সায়ন্তন তার চৌকো চোয়ালে কাঠিন্য এনে বলে উঠত, কাঠিয়াল কুত্তাগুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিতে হবে না ?

আমি তখন ডেরিকের কাজ করি, কোম্পানির একটা জীপ আমার এক্তিয়ারে। রাত দশটার আগে সেটা বাবুগঞ্জের গ্যারাজে জমা দেয়া নিয়ম

ছিল, কিন্তু প্রীতম দারোয়ানকে আফিঙের কাঠি ডোবান এক ভাঁড় চা খাওয়ালে রাত বারোটায় জীপ জমা পড়লেও তার আপত্তি হত না।

শার্লোট শহরের গা ঘেঁষে যে বানডাকা নদীটার জলস্রোত সারা বছরই অভিমানে ফুলে ফুঁসে উঠত তার নাম ছিল নেশারী।

নেশারী নদীর ওপর দিয়ে একটা শীর্ণ কংক্রিটের পোল, কোনরকমে একটা গাড়ি পার হতে পারে। পোলের ধারে খাটো রেলিং, রেলিং থেকে ঝুঁকে আমরা কতদিন সন্ধ্যায় নেশারী নদীর বুকে জলের খেলা দেখেছি। ঢেউয়ের গায়ে ঢেউ জড়িয়ে পড়া দেখেছি। যেন সাদা-কালো তিনটে সদ্যোজাত ফুটফুটে ছাগলছানা এ ওর গায়ে ঢুঁ মারছে।

কংক্রিটের পোল পার হয়ে সটান একটানা সরু একটা মেটাল রোড ছুটে গেছে আঙ্গামা বস্তিটার দিকে, আঙ্গামা বস্তি পার হয়ে ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়ী টিলা, ঘন জঙ্গল। বাঁকে বাঁকে সরু পাহাড়ী রাস্তা।

আঙ্গামা বস্তির ওধারে আমরা বড় একটা যেতাম না।

সেদিন কংক্রিটের পোল পার হয়ে রাস্তার ধারের বুন্দা ঘাসের ওপর জীপ থামিয়ে অন্ধকারে বসে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছি, জ্বলন্ত কাঠিটা সায়ন্তনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছি, একটা হাত তখনও স্টীয়ারিং-য়ে, হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে সচকিত হয়ে ফিরে তাকালাম। গাড়িটা তখন কংক্রিটের পোলটার ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। একজোড়া হেডলাইট দুলতে দুলতে ছুটে আসছে।

ঢেউ খেলানো উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে পলকের মধ্যে গাড়িটা আমাদের পার হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর থেকে একটা মেয়েলী কণ্ঠের তীব্র চিৎকার ভেসে এল। আবার, আবার। নিস্তব্ধতার মাঝে একটি নারীকণ্ঠের তীক্ষ্নস্বরের আর্তনাদ যেন চতুর্দিকে একটা শব্দের বিদ্যুৎ হয়ে চমকে গেল।

চিৎকার করে কি বলতে চাইল মেয়েটি? 'আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান?' না অন্য কিছু? আমারা কেউই বুঝতে পারলাম না।

আমরা তখন স্তম্ভিত, বিমূঢ়। শুধু এইটুকু আমরা তখন বুঝতে পারছি, অচেনা অজানা কোন একটি মেয়ে আমাদের সাহায্য চাইছে।

ঠিক তখনই বোধহয় সায়ন্তন বলে উঠল, শালা কাঠিয়াল!

আর আমি, নিমেষের মধ্যে, যন্ত্রের মত, কিছু না ভেবেই চাবি ঘুরিয়েছি,

ক্লাচ ছেড়ে জোর চাপ দিয়েছি অ্যাকসেলারেটারে। সমস্ত শরীরে তখন উত্তেজনা। উত্তেজনায় জীপের শরীরটাও যেন থর থর করে কাঁপছে।

কিংবা অসহায় ক্রোধে।

ক্রমাগত স্পীড বাড়িয়ে চলেছি আমি, ভাঙা স্পীডোমিটারের কাঁটাও আমাকে সতর্ক করতে ভুলে গেছে, ভুলে থমকে থেমে আছে। আমি ডাকু গাড়িটার ব্যাকলাইট লক্ষ্য করে ঝড়ের মত এগিয়ে চলেছি। আমি তখন ভিতরে ভিতরে উন্মাদ হয়ে উঠেছি।

অথচ কেন তার পিছনে এভাবে ধাওয়া করছি, আমি তখন জানি না। সায়ন্তন নিঃশব্দে পাশে বসে আছে, তার মুখেও কোন কথা নেই। আমি দৃঢ় হাতে স্টীয়ারিং ধরে আছি, আমি পাগলের মত অ্যাকসেলারেটারে চাপ দিচ্ছি। একটু একটু করে ডাকু গাড়িটার কাছে এগিয়ে আসছি আমি, আরও, আরও কাছে। আর মাত্র এক ফার্লং, আধ ফার্লং।

ব্যাকলাইটের হলদে আলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ ঝপ করে সেটা নিভে গেল। তা যাক, আমার জীপের হেডলাইট এখনই গাড়িটাকে ছুঁয়ে ফেলবে, ছুঁয়ে ফেলেছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, আমি ডেরিক ডিপার্টমেণ্টের অনিমেষ মল্লিক, ঐ লুণ্ঠিতা মেয়েটিকে বাঁচাবই।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাঠিয়ালদের ঐ গাড়িটাকে আমি ধরে ফেলতে পারব। তারপর? ডাকুগুলোর হাতে কি আছে আমি জানি না। শুধু জানি, সায়ন্তনের কোমরে বাঁধা মিথুন-চামড়ার খাপে ঢাকা ধারালো কুকরিটা কোন কাজেই লাগবে না।

তবু এতদিনের একটা গোপন চাপা আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। এতদিনে মনে হয়েছে বাবুগঞ্জের, শার্লোট শহরের কোন মেয়ে হারিয়ে যাওয়া যেন আমাদেরই অপমান।

—শালা কাঠিয়াল! এবার আমি বললাম, আমি, ডেরিক ডিপার্টমেণ্টের অনিমেষ মল্লিক।

আর তখনই আমার জীপের হেডলাইট সাঁ করে আলোর ফাঁস ছুঁড়ে দিয়ে ডাকু গাড়িটাকে কাছে টানল। হেডলাইটের আলো পড়ে গাড়িটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু, কিন্তু ওভারটেক করে এগিয়ে যাওয়ার এতটুকু পথ দিচ্ছে না সে। এগিয়ে গিয়ে পথ রোধ করে রুখে দাঁড়াবার উপায়

নেই। শীর্ণ রাস্তার ঠিক মাঝ বরাবর ঝড়ের মত উড়ে চলেছে সামনের গাড়িটা।

কিন্তু হাতে আর এতটুকু সময় নেই। এরপরই আজামা বস্তির পাশ দিয়ে দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা। যে কোন মুহূর্তে গাড়িটা নাগালের বাইরে চলে যাবে।

আমি নিমেষের মধ্যে ভাবলাম, মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে।

আমি পলকের জন্যে ভাবলাম, মেয়েটির সম্মান বাঁচাতে হবে।

না, আমি ওদের পালাতে দেব না। কিছু না পারি, আমার এই মজবুত বডির জীপখানাকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেব। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব, ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাব।

মেয়েটিকে যদি বাঁচাতে না পারি, তার ইজ্জৎ, তার সম্মান রক্ষা করব। আমি ঐ লম্পট দস্যুদের আর ঐ লুণ্ঠিতা মেয়েটিকে একই সঙ্গে হত্যা করব। মেয়েটিকে হত্যা করে আমি তাকে গ্লানিময় জীবন থেকে রক্ষা করব।

আমি মনে মনে বললাম, আমি বাঁচাব কিংবা হত্যা করব।

উন্মত্ত আর প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মত, আমি একটা পাগলা-ঘণ্টি সাইক্লোনের মত হুড়মুড় করে এগিয়ে গেলাম—মৃত্যুর দিকে। আমার এবং মেয়েটির।

আমি মৃত্যুর চাদরে মেয়েটির শরীর ঢেকে দিয়ে তার সম্মান বাঁচাতে চাইলাম। নিষ্পাপ নির্মল একটি রক্তকরবীর মত তার ছিটকে পড়া লাল রক্তের বিশুদ্ধতায় আমি তাকে ফুটিয়ে তুলতে চাইলাম।

—সায়ন্তন! আমি তাকে সাবধান করার জন্যে বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম।

তারপর প্রচণ্ড বেগে ছুটন্ত গাড়িটার গায়ে ধাক্কা দিলাম। একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম শুধু। ঝন ঝন ঝন ঝন করে কাচের টুকরো ছিটকে পড়ল চতুর্দিকে। আমি কয়েকটা পুরুষকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। আমি একটি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনলাম। কিংবা আমি নিজেই হয়তো যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলাম।

আমি জ্ঞান হারালাম।

এ-গল্প দু বার বাঁচার গল্প, কিংবা দু বার বাঁচানোর

শার্লোট শহরে কোম্পানি হাসপাতালে প্রথম যেদিন জ্ঞান হল, কেউ বুঝি কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল, দময়ন্তীর সম্মান বাঁচিয়েছ তুমি।

হ্যাঁ, মেয়েটির নাম দময়ন্তী। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার দিনে সায়ন্তনের সঙ্গে সে আবার এল, ঈষৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্লাস্টার করা বাঁ হাতখানা বুকের কাছে ঝুলিয়ে।

সায়ন্তনের কপালে আর চিবুকে গভীর কাটা দাগ ওকে যেন আরও রুক্ষ করে তুলেছে!

সায়ন্তন হাসতে হাসতে বললে, ছাখ অনিমেষ, কে তোকে নিতে এসেছে।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমি মুগ্ধ হলাম। কিন্তু ভোরবেলাকার শিশিরভেজা কনকচাঁপা ফুলের মত স্নিগ্ধ তার চোখের পাতায় বিষণ্ণ করুণ কি এক দৃষ্টি দেখে আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হলাম। মনে হল তার এই খুঁড়িয়ে চলা আর ভাঙা হাতের জন্য আমিই দায়ী।

পরক্ষণেই সে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসল, বললে, আপনাকে নিতে এসেছি।

কতদূরে সে আমাকে নিয়ে যাবে আমি জানতাম না, তবু আমার প্রতিটি রক্তকণিকা আশার ফুলঝুরি হয়ে উঠল। কারণ, তার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হল সে যেন কৃতজ্ঞতায় আমার কাছে নিজেকে বিক্রী করে দিতে চায়।

কিন্তু আমি তো কৃতজ্ঞতা চাই নি। আমি যা চেয়েছিলাম, আমি তা মুখ ফুটে বলতে পারতাম না।

তবু দিনে দিনে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। ক্যামেলিয়া ফুলের মত উজ্জ্বল সেই আলোকিত কিশোরীর চোখে, আমি জানি না কিসের ছায়া আবিষ্কার করেছিলাম। শুধু জানি, একটি রজনীগন্ধার বনের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার বাতাসের মত আমাদের দিনগুলো এক অভাবনীয় রোমাঞ্চের মধ্যে কেটে গিয়েছিল।

আমি কি সায়ন্তনের চেয়ে আরও বেশী কিছু চেয়েছিলাম? তা না হলে আমি একটা ক্ষীণ সন্দেহের মধ্যে দুলতাম কেন? অথচ আমি তখন রাতারাতি শার্লোট শহরের হীরো হয়ে গেছি। দময়ন্তীর বাবা—অ্যাকাউন্টস অফিসের হেমনাথবাবুও আমাকে স্নেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন।

তবু আমি সায়ন্তনকে ভয় পেতাম। অথচ আমরা দু-বন্ধুই কেউই কারো কাছে মনের দরজা খুলে দিতে সাহস পেতাম না।

অহঙ্কার আমার কানে কানে বলত, অনিমেষ, তুমি দময়ন্তীকে অসম্মানের জীবন থেকে বাঁচিয়েছ, তার ওপর সায়ন্তনের কোন অধিকার নেই।

আমি মনে মনে প্রশ্ন করতাম, নিষ্পত্র বৃক্ষের মত সায়ন্তনের সমস্ত রুক্ষতা, দময়ন্তী কাছে এলেই, কেন সবুজ পাতায় ঝলমল করে ওঠে।

সেদিন আমি তাই দময়ন্তীকে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। আমি নিষ্ঠুরের মত সায়ন্তনের সামনেই হয়তো মুখ ফুটে কিছু বলতাম।

প্রতিদিনের মত অপূর্ব এক মুগ্ধতার মধ্যে আমরা তিনজনে সেদিনও নেশারী নদীর সেই কংক্রিটের পোলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম। আমি দময়ন্তী সায়ন্তন।

দময়ন্তীর বাঁ হাত তখন ভাল হয়ে গেছে। ও হঠাৎ সায়ন্তনের কোমরে বাঁধা মিথুন-চামড়ার খাপটা বাঁ হাতের আঙুলে ছুঁয়ে হাসতে হাসতে বললে, এটা কাকে খুন করার জন্যে?

সায়ন্তন, রুক্ষ সায়ন্তন, বলে উঠল, নিজের বুক চিরে কাউকে যদি হৃৎপিণ্ডটা তুলে দেখাতে হয় সে জন্যেই।

দময়ন্তী তার কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম, প্রচণ্ড বেগে একখানা খুনী-চোখ নীল রঙের গাড়ি অন্ধের মত ছুটে আসছে।

নেশারী নদীর শীর্ণ পোলের ওপর দাঁড়িয়ে নিমেষের জন্যে আমি বিমূঢ় বোধ করলাম। কারণ ঐ নীল গাড়িখানাকে আরেকদিন জর্জ মার্কেটের রাস্তায় আমাদের দিকে ছুটে আসতে দেখেছিলাম। যেন কোন চোরাই মাল নিয়ে পালাতে চায়, কিংবা, কে জানে, হয়তো আমাদের কোন একজনকে···

এক মুহূর্ত। এক মুহূর্ত দেরি হলেই গাড়িটা দময়ন্তীকে চাকার তলায় পিষে ফেলত, তার শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে তার রক্তের ঝর্ণায় সমস্ত পথ রাঙিয়ে দিয়ে যেত। আমি তাই পলকের মধ্যে তাকে বাঁচাবার জন্যে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। আমি তাকে বাঁচাতে চাইলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে সায়ন্তন চিৎকার করে উঠল।—অনিমেষ।

আমার মাথা ঘুরছে তখন, আমি টলছি, আমি জানি না দময়ন্তীকে আমি বাঁচাতে পেরেছি কিনা।

সায়ন্তন আবার বলে উঠল, কি করলি তুই অনিমেষ!

আমি চমকে ফিরে তাকিয়ে দময়ন্তীকে দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, সায়ন্তন মুহূর্তের মধ্যে তার নীল সোয়েটারটা খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমি দু চোখ বন্ধ করলাম।

আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পেলাম সায়ন্তনের শরীরটা নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ছ ফুট চেহারাটা আমার চোখের সামনে দৈর্ঘ্য হারাতে হারাতে একটা ছোট্ট বিন্দুতে হারিয়ে গেল।

আমি তখনও আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় থর থর করে কাঁপছি। আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি কি করেছি। কিংবা বুঝতে পারার ফলেই আমার দু চোখ ঠেলে জল এল।

আমি ছোট্ট শিশুর মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম।

আমি পোলের ধারের খাটো রেলিং থেকে ঝুঁকে—নীচে, অনেক নীচের নেশারী নদীর আলো-মাখা কালো কালো ঢেউয়ের দিকে তাকালাম। আমি দময়ন্তীকে খুঁজলাম, আমি সায়ন্তনকে খুঁজলাম।

আমি, আমি পাগলের মত কংক্রিটের পোল থেকে ছুটে নেমে গেলাম, নেশারী নদীর তীরের দিকে ছুটে গেলাম।

সেই মুহূর্তে সাঁতার জানি না বলে নিজেকে আমার একেবারে, একেবারে মূল্যহীন মনে হল।

সে এক দুঃসহ যন্ত্রণা। আমার চোখের সামনে আমি দুটি মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। দুটি অবধারিত মৃত্যু। নেশারী নদীর জোয়ার-জলে কালো কালো ঢেউ তখন ফুলে ফেঁপে উঠছে—তার মধ্যে দুটি মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে। একজন আমার স্বপ্ন, আরেকজন আমার সহায়। একজন আমার আশা, আরেকজন আমার একমাত্র ভরসা। আমার পায়ের তলার মাটি, আমার মাথার ওপরের আকাশ।

তীরে দাঁড়িয়ে আমি তন্নতন্ন করে ওদের খুঁজলাম।

পোলের ওপরের আলো এসে পড়েছে জলে, সেই ক্ষীণ আলোয় আমি হঠাৎ দুটি মাথা দেখতে পেলাম। দেখতে পাচ্ছি। একটি মাথা ডুবে যাচ্ছে আবার দুটি মাথাই ভেসে উঠছে। একবার তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আবার কাছে আসছে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ, কতক্ষণ আমি আজও জানি না।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে গেলাম।

সায়ন্তন উঠে আসছে, দময়ন্তীর অচৈতন্য শরীরটাকে টানতে টানতে বয়ে নিয়ে আসছে, ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে আসছে।

আমি ছুটে গেলাম, আমি খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলাম। দময়ন্তী বেঁচে আছে, সায়ন্তন বেঁচে আছে।

আনন্দে আমার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

আমি ভাবলাম, কৃতজ্ঞতার মূল্য হিসেবে আমি সায়ন্তনকে সব—সব দিতে পারি।

না, আমরা পারি না। কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে মানুষ বোধ হয় অনেক বেশি মূল্য চায়।

তা না হলে সায়ন্তন অমন মুগ্ধের মত দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকাতে শুরু করবে কেন? দময়ন্তী কেন সায়ন্তনের সঙ্গ পেলেই এমন উচ্ছল হয়ে উঠবে?

আমার সন্দেহ হল বুক চিরে হৃৎপিণ্ডটা তুলে দেখানোর কথা হয়তো নিছক রসিকতা নয়। আমি তাই হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, সায়ন্তনকে আমি ঈর্ষা করতে শুরু করেছি, সায়ন্তনকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছি।

আমি তখন এক বিচিত্র যন্ত্রণায় জ্বলছি।

সেই প্রথম আমি সায়ন্তনকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরের মত মুখ ফুটে বললাম সায়ন্তন, আমি দময়ন্তীকে ভালবাসি।

সায়ন্তন ধীরভাবে শুনল, চোখ বুজল, চোখ খুলল।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমিও যে ভালবাসি অনিমেষ।

আমি পাগলের মত বললাম, কিন্তু দময়ন্তী? সে তোকে ভালবাসে, না, ভালবাসে না।

সায়ন্তন মাথা নিচু করে বললে, জানি না।

আমি বললাম, আমি তার ইজ্জৎ বাঁচিয়েছিলাম, তার সম্মান। ভেবে ভাখ সায়ন্তন, যদি তাকে আজ অসম্মানের বোঝা বয়ে বেড়াতে হত···তার জীবন বাঁচানোর জন্যে সে তোকে ঘৃণা করত।

সায়ন্তন হাসল। বললে, জীবন বাদ দিয়ে সম্মানের দাম কতটুকু রে

অনিমেষ। তুই, তুই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলি, আমি তার জীবন বাঁচিয়েছি। ভেবে গ্যাখ, তার জীবন না বাঁচালে আমরা আজ কাকে ভালবাসতাম।

আমি তার যুক্তিতে কান দিলাম না। শুধু বললাম, এভাবে চলতে পারে না। এর একটা মীমাংসা করতেই হবে সায়ন্তন।

আমরা দুজনে একদিন একই সঙ্গে দময়ন্তীর কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

আমাদের উত্তেজিত মুখ দেখে দময়ন্তী বিস্মিত হল।

আমরা বললাম, দময়ন্তী, আমরা স্পষ্ট উত্তর জানতে চাই। তুমি কাকে ভালবাস?

দময়ন্তী বিষণ্ন করুণ দুটি চোখ তুলে বিহ্বলভাবে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, একবার সায়ন্তনের মুখের দিকে।

আমার মনে হল ভিতরে ভিতরে ও যেন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছে। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা একটা অসহ্য ব্যথাকে চাপা দিতে গিয়ে ওর দু চোখ জলে ভরে এল।

আমি তবু বললাম, উত্তর দাও দময়ন্তী।

আর সায়ন্তন তার দিকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল।

বলল, উত্তর চাই।

মাথা নিচু করে কাগজের টুকরোটা টেনে নিল দময়ন্তী, কি যেন ভাবল, তারপর ধীরে ধরে তার উত্তর লিখে কাগজটা ভাঁজ করল।

উত্তর জানার জন্যে আম' উৎসুক হয়ে উঠলাম। সম্মান বাদ দিয়ে জীবনের দাম কতটুকু? কিংবা জীবন না থাকলে সম্মান অর্থহীন কিনা। আমরা জানতে চাইলাম, দময়ন্তী কাকে ভালবাসে? জীবন না আত্মসম্মান? সায়ন্তন না অনিমেষ?

দময়ন্তী ততক্ষণে কাগজের টুকরোটা জজ টাউনের সেই চায়ের দোকানের টেবিলের ছাইদানী চাপা দিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে।

আমরা দুজনেই কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। উৎসুক, অথচ প্রচণ্ড একটা ভয়। যেন এখনই আমাদের যে-কোন একজনের সমস্ত স্বপ্ন, সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যেন আমরা এখনই পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠব।

আমরা উৎসুক হয়ে উঠলাম একটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে। দময়ন্তী কাকে ভালবাসে, কোন কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে চায় দময়ন্তী।

আমি সায়ন্তনকে বললাম, তুই খোল, খুলে ত্যাখ কি আছে।

সায়ন্তন হেসে বললে, আমার সাহস নেই, তুই, তুই ত্যাখ অনিমেষ।

আমি ভয়ে ভয়ে কাগজের টুকরোটা টেনে নিলাম। আমার হাত থর থর করে কাঁপল। আমি ভাঁজ খুললাম, খুলে পড়লাম কাগজের লেখাটুকু। তারপর টুকরোটা সায়ন্তনের দিকে এগিয়ে দিলাম।

শুধু একটি লাইন, একটি লাইনই লেখা ছিল সেই কাগজের টুকরোয়। লেখা ছিল : কৃতজ্ঞতার চেয়ে প্রেম অনেক অনেক বড়।

বসবার ঘর

কোথায় যেন গিয়েছিল, হিমু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল। রেখাকে দেখেই দম নেবার চেষ্টা করে হাসতে হাসতে বললে, ছোট বৌদি, কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার।

—কি হল আবার? রেখার মুখে তখনও আতঙ্ক ছিল না, বরং কৌতুকের ছিটে লেগে ছিল হাসিতে, হিমু কিছু একটা করে এসেছে হয়তো। দু টাকার নোটটা কোথায় যে পড়ে গেল, কিংবা ভাঙানি পয়সা ফেরত নিতে ভুলে গেছি!

উঁহু, হিমু তখনও হাঁপাচ্ছে। কোন রকমে বললে, অবনীবাবুকে দেখলাম। বাস থেকে নামলেন, সঙ্গে বোধ হয় অবনীবাবুর বউ। বলে আমার দিকে তাকাল হিমু, আমি রেখার মুখের দিকে।

রেখার চোখ বললে, বোঝ এবার। তারপরই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে ওর মুখ ফ্যাকাশে হল, চোখ গোল গোল। রীতিমত আতঙ্ক সে-চোখে।

হিমু তখনও হাসছে।—দেখেই…বাস থেকে নামলেন আর আমি ছুটতে ছুটতে—এই দ্যাখ স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে গেছে।

রেখা চট করে একবার ওপরের বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখে এল অবনীবাবুরা এসে পড়লেন কিনা। আমার তখন এত আক্ষেপ হচ্ছে, কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। সেদিন অবনীবাবুদের পাড়া দিয়ে যেতে যেতে কি যে খেয়াল হল, কেন যে ঢুঁ মারলাম ওঁর বাড়িতে!

অবনীবাবুর স্ত্রী খুব মিশুকে লোক, আলাপ হতেই বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন একদিন।

আমি দিব্যি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ভাবলাম রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু অবনীবাবু বলে বসলেন, আহা, প্রথমে একবার তুমি গিয়ে না বলে এলে তিনি আসবেন কেন!

সে কথাটা রেখাকে আর বলি নি, ভেবেছিলাম অবনীবাবুরা সত্যি কি আর আসবেন। তাছাড়া, শুনলে রেখাও তো চটে যেত। —এলে কোথায়

বসতে দেবে শুনি? অবনীবাবু একা হলেও কথা ছিল, মেয়েদের তো জান না, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের দেখা চাই।

এখন আর সে সব কথা বলার সময়ই নেই তার। রাস্তার মোড়ে লাল আলোটা হলুদ থেকে সবুজ হয়ে গেলেই যেমন তাড়াহুড়ো পড়ে যায় সমস্ত বাড়িটার এখন তেমনি অবস্থা! পলকের মধ্যে খবরটা মেজবৌদির কাছে, কুমকুমের কাছে, ছোড়দির কাছে পৌঁছে দিয়ে এসে ও তখন আলমারীর সামনে চাবির গোছা নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আলমারী খুলে সবে মণিপুরী বেডকভারটা বের করেছে, মেজবৌদি এসে বললে, ছোটু, ধোয়ানো চাদর আছে আর?

একটা সাদা চাদর বের করে দিল রেখা, আর মেজবৌদি সেটা হাতে নিয়ে কুমকুমকে ডাকতেই সে স্থরুৎ করে বেরিয়ে গেল। বলতে বলতে গেল, ইস্, আমাকে বুঝি শাড়িটা বদলাতে হবে না!

রেখা ততক্ষণে বিছানার ওপর বেডকভারটা বিছিয়ে ফেলেছে, আলনার কাপড়গুলো দ্রুত হাতে গুছিয়ে রাখছে।

এমন প্রায়ই হয়। কেউ এসে পড়লে বা এসে পড়েছে শুনেই দুদ্দাড় ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। দু চার মিনিটে এলোমেলো নোংরা ঘর কতখানি যতখানি সাজিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যায়।

—কাজের সময় কেন যে আসে। কাজের ফাঁকেই বিড়বিড় করল রেখা।

কেউ এলেই আজকাল চটে যায়। অথচ আগে প্রায়ই বলত, কি বাড়ি বাবা তোমাদের, কেউ বেড়াতেও আসে না!

অলক, আমার ইস্কুলের বন্ধু, একসঙ্গে পড়তাম। হঠাৎ একদিন পনের বছর পরে বাসে দেখা হয়ে গেল। চিনতে পেরে চলন্ত বাসেই জড়িয়ে ধরল, চল্, তোকে আমার বাড়ি আজ যেতেই হবে।

আমি যত বলি হবে হবে, আরেকদিন গেলেই হবে, তবু শোনে কি। শেষে ঠিকানা লিখে নিল, বললে, না এলে দেখিস বউকে নিয়ে একদিন গিয়ে হাজির হব।

রেখাকে এসে বললাম, জান, আজ এক ইস্কুলের বন্ধু, অলক···

রেখা সব শুনে বললে, না গিয়ে ভালই করেছ, গেলেই তো আসার কথা বলতে হত···

—কিন্তু ও যে বলেছে না গেলে নিজেই এসে হাজির হবে বউকে নিয়ে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম বটে, কিন্তু ভয় আমারও। ও তো জানে আমি চাকরি করছি ভাল, উন্নতি হয়েছে, এসে ঘরখানা যদি দেখে···

—সত্যি, বসবার ঘর একখানা না হলে কিন্তু চলে না। রেখা মাঝে মাঝে বলে।

অথচ উপায় কি!

এত ইচ্ছে হয়, এই একঘেয়েমি ছেড়ে মাঝেসাজে এর ওর বাড়ি বেড়াতে যাই, ইচ্ছে হয় তারা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসুক, দু দণ্ড বসে গল্প করি, কিন্তু—না, আমাদের কোন বসবার ঘর নেই। নেই বলেই দিনে দিনে মানুষগুলোকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি, দূরে সরে আসছি নিজেরা, একা হয়ে যাচ্ছি।

ছি, ছি, মালপত্রে ঠাসা এই নোংরা ঘরে কাউকে এনে বসান যায়? এই খাট আলমারীর বন্ধ-হাওয়া অন্ধকূপে?

ওঃ সেদিন কি ভয়ই পেয়েছিলাম। আলনা গুছিয়ে বিছানার চাদর বদলে, রেখা কুমকুম ওরা শাড়ি পালটে মেঝেতে তাড়াতাড়ি ঝাঁটা বুলিয়ে অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু অবনীবাবুরা এলেন না। হিমুর কাণ্ড, কাকে দেখতে কাকে দেখেছে। কিংবা অবনীবাবুই হয়তো অন্য কার বাড়ি গেছেন, বাস থেকে নামতে দেখে ও ভেবেছে এদিকেই আসছেন।

সেদিন খুব হাসাহাসি হয়েছিল হিমুকে নিয়ে। তখন অস্বস্তি কেটে গেছে, অবনীবাবু আসতে পারেন এমন ভয়ও নেই, তাই প্রাণ খুলে হাসতে পেরেছিলাম হিমুকে ঠাট্টা করে।

কুমকুম তবু ঠোঁট ঝুলিয়ে বলেছিল, আমাদের বাড়িটা কি রে ছোটদা, একটা ড্রয়িং রুমও নেই।

বাইরের লোক এলে তাকে বসতে দেবার জন্যে এক টুকরো বারান্দা থাকলেও কথা ছিল। তাও নেই। না, আমাদের কোন বসবার জায়গাই নেই।

কিন্তু মেজদা বড় মেজাজী রসিক মানুষ। কুমকুমের অভিযোগ শুনে খেঁকানি দিয়ে উঠলেন!—কি নেই? তারপর কুমকুমের আদুরে আদুরে গলাটা নকল করে ভেংচি কাটলেন, ড্রয়িং রুম? টুল রুম নেই তার ড্রয়িং রুম।

—টুল রুম কি মেজদা? কুমকুম বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করল।

—টুল রুম বুঝলি না? বসবার জন্তে দু একটা টুল রাখার মত ঘর। মেজদা নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন।

আট বছরের টুটু মিশনারী ইস্কুলে পড়ে, ও মাস্টারি করতে ছাড়ল না। ঠাণ্ডা গম্ভীর গলায় বললে, ড্রয়িং রুম না রে দিদি, আজকাল সিটিং রুম বলে।

—তুই থাম তো। কুমকুমের ভুল ইংরেজী উচ্চারণ ধরে ও কথায় কথায়, তাই ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল কুমকুম।

এদিকে মেজবৌদি কোন ফাঁকে এসে ঢুকেছেন কেউ লক্ষ্য করে নি। বললেন, তোমার আবার ড্রয়িং রুমের দরকার পড়ল কেন শুনি? পাত্রপক্ষ যখন মেয়ে দেখতে আসবে তখন এই ঘরে বসতে দিলেই হবে, তোমায় অত দুশ্চিন্তা বইতে হবে না।

কুমকুম নাক উঁচু করল।—বয়ে গেছে গান্ধীর মত গালে হাত দিয়ে বসতে। আমি বিয়েই করব না।

মেজদা-টার পড়াশুনা বেশী এগোয় নি, বিয়াল্লিশে বন্দেমাতরম্ করে জেলে গিয়েছিল, এখন ছোট্ট একটা চীনেমাটির কারখানা চালায়। মেজদা হেসে বললে, গান্ধীর সে ছবি তোরা দেখেছিস? তোরা তো ভাবিস গান্ধী বলে কেউ ছিলই না।

আমি বললাম, পাগল হয়েছ মেজদা, সে-ছবি কোথায় দেখবে? ও নির্ঘাৎ কোন বইয়ে···

কুমকুম কিন্তু আবার ড্রয়িং রুমেই ফিরে গেল।—তোমরা বুঝবে না। নাকের ডগা থেকে চিবুক অবধি এমন একটা ঘেন্না ঝরিয়ে দিল কুমকুম, যে আমরা হেসে ফেললাম। ও আরও চটে গেল, চোখ কান্না-কান্না।—জান, কলেজের সবাই আমাকে আনসোশ্যাল বলে। কারও বাড়ি যাই না। কাউকে আসতে বলি না। শুধু সুধা নন্দিতা, ওরা তো ছোট থেকে দেখছে।

মেজবৌদি বুঝতে পারেন নি, পান চিবতে চিবতে বললেন, গেলেই পার তাদের বাড়ি, কার শাসনই বা তুমি মান।

কুমকুম হাসল।—বসবে কোথায় তারা, এলে? এই ঘরে কাউকে আনা যায়?

টুটু ভারিক্কি চালে বলে উঠল, ঠিক বলেছিস দিদি। স্কুলের বাস থেকে একদিন উমাশঙ্কর প্যাটেল নামতে চাইল। আমার এত লজ্জা করছিল—

রাগে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ছেলেটার পাকামি দেখলে, ওর

এই আট বছরে আটচল্লিশের ভান দেখলে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইস্কুলগুলোর ওপর রাগে আমার সারা শরীর জ্বলে যায়। ওঃ কি লাটসাহেব রে, বসার ঘর নেই বলে ওঁর লজ্জা। ড্রয়িং রুমওলা বাড়ি ভাড়া নিলে যে তোকে কর্পোরেশন ইস্কুলে পড়তে হবে, তা জানিস? একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলাম তাই।

কুমকুম তার আগেই হেসে উঠেছে।—আমি বাবা কারও জন্মদিনে যাই না সেজন্যে।

বাড়িটার দিকে তাকালে আমার নিজেরও গা রী রী করে, কুমকুমকে দোষ দেব কি! ঘর তো নয়, এক একখানা গোডাউন। কাঠের বেঞ্চির ওপর সারি সারি তোরঙ একটার ওপর একটা, ওপাশে লেপ তোষক স্তূপী-কৃত করা আছে, খাট-আলমারী, খাটের নীচে থেকে বিয়ের সময় পাওয়া গামলা কলসী হাঁড়ি ইত্যাদি উঁকি দিচ্ছে, ওপাশে আলনা—যেটুকু দেয়াল দেখা যাবার কথা, তাও সতেরটা ক্যালেণ্ডারে চালচিত্তির হয়ে আছে।

যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই।

বাবা এখন অবশ্য রিটায়ার করেছেন, কিন্তু সেই অসুখের সময় বাবার আপিসের হালদার সাহেব দেখা করতে এলেন, বাবা তো 'এখানেই নিয়ে আয়' বলে খালাস, আমার যে কি অস্বস্তি হচ্ছিল! মা আবার শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে ট্রাঙ্কের ঢাকা বানিয়েছে। এত সেকেলে লাগে!

এমন একটা আতঙ্ক নিয়ে বাস করা যায়!

ভেবেছিলাম, অলক হয়ত ভুলে গেছে, আর আসবে না। অবনীবাবু মুখে যাই বলুন, সত্যি কি কেউ যেচে নিজে নিজে আসতে পারে।

কিন্তু সেদিন অলক হঠাৎ আপিসে এসে হ জির।

হেসে বললে, কি রে গেলি না তো?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপিসের খবর পেলি কোত্থেকে?

—বাঃ সেদিন তো বললি, টেলিফোন ডিরেক্টরী দেখে…

তারপর একটু থেমে বললে, বউয়ের কাছে প্রেষ্টিজ আর রইল না, এত গল্প করেছি এতদিন, তারপর সেদিন বললাম, দেখা হয়েছে, আসবে বলেছে…

বললাম, সময় পাই না, যাব যাব।

—আর গিয়েছিস! উমা প্রত্যেক রবিবারে বলে, কই গো তোমার সেই

বন্ধু তো এল না। অলকের মুখ দেখে মনে হল ও ভেবেছে আমি ওকে ভুলে গেছি, কিংবা ওকে তাচ্ছিল্য করছি।

আমি চা আনিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, ঠিক আছে, এই সপ্তাহেই যাব।

মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করে ফেললাম। অলক, অলকই তো, সেই ছোটবেলায় কত বন্ধু ছিল! একটা দিন দেখা না হলে মন খারাপ হত, রাত্রে ঘুম হত না, যার যত সমস্যা একজন আরেকজনকে না বলে শান্তি ছিল না। আর সেই প্রেমপত্র লেখা?

মনে পড়তেই হেসে ফেললাম।—স্বর্ণর খবর কি রে?

অলক লজ্জা পেল। বললে, কি জানি, ওর তো সেই আসানসোলে বিয়ে হয়েছিল, তারপর···

ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন দু জনে, স্বর্ণর সঙ্গে ভালবাসাবাসি হয়েছিল অলকের। কিন্তু বেচারা বাংলায় ভীষণ কাঁচা ছিল, আর কি বিশ্রী হাতের লেখা। ফলে অলকের নাম দিয়ে আমাকেই প্রেমপত্র লিখে দিতে হত। কত শলাপরামর্শ করে সুন্দর সুন্দর চিঠি দিতাম, আর উত্তর পেলেই এসে হাজির হত অলক। আমি বলতাম, স্বর্ণ দেখিস শেষে আমারই প্রেমে পড়ে যাবে, যদি জানে আমার লেখা···। কোন দিন বলতাম, স্বর্ণকে একটা চুমু খেতে দিবি বল, তা নইলে যাও বাবা নিজে লিখবে যাও। ওর তখন হাতের লেখা বদলানোর উপায় নেই, অথচ আমার কথা শুনে ওর খুব খারাপ লাগত। যেন আমি সত্যি সত্যি চুমু খেতে চাইছি। তখন তো জানতাম না, যাকে ভালবাসা যায়, মানুষ তাকে ভিতরে ভিতরে শ্রদ্ধাও করে।

সে-সব কথা মনে পড়তেই বললাম, তোর বউকে কিন্তু সব বলে দেব।

অলক হা হা করে হেসে উঠল।—আরে আমিই তো সব বলেছি, তুই চিঠি লিখে দিতিস তাও। তাই তো বলে, তোকে একদিন···

আমি কথা দিলাম, অলক বিশ্বাস করে চলে গেল।

কিন্তু আমার ভীষণ খারাপ লাগল। রেখাও সব শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।—যেতে হয় তুমি একা যাও। আর ভালমানুষ সেজে তাদের আসতে বলো না যেন।

আচ্ছা, কারও বাড়ি গিয়ে তাকে আসতে না বললে চলে!

আর ইচ্ছেও তো হয়। এত যে একা একা লাগে, সন্ধ্যের পর কোথায় যাব খুঁজে পাই না, ছুটির দিনগুলো এত বিস্বাদ হয়ে ওঠে, কোথাও গিয়ে গল্পগুজব করে যশগুল হয়ে যেতে সাধ হয়…নাঃ, শুধু একটা বসবার ঘরের অভাবে ক্রমশ যেন নিজেদের গুটিয়ে ফেলছি ; সকলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছি।

মনেপ্রাণে যেটা ইচ্ছে হয় সেটাই একটা আতঙ্ক।

মনে হয় যাদের বেশ একটা সুন্দর সাজানো গোছানো বসবার ঘর আছে তাদের মত সুখী আর কেউ নেই।

অনেক আগে একবার বিজ্ঞাপন দেখে ট্যুইশনির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, পরাশর রোডের সেই বাড়িটা যেন চোখে লেগে আছে। জানালায় কি সুন্দর পর্দা, দেয়ালে হাল্কা সবুজ রঙ, আর বসবার ঘরখানা! থালার মত বড় একটা ঘষা কাঁচের শেড, আলোটা ঠিক সাদা মেঘ-ঢাকা জোৎস্নার মত। মেঝেতে কি নরম কার্পেট, জুতো পরে ঢুকব, না খুলে রেখে, ভেবে পাই নি। আর শোফা সেট! কি নরম গদী, কি চমৎকার ফিকে রঙের ঢাকনি।

বহুদিন অবধি অমনি একটা ড্রয়িং রুম আমার স্বপ্ন ছিল। ভাবতাম, মাইনেটা যদি বাড়ে, ভাড়া নিয়ে একখানা বসবার ঘর সাজাবো মনের মত করে। তখন আর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন কাউকে ভয় পাব না।

ভয় পাব না বললেই তো ভয় দূরে সরে থাকবে না।

রবিবার বিকেলে ঘুম থেকে উঠে সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি, ইস্, চায়ের কাপটাও কি বাজে, দোকানের শো-কেসে সেদিন কি সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দেখলাম,—কুমকুম এসে বললে, ছোটদা, কে এসেছে তোমার কাছে, সঙ্গে মেয়েছেলে…

চা-টা নিমেষে আরও বিস্বাদ লাগল।

কে এল? অবনীবাবু? অলক? রেখাদের সম্পর্কের কেউ?

তাড়াতাড়ি না গিয়েও উপায় নেই, নিশ্চয়ই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টুটু, হিমু পড়তে বসেছে, মাস্টার এসেছে তাদের, সেখানেও যে বসতে বলব তার উপায় নেই। রেখাই বা গেল কোথায়?

গিয়ে দেখি অলক। সঙ্গে বউ।

অলক বললে, বলেছিলাম না, না গেলে নিজেই আসব। বলে হাসল ও। পরিচয় করাল, এই উমা।

বাঃ বেশ ছিপছিপে চেহারা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ, রঙটা একটু চাপা, চাপা বলেই ভাল লাগছে।

উমা হাসি হাসি মুখে বললে, পর্বত যখন মহম্মদের কাছে যাবে না···

ভিতরে ভিতরে তখন অস্বস্তি বোধ করছি, আমার হাসিটাও কেমন নকল নকল ঠেকল নিজের কাছেই। মন খুলে কথা বলতেও পারছি না। কিন্তু এভাবে আর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। বললাম, চলুন। চল্ ভিতরে চল্।

ঘরের ভিতরে নিয়ে এসে ভাঙা চেয়ারটা টেনে দিলাম অলককে, উমা খাটের পাশে বসল।

রেখা এল, কুমকুম এল।

অলক দেখে বললে, কুমকুম? এত বড় হয়ে গেছে? বাগেরহাটে থাকতে, মনে আছে? ওকে রথ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম কোলে করে?

কুমকুম হাসল। বোকার মত। ও তো চিনতে পারছে না। আর আমি ভাবলাম, বাগেরহাটের সেই বাড়ি, সেই বাগান—অলক আর উমা এই ঘরখানা দেখে কি ভাবছে কে জানে।

অস্বস্তি কিংবা ঘরদোরের লজ্জায় রেখাও ওদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করতে পারল না।

বাবাকে প্রণাম করে মেজদার সঙ্গে মেজবৌদির সঙ্গে গল্প করে অলক চলে গেল। বারবার বলে গেল, যাস কিন্তু একদিন।

ওরা চলে যাওয়ার পর কি স্বস্তি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ওরা কি ভাবল কি জানি! এক সময় তাই অনুশোচনায় মুষড়ে পড়লাম। এসেই যখন পড়ল, তখন এত সঙ্কোচের কি ছিল, মন খুলে গল্প করে আবার তো ছোটবেলার সেই জীবনে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে যেতে পারতাম। তা নয়, শুধু 'হুঁ' আর 'না'। রেখাও তো দু চারটে কথা বলতে পারত। অলক এত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল আমার, এত আপন, অথচ মনে হল যেন সিঙাড়া আর চা খেতে এসেছিল।

নিজের ওপর রাগ হল, রেখার ওপর, সমস্ত বাড়িটার ওপর। এক এক সময় রাগে সব তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে, কিংবা মেজদা, মেজবৌদি, হিমু, কুমকুম সকলকে ছেড়ে একটা ছোট্ট সুন্দর স্বার্থপরতার ফ্ল্যাটে পালাতে ইচ্ছে করে। তখন আর এত অস্বস্তি থাকবে না, সঙ্কোচের খাঁচার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হবে না।

—কি ভাবল বল তো আমাদের ? রেখাকে বললাম।

রেখা মুখ কাচুমাচু করে বললে, সেবার ছোট জামাইবাবু এসেছিল, ফিরে গিয়ে বলেছে আমরা নাকি কথা বলি না, মিশতে জানি না…

আমি হাসলাম।—কেন তা তো জানে না।

রেখা হঠাৎ হেসে উঠল, বললে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, চল একদিন অলকদের বাড়ি যাই।

সত্যি তো, এখন তো আর ভয় নেই। গেলেই হয়। বরং অলক খুশী হবে, উমা খুশী হবে, আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা হবে না।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে একদিন গিয়ে হাজির হলাম রেখাকে সঙ্গে নিয়ে।

গলিটায় ট্যাক্সি ঢুকতে চাইল না, তাই ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির নম্বর দেখে হাঁটছি, একটি বাচ্চা মেয়ে জিগ্যেস করল, কাদের বাড়ি খুঁজছেন ?

অলকের নাম বলতেই বললে, উমাদিদের বাড়ি ? ঐ তো দরজায় কড়া নাড়ুন।

ও মা, এই বাড়ি ! মান্ধাতা আমলের জীর্ণ বাড়ি, দেয়ালে গঙ্গা জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে শ্যাওলা ধরেছে। গলিটায় কেমন একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ।

কড়া নাড়তেই কে এসে দরজা খুলে দিল। কে আবার ? অলক। তারপর আমাদের দেখে অলকের সমস্ত মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ! চিৎকার করে ডাকল, উমা, এই উমা, আরে দেখবে এস কারা এসেছে। কি ভাগ্য রে, তোরা সত্যি সত্যি…আসুন বৌদি, আসুন।

উমাও ছুটে এল। এক গাছ ফুলের মত মুখ নিয়ে। আনন্দে বিস্ময়ে রেখার আর আমার দুখানা হাত ধরে ফেলল দু হাতে। —আসুন, আসুন। এই মণ্টু, মণ্টু, তোর সেই নতুন কাকীমা এসেছে রে…

মণ্টু তো এসে ঢিপ করে প্রণাম করল আমাদের।

উঁচু নিচু ভিজে ইটের উঠোন ডিঙিয়ে একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে গেল উমা। কিংবা ঐ একটাই ঘর হয়তো। একটা তক্তপোশ, কম দামী একটা রেডিও, কেরোসিন কাঠের একটা খাবারের আলমারী, দেয়ালের পেরেকে একটা তালপাতার পাখা।

অলক ভাঁজ খুলে ক্যানভাসের চেয়ারটা পেতে দিল, নিজে একটা মোড়া

টেনে নিল। আর উমা রেখার হাত ধরে হাসতে হাসতে তাকে তক্তপোশের ধারে বসাল।

তারপর বললে, এক মিনিট ভাই, চায়ের জলটা বসিয়ে আসি।

আমি বললাম, আহা, এত তাড়া কিসের ?

—আপনাদের নামে আমারও এক কাপ হয়ে যাবে যে, স্বার্থ আছে বৈকি। বলেই চলে গেল উমা।

দু মিনিট পরেই ফিরে এসে বসল রেখার পাশে। বলল, ওঁরা এত বন্ধু, আমরাও দুজনে খুব বন্ধু হয়ে যাব, কি মশাই, রাজি তো ? বলে রেখার হাতে হাত রাখল।

একটু পরেই রেখাকে বললে, চল ভাই। তুমি বললাম বলে রাগ করলে না তো ?

রেখাকে দেখে মনে হল ও অনেকদিন পরে যেন হাসতে শিখেছে। খুশী খুশী।

উমা আমাকে বললে, গল্প করুন। বলেই রেখাকে বললে চল চল, আমরা দুজনে মিলে চা-টা করে নিই।

বাঃ রে, উমা নয় রেখা এসে চা দিয়ে গেল। আমার ভীষণ ভাল লাগল। খুব আপন আপন। যেন নিজেরই বাড়ি।

একটু পরেই উমা চিৎকার করল।—ও স্যার আপনারা এখানে আসুন না ; এক সঙ্গে গল্প করি।

অলক হেসে বললে, চল্, তোকে ডাকছে।

রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই দুটো পিঁড়ি এগিয়ে দিল উমা।—বসুন এখানে। একা একা দুজনে স্বর্ণলতার গল্প করবেন, ওসব হবে না।

—স্বর্ণলতা কে ? রেখা চোখ কপালে তুলল।

—ও মা জান না ? বলে রসিয়ে রসিয়ে আমার প্রেমপত্র লিখে দেয়ার গল্পও বলল উমা, বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

আমি ততক্ষণে লক্ষ্য করেছি, আটা মেখে লুচি ভাজার ব্যবস্থা করছে উমা, আর রেখা লুচি বেলে দিচ্ছে।

হঠাৎ তাই বলে বসল, কি মশাই, বউকে খাটিয়ে নিচ্ছি বলে চটে যাচ্ছেন না তো !

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

লুচি ভাজতে ভাজতে উমা হঠাৎ সহাস্যে বলে উঠল, সত্যি বলুন তো, স্বর্ণলতা খুব সুন্দর ছিল ? আমার চেয়ে ?

ছেলেবেলার গল্পের মধ্যে ডুবে গিয়ে কিভাবে যে সময় কেটে গেল টেরই পাই নি। উমা প্রথমে আব্দার ধরেছিল রাত্রেও খেয়ে যেতে হবে। আরেকদিন এসে খেয়ে যাব কথা দিলাম।

যখন বিদায় নিলাম, বাস স্টপ অবধি ওরা দুজনেই এল।

বাস ছেড়ে দেওয়ার পরও ফিরে দেখলাম ওরা তখনও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

রেখা ওর হাতে বাঁধা ছোট্ট ঘড়িটা দেখে বললে, পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দশটা বেজে যাবে।

বললাম, হুঁ।

তারপর স্বগতোক্তির মত যেন নিজেই নিজেই বললাম, খুব মিশুকে কিন্তু ওরা, কেমন আপন-আপন।

রেখা কি ভাবছিল।

—ওদেরও কিন্তু কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল রেখা। শুধু বললে, হ্যাঁ খুব মিশুকে।

ডাইনিং টেব্‌ল

মনিঅর্ডার পিওনের কাছে নামটা শুনে আমি বললাম, বুড়ি, তোর মা বোধ হয় টাকা পাঠিয়েছে।

বাইরের লোকদের সামনে ডাক নামে ডাকলে, বিশেষ করে সেই ডাক নামটা তেমন মনের মত না হলে, আমাদের সময়ে সবাই অস্বস্তি বোধ করত। ইস্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার পর আমাকে বাইরের কেউ আর 'খোকা' বলে ডাকে নি। কলেজের বন্ধুদের কাছ থেকে ওটা লুকিয়ে রাখতে কি কম বেগ পেতে হয়েছে! কিন্তু একালের ছেলেমেয়েদের দেখি সব অন্য নিয়ম। বুড়িদের কলেজের দুটো মেয়ে একদিন বেড়াতে এসেছিল, আমি তাদের সামনে ওকে বুড়ি না বলে 'অমিতা' বলে ডাকলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিন-জনের কি হাসি। কারণটা বুঝলাম যেদিন ওর সহপাঠী একটি ছেলে এসে জিগ্যেস করল, বুড়ি আছে? 'ওসব পোশাকী নাম, ছোটমামা, আজকাল ঐ কলেজের খাতাতেই থাকে। আমরা হাসু সান্যাল, টুকু বোস, ঝুমা নন্দী…সেদিন আমার খোঁজ করতে এসেছিল, সে-ছেলেটার নাম হাবু দাশগুপ্ত।'

আমি আফটার-অল বুড়ির ছোটমামা। কিন্তু ওসব গুরুজনী গার্জেনি অরুণার চরিত্রে নেই। সেদিন একটা ছেলে বুড়ির খোঁজ করতে এসেছে শুনে অরুণা যে-ভাবে আমার সঙ্গে চোখাচোখি করে ঠোঁট টিপে হেসেছিল, হাবু দাশগুপ্তের নামটা শুনেও ঠিক তেমনি ভাবে চোখে হেসেছে। বলে বসেছে, দেখ বাপু, শেষে ঐ হাবু দাশগুপ্তই যেন কাবু না করে তোমাকে। 'ঈস্' বলে সেদিন নাকের ডগা থেকে এমন ঘেন্না ঝরিয়ে দিয়েছিল বুড়ি, যে আমরা নিশ্চিন্ত না হয়ে পারি নি।

আসলে ওর সম্পর্কে আমার একটু দুশ্চিন্তা ছিলই। বীণা, আমার পিসতুত বোন সিউড়িতে তার সংসার বদলি করার সময় বলেছিল, উনি হঠাৎ ট্র্যান্সফার হলেন, বুড়ির এম. এ পরীক্ষা তো আর ক'টা মাস, ওকে তোমার কাছে রেখে যাব খোকাদা?

আমি তার বছরখানেক আগে এই দু ঘরের ফ্ল্যাট নিয়ে আলাদা বাসা করেছি। পৈতৃক বাড়িটার পার্টিশন নিয়ে আমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি লেগেই ছিল। চার জায়ের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই কখনও কখনও রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে উঠত। যদিও ঝগড়াটা হত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। আমি আমার অংশ বেচে দিয়ে ভেবেছিলাম এই দু ঘরেই অনেক শান্তি।

এমনিতেই জায়গা নেই, তার ওপর আবার বুড়িকে এনে রাখার ইচ্ছে অরুণার ছিল না। তবু কম বয়সে বীণা আমার শুধু বোন নয়, বন্ধুও ছিল। আমি যখন একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, তখন ওর কাছেই সব কথা বলতে পারতাম, আর ও আমাকে দাবার চাল দেওয়ার চালে ভাল ভাল অ্যাডভাইস দিত। তাই ওর সম্পর্কে আমার একটা সফ্ট্ কর্নার আছে। আছে বলেই ওর কথা ফেলতে পারি নি।

সে যাই হোক, বুড়ির নামে মনিঅর্ডার শুনে একটুও বিস্মিত হই নি। কারণ বীণা মাঝে মাঝেই ওর মেয়েকে টাকা পাঠাত।

বুড়ি কিন্তু ফিরে এল লাফাতে লাফাতে। হাতে তিন তিনখানা দশ টাকার নোট।

বললাম, কি ব্যাপার, একেবারে হাসির হোসপাইপ হয়ে গেলি যে।

কথাটা আমার নয়, বুড়িই একদিন বলেছিল। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের বন্ধুদের কাছে শুনে এসে ও খুব মজার মজার কথা বলত।

বুড়ি উত্তর দিল না। হাসতে হাসতে এম. ও. কুপনটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। সেটা হাতে নিয়ে টাইপ করা লাইন দুটো পড়েই আমার চক্ষু চড়কগাছ।—সে কি রে!

জয় আমার আট বছরের ছেলে, সে দু হাতের মার্বেল হাফ প্যান্টের দু পকেটে ভরে দিয়ে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে বাবা?

অরুণাও ততক্ষণে হৈ চৈ শুনে রান্নাঘর থেকে এসে হাজির।—এত ফুর্তি সক্কলের, কি হয়েছে কি?

সুমির বয়স তিন। ও অনেক বেশী রিয়ালিস্ট, প্রশ্নট্রশ্নর ধার ধারে না। ও সটান গিয়ে বুড়ির হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে তখন। কারও হাতে টাকা পয়সা দেখলেই ওর লজেন্সের কথা মনে পড়ে যায়।

বুড়ি তা দেখে আরও এক দমকা হেসে উঠে বললে, হবে হবে, লজেন্স না, গোটা একটা ক্যাডবেরি কিনে দেব। বলেই সুমিকে টুপ করে তুলে নিয়ে

একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল। আর সুমির তখন চাপের ঠেলায় ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার।

—জীবনে প্রথম রোজগার, কি আনন্দ তুমি বুঝবে না মামীমা।

বলার অবশ্য দরকার ছিল না, বুড়ির সারা শরীর তখন আনন্দ হয়ে গেছে।

মাস দুই আগে বুড়ির লেখা কি একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল একটা পত্রিকায়। ওর একটু সাহিত্য বাতিক আছে, তবে ছাপা হয়েছিল ঐ একটাই। সেদিনও আমরা খুব খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্যে ও যে আবার তিরিশটা টাকা পাবে আমরা কেউই ভাবি নি।

সেই প্রবন্ধটা পড়ে ওর মামীমা পিঠ চাপডানিব মত হেসে বলেছিল, মন্দ হয় নি। তার জন্যে তিরিশটা টাকা পেয়েছে শুনে সেও একমুখ হাসি হয়ে গেল। বললে, লেখাটা কিন্তু সত্যি ভাল হয়েছিল।

বুড়ির তখন লেখাটেখা নিয়ে একটুও শিরঃপীড়া নেই। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে পা দোলাতে দোলাতে বললে, টাকাটা দিয়ে কি করা যায় বল তো ছোটমামা?

বললাম, তোর মাকে একটা শাড়ি কিনে দে।

—আহা রে! শ্লেটেব ওপর ভিজে ন্যাকড়া বুলিয়ে দিল।—শাড়ি বুঝি কম আছে মায়ের। একটাও পরতে দেয় না, তা জান, সব জমিয়ে জমিয়ে রাখে।

তারপরই অরুণার মুখেব দিকে তাকিয়ে হাসিহাসি মুখে বললে, এই টাকা দিয়ে মামীমার পরীক্ষা নেব বুঝলে ছোটমামা, এই রোববার গ্র্যাণ্ড ফীস্ট।

অরুণা বললে, পাগল নাকি। ববং নিজেব জন্যেই কিছু কেনো। আমার পরীক্ষা না হয় মামার টাকাতেই নিও।

কিন্তু বুড়ি কারও কথা শোনার মেয়েই নয়।

আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম, রবিবার সকালেই বুড়ি বলে বসল, মামীমা, তুমি ফীস ফ্রাই করতে জান?

ওর মামীমা উত্তর না দিয়ে চোখেব ইশারায় নিষেধ কবল আমাকে। সুতরাং আমাকে বলতেই হল, তোর টাকা নিয়ে আমি বাজার যাবই না।

—তোমাকে দিচ্ছে কে! বুড়ি বলে বসল, আমি নিজে বাজারে যাব। মেয়েরা আজকাল বাজার যায় না নাকি!

অদ্ভুত জেদ মেয়েটার। কিছুতেই ছাড়ল না, জয়কে সঙ্গে নিয়ে নিজেই চলে গেল প্লাস্টিকের বাস্কেটটা হাতে ঝুলিয়ে।

ঘণ্টাদেড়েক পরে ফিরে এল, প্লাস্টিকের ঝোলায় একটা গোটা ইলিশ। আরও কি কি সব। কিন্তু মুখে তখন আর হাসি নেই, বেশ নার্ভাস নার্ভাস দেখাচ্ছে। ফর্সা মুখটা লালচে, ঘাম চকচক করছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আরিব্বাস, বাজার করা খুব ডিফিকাল্ট ছোটমামা।

জয় হেসে উঠে বললে, জান বাবা, বুড়িদি না বাজারে গিয়ে শুধু ঘুরছে আর ঘুরছে, কি কিনবে ঠিকই করতে পারছে না।

তারপর হঠাৎ বুড়ির দিকে তাকিযে বললে, গোটা ইলিশ কিনেছি দেখে লোকগুলো কেমন তাকাচ্ছিল।

জয়ের কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। হাসল না শুধু অরুণা। বাজার করার চেয়ে রান্না করা যে কত ডিফিকাল্ট তা আন্দাজ করে নিয়ে আমি আর অরুণার দিকে তাকাতে সাহস পেলাম না।

খেতে বসে কিন্তু দেখা গেল সত্যি সত্যিই ফীস্ট। বুড়ি তার মামীমার সঙ্গে সেই যে রান্নাঘরে গিযে ঢুকল, তারপর ওদের হাসি চিৎকার ব্যস্ততায় বেশ বোঝা যাচ্ছিল অরুণা তখন আর একটুও বিরক্ত নয়। এই ছোট্ট ফ্ল্যাটের ক্ষুদে কীচেন যেন রীতিমত বিয়েবাড়ি। মাঝে মাঝে নানা রকমের সুস্বাদু গন্ধ ভেসে আসছিল, আর তার সঙ্গে ওদের হৈ-হল্লা, রসিকতা।

বারোটা না একটা, ঘড়ি তো দেখি নি, তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে দেখি মেঝেতে সব ক'টা আসন পেতে জলের গ্লাস সাজিয়ে বুড়ি পরিবেশন করার জন্যে রেডি। জয়, সুমি, এমন কি ওর মামীমাকেও জোর করে বসিয়ে দিয়ে বললে, ভয় নেই, সব একসঙ্গে খাব আজ, আমিও বসব।

থালার দিকে, থালার চারপাশে বাটি প্লেট ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, সব টাকা শেষ করে এলি নাকি!

বুড়ি হেসে বললে, ভারি তো তিরিশটা টাকা, একটা গোটা ইলিশের দাম কত জান!

নিজেদের জন্যে এত খরচপত্তর কিংবা এত রান্নাবান্নার ঝামেলা দেখা তো অভ্যাস নেই। কাউকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হলে তবেই এসব ভাবা যায়। তাই বললাম, আপিসের অতুলবাবুদের বাড়ি সেবার খেয়ে এসেছিলাম, ওঁকে

নেমন্তন্ন করলে হত। বললাম, বুড়ি তুইও তো তোর বন্ধু ঝুমাকে বললে পারতিস।

বুড়ির থালা থেকে অরুণা কি একটা তুলে নিতেই সে হাঁই হাঁই করে উঠল, আর জয় তার মায়ের থালা থেকে কি যেন তুলে নিল। আমি ওদের রকমসকম দেখে দু হাত মেলে মাছের প্লেট দুটো রক্ষা করার চেষ্টা করলাম। আসলে এও এক ধরনের খেলা। একসঙ্গে খেতে বসলেই প্রতিদিন হয়।

আর গল্প গল্প, বুড়ি বলে, পরচর্চা ক্লাস।

তবু এত সব শুধু নিজেদের জন্যে! বললাম, এতই যখন হল ওদের নেমন্তন্ন কবলেই হত।

তা শুনে বুড়ি আর তার মামীমা পরস্পর চোখাচোখি করে হাসল। বোঝা গেল দুজনে এর আগেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছে।

ওরা হয়ত চেপে যেত, জয় অতশত বোঝে না, ওদের কথাবার্তা শুনেছে বলেই ব্যাপারটা প্রকাশ করে ফেলল। বললে, ওদের তো খাবারটা টেবিলে আছে, অতুল কাকাদের!

খাবার টেবিল মানে ডাইনিং টেব্‌ল। খোঁচাটা আবার নতুন করে এসে লাগল। হঠাৎ সব কিছু যেন বিস্বাদ ঠেকল। মনে হল এই ছোট্ট ফ্ল্যাটের একটা অভাব, আমার এই একটা ক্ষুদ্র অক্ষমতাকেই অরুণা যেন বার বার মনে পড়িয়ে দিতে চায়।

আমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে পার্টিশন হবার আগে আমরা যখন ঐ পুরনো পৈতৃক বাড়িটায় থাকতাম, তখনও একবার ডাইনিং টেব্‌লের কথা উঠেছিল। বড়দা মেজদা এমনিতেই এসব পছন্দ করত না, তার ওপর জেঠামশাই এসে হয়তো বলবেন, কি রে সাহেব হয়ে গেলি যে সব, জেঠাইমা ছোয়া বাঁচিয়ে বলবেন, ছি ছি টেবিল শকড়ি করছিস, জাতজন্ম···এইসব ভয়েই ওপথে যাই নি। এখানে তো আমি নিজেই রাজা, কে কার পরোয়া করে আর একটা ডাইনিং টেব্‌ল, কিই বা তার দাম। সংসার যতই টানাটানির মধ্যে চলুক, একটা ডাইনিং টেব্‌ল কি আর চেষ্টা করলে কিনতে পারতাম না!

খাবার টেবিল নিয়ে জল্পনাকল্পনা অবশ্য এ বাসায় উঠে আসার পর থেকেই চলছিল। খুকির মা আমাদের বাসন মাজার ঠিকে-ঝি, মাসের মধ্যে বিনা

নোটিশে তিন-চারদিন কামাই তার লেগেই আছে। আর সে সময় অরুণার মেজাজ একেবারে তিরিক্ষি হয়ে থাকে। বাজার থেকে কলাপাতা আনতে ভুলে গেলে আর রক্ষে নেই।

—খুকির মা ফিরেছে আজ, মামীমার মেজাজও নরম, দেখেছ ছোটমামা! রাত্রে খেতে বসে বুড়ি একদিন রসিকতা করে বলেছিল।

কথাটা সত্যি। সত্যি বলেই অরুণা রেগে গুম হয়ে গিয়েছিল। আর বুড়ি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলেছিল, যাই বল, একটা ডাইনিং টেব্‌ল কিনে ফেল ছোটমামা। কত সুবিধে বল তো। কাঁচের প্লেটে খাবে, ভিম দিয়ে ধুয়ে নেবে, ব্যস। কারও তোয়াক্কা করতে হবে না।

অরুণা ততক্ষণে হেসে ফেলেছে। —উঠবোস করতে করতে কোমরে ব্যথা হয়ে যায়, সে আর ও কি বুঝবে। মেঝেতে ন্যাতা বুলোতে হত দু বার করে, তখন বুঝত।

আমি কোন জবাবই দিই নি। জয় যখন তার মার কাছে শোনা কথাটা শোনাল: বাবা, তুমি কিন্তু খুব কিপ্‌টে, তখনও না। আসলে একটা খাবার টেবিল কেনা প্রায় ঠিকঠাক করেই ফেলেছিলাম মনে মনে। দিনকয়েক দোকানেও ঘুরে কাঠের টেবিল কিনব, না ষ্টীলের তা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একদিন অতুলবাবু তাঁর বিবাহবার্ষিকীতে নেমন্তন্ন করে বসলেন। আমরা ওসব জানতামও না, ক বছর বিয়ে হয়েছে জিগ্যেস করলে হিসেব করেও বের করতে পারি না। তবু অতুলবাবু আর তাঁর স্ত্রী নেমন্তন্ন করে গেলেন বলেই যেতে হয়েছিল। আর সেই যাওয়াই কাল হল।

অরুণা আর জয় ফেরার পথে ট্যাক্সিতেই আলোচনা শুরু করে দিয়েছিল। ফ্রায়েড রাইস কিংবা মুর্গীর ঠ্যাঙের প্রশংসা নয়, ডাইনিং টেব্‌লটার প্রশংসা। —কি রকম চকচকে কালো মার্বেল দেখেছ, মুখ দেখা যায় খাবার সময়।

জয় বললে, কিনতে হলে ঐ রকমই কিনো, বাবা। গ্র্যাণ্ড।

যেন সমস্যাটা শুধু টাকার। যেন সমস্যটা শুধু ইচ্ছের। আমার দুখানা ঘর আর এক ফালি বারান্দায় এমনিতেই তো পা ফেলার জায়গা নেই। খাট, আলমারি, জয়ের পড়ার টেবিল, অরুণার ড্রেসিং টেব্‌ল, আলনা, লেপ বালিশ তুলে রাখার চৌকি···এর ওপর আবার একটা খাবার টেবিল এনে কোথায় ঢোকাব আমি ভেবেই পেতাম না। অরুণার এক কথা! তুমি কিনেই ফেল না আমি সরিয়ে টরিয়ে ঠিক জায়গা করে নেব।

মাঝে মাঝে তাই মনে হয়েছে কিনেই ফেলি। এই তো অতুলবাবুরা কত দূরে দূরে ছিলেন, একটা দিনে গল্পগুজব করে কত কাছের লোক হয়ে গেলেন।

—সত্যি ভাখ, যাওয়া আসা নেই বলে সবাই কত পর পর হয়ে যাচ্ছে। বিয়েবাড়িতে কোথাও দেখা হলে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। অরুণা একবার বলেছিল।

অথচ একটা ডাইনিং টেব্‌ল থাকলে দিব্যি মাঝে মাঝে একে ওকে নেমন্তন্ন করা যেত। যারা দূরে সরে যাচ্ছে তাদের আবার কাছে আনা যেত।

লোভটা তাই মনের মধ্যে রয়েই গিয়েছিল। মুখেই শুধু আপত্তি জানাতাম। কিন্তু হঠাৎ সুযোগ ঘটে গেল। আপিসে এক বছর ইনক্রিমেণ্টের টাকাটা কি এক উপধারায় আটকে পড়েছিল। এরিয়ার্সের সবটুকু একসঙ্গে হাতে পেতেই অরুণা বলে বসল, আর কোন কথা শুনছি না, ডাইনিং টেব্‌ল!

জয় কোথায় ছিল, হেসে উঠে বললে, টেবিল হলে সুমি তো হাতই পাবে না, না বাবা। ও টেবিলের ওপর বসবে।

বুড়ি ধমক দিল—তুই থাম, তুই নিজেও নাগাল পাবি নাকি? তারপব হেসে বললে, একটু বড় দেখে কিনো মামীমা, দু চারজন বাইরের লোকও তো আসবে মাঝে মাঝে। ঝুমাদের টেবিলটাও খুব সুন্দর, ওরকম হলেও···

শেষ অবধি অরুণা আর বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে দু পাঁচটা দোকান ঘুরে একটা টেবিল করিয়েই ফেললাম। চকচকে কালো মার্বেল নয়, কাঠেরই, তবে ডিজাইনটা খুব সুন্দর। প্ল্যাষ্টিকের বেতবোনা চেয়ারগুলো আরও সুন্দর।

ঘরে তো এমনিতেই জায়গা ছিল না, বারান্দা থেকে জুতোর র‍্যাক, আলনা, ড্রেসিং টেব্‌ল সরিয়ে সেগুলোকে ঘরে ঢোকান হল। আর বারান্দা জুড়ে বসল ডাইনিং টেব্‌ল।

তবু বেশ লাগল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে।

বুড়ি রসিকতা করে বললে, এতদিনে তুমি কালচার্ড হলে মামীমা।

সুমির বয়েস তিন, সে কোনরকমে টেবিলের পাশে একটা নতুন চেয়ারে উঠে বসেছে, নামবার নাম নেই।

আর জয় হুম করে বলে উঠল, বাড়িটা একদম রেস্টুরেন্ট হয়ে গেছে, না বাবা ?

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

টেবিলটা শেষ অবধি কিনতে পেরেছি বলে সকলের যত আনন্দ রাত্রে খেতে বসে কিন্তু ততই অস্বস্তি। যত অস্বস্তি তত হাসাহাসি।

অরুণাই সব চেয়ে বেশী হাসল সুক্তোর বাটি উল্টে ফেলে। বললে, অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চচ্চড় করছে।

কিন্তু সীন ক্রিয়েট করলেন জেঠামশাই। দিন কয়েক পরেই একদিন বেড়াতে এলেন। আমরা জোর করে তাঁকে রাত্রে খেয়ে যেতে বললাম।

জেঠামশাই আসন পিঁড়ি হয়ে বসলেন একটা চেয়ারে। কিন্তু সেভাবে টেবিলে ভর দিয়ে খেতে গিয়ে আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তেন আর কি। নিজে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙলেন না, ভাঙলেন কাঁচের গ্লাসটা। হেসে উঠে তাই বললেন, টেবিলে খাবার সময় সাহেবরা কনুই দুটো কোথায় রেখে আসে বল্ তো ?

আসলে ওঁর কনুই দুটো ঠকাঠক টেবিলের ধারে লাগছিল। খাওয়াও হল না ওঁর। বললেন, আরে মেঝেয় বসে খাওয়ার মত বনেদিয়ানা আর আছে নাকি। আমার শাশুড়ী, ফুল পাতা কত সব নকশাকাটা নিজের হাতে বোনা উলের পুরু আসন পেতে দিত, সে কি নরম আসন, রুপোর থালায় যুঁই ফুলের মত ভাত, চারপাশে গোল হয়ে এক সারি রুপোর বাটি ·

আমরা সব্বাই হেসে উঠলাম। বুড়ি তো সম্পর্কে নাতনী, ও ঠাট্টা করে বললে, আর দরজার আড়ালে ঘোমটা-টানা জেঠাইমার কথা বললেন না ?

আমরা আবার হেসে উঠলাম।

তারপর একটু একটু করে কি ভাবে যেন সব হাসি চলে গেল। বুড়ির পরীক্ষা হয়ে যেতেই ও একদিন পেন্নাম-টেন্নাম করে শিউড়ি চলে গেল। আর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম বাইরের লোক কাছে আসা তো দূরের কথা, আমরাই পরস্পর থেকে দূরে সরে গেছি। খাবার টেবিলের এক প্রান্তে আমি আরেক প্রান্তে অরুণা। জয় কোনদিন জেগে থাকে, কোনদিন ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা কেউ কোন কথা বলি না। চুপচাপ দুজনে খাচ্ছি তো

খাচ্ছিই। খাওয়া যেন শুধুই খাওয়া। হাতা আর চামচের ঠুংঠাং কিংবা জলের গ্রাস নামানোর ঠক্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দও হয় না।

তখন ভাবতাম, টেবিল নেই এই লজ্জায় লোকদের নেমন্তন্ন করতে পারি না। একদিন অতুলবাবুদের খেতে বলেই মাসের শেষে সেকি টানাটানি। তুমি কেন, তখন আমরাও যেন আর ডাইনিং টেব্‌লটার নাগাল পাচ্ছি না।

ধুৎ। এর চেয়ে মেঝেয় বসে খাওয়াই ভাল ছিল। ডাইনিং টেব্‌লটা কোন উপরি আনন্দ তো দিলই না, ঘরগুলোও এখন আসবাবে ঠাসা। খাট, আলমারি, বাক্স-বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, পড়ার টেবিল· ·দুখানা তো ছোট ছোট ঘর···নড়াচড়ার উপায় নেই। ঘর যেন আমাদের জন্তে নয়, আমাদের আসবাবপত্র দেখানোর শো কেস শুধু।

—এত যখন অসুবিধে, আরেকটা বড় ফ্ল্যাট নিলেই হয়। অরুণা একদিন রেগে গিয়ে বলল।

এর আর কি উত্তর দেব। আরও বড ফ্ল্যাট, আরও জায়গা। কিন্তু কতটুকু জায়গাই বা লাগে মানুষের। টলস্টয়ের গল্পটা মনে পড়ল। কবর হলে সাড়ে তিন হাত, আমাদের তো তাও লাগে না। সাত টাকার কাঠ আর তিন ঘণ্টা চিতার ওপর বিশ্রাম।

—বাঃ রে, তা বলে একটু হাত পা ছড়াবার জায়গা থাকবে না। অরুণা বলল।

সত্যি আরেকটু জায়গা দরকার। একটু হাত পা ছড়াতে চাই। সুতরাং ঘরগুলো ক্রমশই বড় হতে লাগল, ঘরের সংখ্যা বাড়তে লাগল, সামনে সবুজ ঘাসের লন বাড়তে বাড়তে সামর্থ্য ছাড়িয়ে কল্পনা হয়ে গেল। তারপর কল্পনাতেই সেই জায়গাগুলোয় প্রয়োজনের আসবাব ঠাসতে ঠাসতে সেটা আবার ছোট হয়ে গেল।

হয়ত একটু অন্তমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি আপিস বেরোতে গিয়ে জোর একটা হোঁচট খেলাম ড্রেসিং টেবিলটায়। সঙ্গে সঙ্গে আয়নাটা উল্টে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

যন্ত্রণায় পায়ের বুড়ো আঙুলটা টিপে বসে পডলাম আমি। রাগে বলে উঠলাম, আসলে ফ্ল্যাটটা যেন ওরাই ভাড়া নিয়েছে, আমরা শালা সব উদ্বাস্তু।

আমার মুখে 'শালা' শুনে কিনা জানি না, জয় হি হি করে হেসে উঠল। হেসে উঠে বলল, ডাইনিং টেব্‌লটাই সব জায়গা খেয়ে নিয়েছে, না বাবা?

লেখকের মৃত্যু

পাঠকের জন্ম সেই বয়সে। যে বয়সে ওদের সাদা জীনের হাফ প্যান্টের নীচে দুটো পুরুষ্টু হাঁটু রাতারাতি ফেঁপে উঠছে। যে বয়সে ওদের গলার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠছে। মুখগুলো কৈশোর পার হওয়া ঘাম ঘাম ভরাট। ওরা হাতে হকি ষ্টিক নিয়ে সিমেণ্ট বাঁধান বড় নালাটার নড়বড়ে পুলের ওপর দিয়ে ছুটত খেলার মাঠের দিকে। ছুটতে ছুটতে কনভেণ্টের পাশের মেহেদি বেড়ায় ঘেরা মাঠের ধারে মিনিট কয়েকের জন্য থামত। মেহেদি বেড়ার সেই ভলি গ্রাউণ্ড। যেটাকে এতকাল সবাই উপেক্ষা করে এসেছে, কিন্তু তারপর হঠাৎ কখন থেকে ওরা উপেক্ষা করতে পারে নি। যেখানে ওরা সবাই একবার থামত। লাল স্কার্ট পরা, খাটো লাল স্কার্ট পরা অ্যংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েগুলো। তার মধ্যে একজন পাঞ্জাবী, আর একজন বাঙালী, সেই যে মিনি না কি নাম। লেডীজ সাইকেলে সাঁ সাঁ করে উড়ে যেতে যেতে বজ্জাত ছেলেদের মুখে দু আঙুল পুরে দেওয়া শিস শুনে সে ইংরিজীতে গালাগাল দিত, ওরা সকলে কনভেণ্টেব মাঠে ভলি বল নিয়ে দাপাদাপি করত। পর পর অনেকগুলি ক্লাস ওদের দিকে নাক বেঁকিয়ে চলে যেতে যেতে যেদিন মৈনুন, আফত আর রণেন হকি ষ্টিকে ঠেস দিয়ে কনভেণ্টের মেয়েদের ঝাঁপা-ঝাঁপি দেখতে শুরু করল, সেদিন আমিও সঙ্গে ছিলাম।

সাদা ধবধবে ব্লাউজ, একটু ফাঁপা ফাঁপ' আর লাল, টকটকে লাল স্কার্ট, তার নীচে ফর্সা ধপধপে হাঁটু, আর পা অ.র পায়ের পাতা, বিনুনি করা চুল, ছটফটে চুলের বিনুনি, আড়চোখের চাউনি, ঠোঁটটেপা হাসি, খেলার ফাঁকেই কানে কানে ফিসফিস······সব দেখতে দেখতে বুকের ভিতরটা আমার, আর মৈনুনের, আর আফতের, আর রণেনের কেমন যেন কেমন কেমন করে উঠত।

অথচ, তার আগে আমরা জানতামই না, মৈনুন কিংবা আফত কিংবা রণেন কিংবা ফার্স্ট বয় অলোক অথবা সেকেণ্ড মাষ্টার বিলাসবাবু ছাড়া পৃথিবীতে আর এক জাতের মানুষ আছে।

কনভেন্টের মেয়েদের খেলা দেখতে দেখতে সেদিন জানলাম, আছে, আরেক রকমের মানুষ আছে, সেদিন আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করলাম লাল ইটের ইনস্টিটিউট বাড়িটার পাশে জালে ঘেরা টেনিস কোর্টের ওপাশে যে সারি সারি কোয়ার্টার, তার একটা দেয়ালে নম্বর মারা আছে ৭১/৭৪৪ বাই ডবলু বি।

ডবলু আর বি দুটোর সঙ্গেই ইংরেজী বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে পরিচয় ছিল, কিন্তু একটা বাড়ির দেয়ালে তার কি সঙ্কেত, কিসের তা জানার ইচ্ছেও হয় নি। একাত্তর আর সাতশো চুয়াল্লিশই বা কেন তাও জানতে চাইব কেন।

কিন্তু ওই বাড়িটার দিকে তখন বারবার চোখ যেত। আর সাহেব বাজারে কিছু কিনতে যাবার সময় কেন জানি না ৭১/৭৪৪ নম্বরের সামনে দিয়ে যে লাল কাঁকরের সরু রাস্তাটা গেছে সেটাকেই শর্টকাট মনে হত।

তার কারণ বোধ হয় ওই পেঁয়াজি রঙের শাড়ি পরা শালিক পাখিটা। রোগা রোগা পাখিটা তখন পাখির মতই ফুরুক ফুরুক করে উডত বসত, কখনো জানলায়, কখনো পাশের বাগানের পেঁপে গাছের ধাবে, সামনের রাস্তায় কিংবা কাছের কালভার্টে। একদিন ভোরবেলায় নরেশদার ক্লাবে মুগুর ভাঁজতে যাচ্ছি, ঈশ্বরপ্রসাদের দোকানে তখন বড কড়াইটায় জেলাপী ভাজা হচ্ছে, দেখি কি সেই শালিক পাখিটা সবুজ শাডি পরেছে, হাতে শালপাতায় মোড়া গরম জেলাপী কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

পাখি দেখতেই শুধু আমার ভাল লাগত না। তার সঙ্গে তার মত কিচিরমিচির করে কথা বলতেও ইচ্ছে হত।

তাই ভাবলাম, এর চেয়ে ভাল সুযোগ তো আর পাব না।

পাখি না ফুল, নৈনীতাল আলু না ওল, মুখটা কিসের মত করে তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম জানি না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অঘটন ঘটে গেল। আমি গলাটাকে কোকিলের মত মিষ্টি করে ডাকতে গিয়েছিলাম, গলাটার বদলে মুখটাই কোকিলের মত হয়ে গেল। কারণ সেই মুহূর্তে একটা বাজখাই চিল কোথেকে সোঁ করে নেমে এসে পাখির হাতের ঠোঙায় ছোঁ মারল।

পাখির হাত ছড়ে গেল, ঠোঙা থেকে গরম জেলাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পাখির মুখ সাদা হয়ে গেল, পাখি ভয় পেল, পাখি লজ্জায় তাকাতে পারল না। আর ওর দু চোখের কোণে দু ফোঁটা জল চিকচিক করল।

তারপর সে আমার দিকে ক্রুদ্ধ দুটি চোখ তুলে তাকাল। বেশ বুঝতে পারলাম, আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে ও অস্বস্তি বোধ করেছিল, কিংবা ভয়, আর তাই অসতর্ক হয়ে পড়েছিল।

আমি আর কোন কথা না বলে নরেশদার ক্লাবে চলে গেলাম। কিন্তু মন থেকে পাখির মুখটা, ভোরবেলায় ঘুম ভাঙা ঘুম-জড়ানো চোখ, চোখের পাতা, এলোমেলো চুলের বিনুনি, ফোলা ফোলা মুখ--কিছু ভুলতে পারলাম না।

কেবল মনে হতে লাগল বাবার পকেট মেরে একটা রুপোর টাকা, কি খুচরো কয়েক আনা পয়সা যদি রাখতে পারতাম, তা হলে পাখিকে আবার জেলাপী কিনে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতাম।

নরেশদা দু চার দিন হয়তো লক্ষ্য করেছিলেন। তাই মুগুর ভাঁজলেই তিনি খুশী হতেন না। প্রায়ই বলতেন, শরীরচর্চা করলেই তো হবে না, মনের চর্চাও দরকার। ভাল ভাল বই পড়।

বিবেকানন্দের বই পড়তে বলতেন।

মৈনুন আর আফত আর রণেন তা দেখে হাসহাসি করত। মুগুর ভাঁজা আর কর্মযোগ পড়া ওদের একদম পছন্দ ছিল না। রণেন গর্ব করে বলত, আমি যখন গোল দিলাম ডোরা হাততালি দিয়েছে।

পাখি খেলা দেখতে যেত না। পাখি বাড়ির পাশের পেঁপে গাছের নীচে একটা চেয়ার পেতে বই পড়ত। আর আমাকে দেখতে পেলেই ওর মুখটা বইয়ের উপর আরও নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ত। তবু ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীতে রোজ বই বদল করতে যেতাম। না গেলে পাখির বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার কোন অজুহাত খুঁজে পেতাম না।

একদিন হয়েছে কি, ইনস্টিটিউটে গিয়েছি বই বদলাতে, হাতে ছিল একটা ধর্মগ্রন্থ। ব্রজেনদা লাইব্রেরীয়ান, তাঁকে পানের দোকানের ভিড়ের মত আমরা সবাই বই বদলে দিতে বলছি, হঠাৎ পিছন থেকে ঝাঁঝালো গলা।—আজ না দিলে ব্রজেনদা, গলাটা কচ্ করে কেটে দেব

মেয়েলি গলা শুনে ব্রজেনদা তাকালেন, হাসলেন। বললেন, রেখেছি রেখেছি, এইমাত্র ফেরত এল।

পাশের ভিড় সরে গেল, আর এগিয়ে আসতেই আমি পাখিকে দেখলাম।

পাখি আমাকে দেখল। তারপর সপ্রতিভ ভাবে টেবিলে রাখা বইটা টেনে নিয়ে নামটা দেখেই ও ফিক করে হেসে ফেলল।

আর আমার মনে হল ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিই। হাসবার কি আছে? নরেশদা তো বলেন এগুলোই ভাল বই। ধর্মগ্রন্থ কি লোকে পড়ে না? তবে ছাপা হয় কেন!

ভাগ্যিস চড়-মারা চোখে তার দিকে তাকাই নি। কারণ পরের দিনই আবার দেখা হল। দেখা হবারই কথা, কারণ আমি আধ ঘণ্টা ধরে ইনষ্টিটিউটের সামনে পায়চারী করেছিলাম। আর দূর থেকে পেঁয়াজি রঙের শাড়িটা দেখে ভিতরে ঢুকেছিলাম।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে পাখি বলল, ব্রজেনদা, অ্যাদ্দিনে একটা ভাল বই পড়ালেন, ব্রিলিয়েণ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে সেই চিলটার মত আমি বইটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিলাম। —ব্রজেনদা, আমাকে দিন এটা।

পাখি আড়চোখে তাকাল, হাসল।

আর আমার মনে হল বৃষ্টিতে ভেজা রোগা শালিকটার বুকের পালক তিরতির করে কাঁপছে, কেঁপে কেঁপে নতুন হয়ে উঠছে তার সারা শরীর।

মৈত্থুন আর আফত আর রণেন তখনও হকি ষ্টিক হাতে ফিক্সড হুইল সাইকেল চালিয়ে মিনি আর ডোরার গল্প বলে। আর আমি ভাবি, ওরা কি বোকা, কি বোকা!

কারণ তখন পাখি পাখিই, আমি চিল হয়ে গেছি।

আমি কোন ভাল বই পড়লে ওকে না পড়িয়ে আনন্দ নেই। পাখির ভাল লাগা বই আমার তেমন ভাল না লাগলে ও জ্বরো রুগীর মত মুখ করে। দুঃখ পায়।

ইনষ্টিটিউটে একই সময়ে বই বদলাতে দুজনে হাসি, কথা বলি, তারপর বিলিয়ার্ড রুমে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলা দেখি। গ্যালারির মত দু সারি বেঞ্চ, আমি নিচেরটায় বসি, ও ওপরের বেঞ্চে, ঠিক পিছনে। কখন কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কিছু বলে, কখন কাউকে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে বসে। তারপর এক সময় চিমটি কাটে।

ইনষ্টিটিউটের সামনে অনেকখানি সবুজ ঘাসের লন, মৌসুমী ফুল, ফোয়ারা। আর নীল নীল আলো। মাঝে মাঝে দু একটা গ্যাসের আলো।

কোন কোনদিন দুঃসাহসে ভয় করে ফোয়ারার আবছা অন্ধকারে এসে বসি দুজনে। কিন্তু আলোচনা সেই বই আর বই।

আর এই সময়েই ব্রজেনদা চাকরি থেকে অবসর নিলেন। নতুন যিনি এলেন তাঁকে আমরা উৎপলদা বলতে পারলাম না। যদিও তিনি ব্রজেনদার চেয়ে অনেক ছোট।

তাঁর চোখে চশমা ছিল, চুলে তেল দিতেন না, দেখতে সুন্দর ছিলেন, গরদের পাঞ্জাবি পরতেন।

তিনি শুধু বই দিতেন না, উপদেশও দিতেন। বইটা ফেরত দেওয়ার সময় জিগ্যেস করতেন। আর এইভাবে কখন থেকে তিনি যেন আমাদের দুজনের কাছেই হিরো হয়ে গেলেন।

আমি বলতাম, উৎপলবাবু ব্রজেনদার মত নন। উনি ভালমন্দ বোঝেন, বোঝাতে পারেন।

তখন দুজনেই আমরা উপন্যাস পড়ার নেশায় ডুবে গেছি। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের লাইব্রেরীতেও ছাড়পত্র মিলেছে। বই ভাল লাগলেই পাখিকেও না পড়িয়ে শান্তি নেই।

মৈনুন আর আফত ইতিমধ্যে কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস। রণেন আর আমি সাইকেলে সাত মাইল পার হই, কাসাই নদী পার হই ফেরীতে, কলেজ করি। ফিরতে ফিরতে সন্ধে।

ইনষ্টিটিউটে এসে পাখির সঙ্গে দেখা। তারপর বাড়ি।

সেদিন কলেজ লাইব্রেরী থেকে নেওয়া বইখানা হাতে নিয়ে ইনষ্টিটিউটের লনে বসে অপেক্ষা করছি। মনের মধ্যে পাখি পাখি পাখি।

না, পাখি এল না। রণেনও চলে গেল। তবু অপেক্ষা করতে করতে কখন যে বইটা নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছি কে জানে।

ঘাসের লন ছেড়ে আলোর নীচে একটা বেঞ্চে বসে বইটার পাতা খুললাম। শব্দের পর শব্দ, লাইনের পর লাইন পড়ে চলেছি। আর কি আশ্চর্য, সমস্ত মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীরে অদ্ভুত একটা অনুরণন।

ভাল লাগছে, ভাল লাগছে। বিস্ময় আর আনন্দ, আগ্রহ আর পুলক। নেশার ঘোরে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বইটা। তেজী ঘোড়ার মত টগবগিয়ে ছুটে চলেছি। তেজী ঘোড়ার পিঠে ছুটে চলেছে পেশোয়ারী মেয়ে ফিরোজা। আনারের দানার মত তার গাল, নীল নীল চোখ।

একটু একটু করে যখন সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, সব আলো নিভে গেছে, শুধু উপন্যাসের নায়িকার সেই নীল নীল চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছি।

রুদ্ধশ্বাসে সেই স্বল্পালোকিত বেঞ্চটিতে বসে পড়ে চলেছি। সমস্ত শরীরে অদ্ভুত এক পুলক। মনে হচ্ছে এমন আনন্দ বুঝি কখনও পাই নি। এমন বই বুঝি বা কখনও লেখা হয় নি। মনে মনে লেখকের পায়ে কয়েকটি শ্বেতপদ্ম রেখে প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কনভেন্টের মিনি আর ডোরা, ৭১/৭৪৪ নম্বরের পাখি—সব মুছে গেছে। সব পৃথিবী চুপ করে গেছে।

জেগে আছে শুধু একটি নায়িকা। ফিরোজা, ফিরোজা।

শেষ পৃষ্ঠা শেষ করে আচ্ছন্নের মত বসে রইলাম অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। স্বার্থপরের মত সমস্ত আনন্দটুকু বুকের গভীরে নিঃশ্বাসের মত টেনে নিতে চাইলাম।

তারপর, তারপর হঠাৎ আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। চমকে চারদিকে তাকালাম।

না, কেউ কোথাও নেই। সমস্ত লন ফাঁকা হয়ে গেছে, ইনষ্টিটিউটে কেউ নেই। বিলিয়ার্ড রুমের নুয়ে-পড়া উজ্জ্বল আলোগুলো কখন নিভে গেছে।

বইটা বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। হয়তো ফিরোজার দুঃখে। তারপর লক্ষ্য, খাঁকি কোর্ট পরা নাইট গার্ড খট্ খট্ বুট পায়ে এগিয়ে আসছে।

তার দিকে তাকিয়ে বোকার মত হাসলাম, তারপর সাইকেলের প্যাডেলে পা দিলাম।

কিন্তু অসহ্য একটা যন্ত্রণা তখন বুকের মধ্যে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে ডেকে ডেকে বইটা পড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে, পৃথিবীর সকলে আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠুক, অপূর্ব, অপূর্ব!

পাখির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হল। যেন এখনই, এই স্বর্গের স্বাদ না দিতে পারলে শান্তি নেই, শান্তি নেই। পাখি, পাখি, পাখি, মনের মধ্যে অবিরাম ডেকে চলেছি।

পরের দিনই পাখির সঙ্গে দেখা। বললাম, পাখি, এ বইটা পড। আজই, আজই পড়ে ফেল। মনে মনে বললাম, পাখি, তোমাকে-এক টুকরো স্বর্গ দিলাম। অনেক, অনেক বড়, বিশাল একটা আকাশ দিলাম।

নেড়েচেড়ে দেখল পাখি।—ভাল?

বললাম, হয়ত এর চেয়ে ভাল বই আর নেই। আর নেই।

পরের দিনই উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে এল পাখি। কথা বলতে গিয়ে ওর চোখ মুখ কেঁপে উঠছে। গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসছে।—পড়ি নি, পড়ি নি অতুলদা, এমন বই আমি কখনও পড়ি নি।

—আমিও না।

পাখি বলল, আমি ঘুমোতে পারি নি। সারারাত পড়েছি, আর ভেবেছি।

বললাম আমিও।

তারপর, তারপর আমরা দুজনাই হঠাৎ উৎপলবাবু আর ব্রজেনদার ওপর চটে গেলাম। পৃথিবীতে এমন বই থাকতে ওঁরা যেন আমাদের বঞ্চনা করে এসেছেন, আমাদের সময়, জীবন, আগ্রহ নষ্ট করেছেন। নিজেদের মনে হল আমরা এতকাল ঠকে গেছি। উৎপলবাবু আমাদের ঠকিয়েছেন।

আমি আর পাখি ইনষ্টিটিউটে ঢুকলাম।

উৎপলবাবু বই দিচ্ছেন। জন তিন চার লোক দাঁড়িয়ে আছে।

পাখি বইখানা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল।—কি বাজে বাজে বই দেন উৎপলবাবু, একটাও তো ভাল বই দেন না।

উৎপলবাবু চোখ তুলে তাকালেন।

পাখি হাসল। হাতের বইখানা দেখাল।—এ সব বই নেই আপনার? ব্রিলিয়েন্ট, ব্রিলিয়েন্ট, ভাবতে পারবেন না কি সুন্দর।

আমি বললাম, এর চেয়ে ভাল বই আমি পড়ি নি।

উৎপলবাবু বইটা নিলেন, মলাট উল্টে নাম দেখলেন। লেখকের নাম।

তারপর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, এ তো বটতলা। রাবিশ, এসব বই পড়ছ?

বলে হেসে উঠলেন। আশেপাশে যারা ছিল তারাও।

মনে মনে আমি চুপসে গেলাম। বটতলা? আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। পাখির মুখ সাদা হয়ে গেল। ও কোন কথা বলল না।

সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত ভাল লাগা পলকের মধ্যে মন থেকে মুছে গেল। অপরাধীর মত আমরা আমাদের ভাল লাগা গোপন করতে চাইলাম। মনকে বোঝাতে চাইলাম ভুল করেছি, ভুল করেছি। যে লেখককে উত্তেজনায় আনন্দে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম সেই মুহূর্তে সে টলে পড়ল। তার মৃত্যু হল।

আর পাঠকের? সেই মুহূর্তে তার জন্ম হল, না মৃত্যু, আজও জানি না, আজও জানি না।

গর্ব

রেডিওটা হঠাৎ বন্ধ করে দিল অরুণা। আমি চমকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, আরে আরে কি করলে, ভাল গান হচ্ছিল।

অরুণা বারান্দার দিকে আঙুল দেখাল, ইশারায় বললে, শোন।

ততক্ষণে আমিও শুনতে পেয়েছি। ঐ গানটাই আরও ভরাট, আরও মিষ্টি হয়ে বাতাসে ভেসে আসছে। এতক্ষণ যা ছিল শুধু ভাল লাগা, সেটা মুহূর্তের মধ্যে মুগ্ধতা হয়ে গেল। সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে আসছিল।

আর তখনই অরুণা বলল, রত্নাদের ওটা রেডিওগ্রাম। খুব দামী রেডিওগ্রাম কিন্তু ওদের।

যেন বলার কোন প্রয়োজন ছিল। ঐ ভরাট মিষ্টি আওয়াজটাই তো বলে দেয় ওটা কিনতে কত দাম লেগেছে। এই তো দিনকয়েক আগে একদিন আপিস থেকে ফেরার সময় বাড়ির কাছাকাছি আসতেই শুনতে পেয়েছিলাম। ঘরে এসে আমাদের রেডিওটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি নিজেই। জোরে চালিয়ে দেওয়া ওদের রেডিওগ্রামের গলায় গানটা শুনতে ভাল লেগেছিল। মনে একটা ক্ষীণ ইচ্ছেও জেগেছিল। কখনও যদি হাতে কিছু বাড়তি টাকা এসে যায় ঐ রকম একটা দামী রেডিওগ্রাম কিনব।

কিন্তু অরুণার কথাটা শুনে সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে গেল। সমস্ত মুগ্ধতা এক নিমেষে অন্তর্হিত হল। আজকাল অরুণার এই ধরনের কথাগুলো আমার একটুও ভাল লাগে না। 'খুব দামী রেডিওগ্রাম কিন্তু ওদের।' ঐ কথাটার ফাঁকে ফাঁকে অরুণা যেন বলতে চাইল, তুমি কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। ঐ রকম একটা রেডিওগ্রামও কিনতে পার না।

আমি কোন কথা বললাম না, মনের মধ্যে শুধু একটা চাপা অভিমান রাগ হয়ে যাবার সুযোগ খুঁজল।

আমার কেমন মনে হল অরুণা যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। কিংবা আমাকে একটা অপদার্থ ভাবছে। কারণ এ ধরনের কথা এর আগেও ও

বলেছে। এই তো মাসকয়েক আগে একটা বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে বলেছিল, রানীমাসীমার ছেলের বউকে দেখলে? ডিজাইনটা আমার মতই, কিন্তু ওরটায় মুক্তো অনেক বেশী।

আমি সেদিন হেসে ফেলেছিলাম, কারণ 'নেকলেস' কথাটাই ও উহ্য রেখেছিল। কিন্তু বিরক্তি একটা নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে ছিল, সেটাই আজ রেডিওগ্রামে ধাক্কা খেয়ে অভিমান হয়ে গেল।

অথচ প্রথমদিকে অরুণা ঠিক এমনটা ছিল না। নাকি আমি নিজেই তখন প্রেমে মশগুল হয়ে এ-সব কথায় কান দিতাম না?

বিয়ের আগের একটা দিনের কথা আমার তো বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে।

সেদিন আমি নিজেই নিজেকে চিৎকার করে বলতে চাইছিলাম, হিরন্ময়, তুই আজ রাজা।

প্ল্যানেটেরিয়ামের কাছে চলন্ত ডবল ডেকার বাস থেকে নেমেছিলাম আমি, ট্রাউজার্স পরা আমার দুখানা লম্বা লম্বা পা এমনভাবে নালা ডিঙিয়ে ঝোপ ঝোপ ঘাস মাড়িয়ে হাঁটু-সমান-উঁচু লোহার-শিক-বাঁকানো ফেন্সিং লাফ দিয়ে পার হয়েছিল, এমন হাসি হাসি মুখে অরুণার সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, যেন একটা হার্ডল্‌স্‌ রেসে ফার্স্ট হয়েছি।

—আরে আরে, কি ব্যাপার, তুমি যে একেবারে খুশীতে ডগমগ। কিছু খবর আছে মনে হচ্ছে? আমার মুখে কি ছিল কে জানে, অরুণার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

আসলে অরুণা আমাকে ঐ রকমটাই দেখতে চাইত। আমার গোমড়া মুখ ও একদম সহ্য করতে পারত না।

অরুণার প্রশ্নের জবাবে আমার সেদিন চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল, হিরণ্ময়, তুই আজ রাজা। তার বদলে সিগারেট ধরা বাঁ হাতেই একটা তুড়ি দিয়ে বলেছিলাম, বেজায় সুখবর, চাকরি পেয়েছি।

অনেকক্ষণ এ-ও-তা কথা বলার পর অরুণা বলেছিল, মাইনে কত বললে না তো?

—দুশো তিরিশ টাকা। (কিন্তু তার মধ্যে যে আশি টাকাই ডি এ সে-কথা আর বললাম না।) আমার মন তখন ফুরুর ফুরুর করে উড়ছে।

এ-সব হল সেই বিয়ের আগেকার কথা। যখন আমরা শুধু স্বপ্ন দেখছি। যখন চোখ চোখের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে, যখন কথা রঙিন রঙিন ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

'খুব দামী রেডিওগ্রাম কিন্তু ওদের।' কথাটা মনে পড়তেই মন বিষাদে ভরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমার মাইনের অঙ্কটা জেনে সেদিন অরুণা অনেকক্ষণ এ-ও-তা কথা বলার পর হঠাৎ বিমর্ষভাবে বলেছিল, আচ্ছা, ও আপিসে মাইনে এত কম কেন।

আজ বুঝতে পারছি অরুণা আমাকে একটুও বুঝতে পারে নি। মাইনে-টাইনের কথা আমি তখন ভেবেছি নাকি। বাবার কথা শুনে সান্যাল কাকার সঙ্গে একবারটি দেখা করলে তাঁর আপিসেই একটা ভাল চাকরি হয়ে যেত। বাবা নিজেও তো কত লোককে চাকরিতে ঢুকিয়েছিল।

আমি তাই হেসে উঠে বলেছিলাম, এ তো ব্যাকিং-এর চাকরি নয়। দেড়শো ক্যাণ্ডিডেট পরীক্ষা দিয়েছিল, মাত্র ন জনকে নিয়েছে, আমি একজন।

অর্থাৎ আমি বলতে চেয়েছিলাম, অরুণা, আমাকে তুমি কারও সঙ্গে তুলনা করো না। কারণ আমি নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ রচনা করতে চাই, আমি নিজের কাছে খাঁটি থাকতে চাই। অরুণা, নিজের কাছে খাঁটি থাকার যে অহঙ্কার, তার চেয়ে বেশী আনন্দ আর কিছুতেই নেই।

না, এসব কিছুই আমি ওকে বলি নি কারণ আমার সব সময়েই মনে হত, আশপাশের লোক আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে এই লোকটা খাঁটি, একে টাকা দিয়ে কেনা যায় না, লোভ দেখিয়ে নোয়ানো যায় না। অথচ অরুণা আমার কোন দাম দেবে না আমি কোনদিন ভাবিই নি।

বিয়ের পর আমরা যখন একতলায় দেড়খানা ঘরে সংসার পাতলাম তখন কিন্তু অরুণার মুখে চোখে আমি একটা উজ্জ্বল অহঙ্কার দেখতে পেতাম। আমার মনে হয়েছিল ও এতেই খুশী। আমি যে এত অভাব অনটনেও বাবার কাছে হাত পাতি নি, বাবা এ বিয়েতে মত দেয় নি বলে, তার জন্যে ও আমাকে বরং একটু বেশী বেশী দাম দিত। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, এখন তো আমার ধাপে ধাপে অনেক উন্নতি হয়েছে, সংসারে সচ্ছলতা এসেছে, ভাল ফ্ল্যাট, এখন ওর এত অভিযোগ কেন।

এই তো সেদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, বাবা নিজেই বলল, তুই আমাদের আপিসে না ঢুকে ভালই করেছিলি। আমাদের আপিসে কোন ফিউচার প্রসপেক্ট ছিল না। তাছাড়া, ধরাধরি করে চাকরি, চিরকাল মাথা নুইয়ে থাকতে হয়। বাইরে না হোক, মনের মধ্যে।

অরুণাও তো সঙ্গে গিয়েছিল, শুনে ও খুব খুশী হয়েছিল। ফেরার পথে বলেছিল, খুব যে বাবার সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে!

আমি হেসেছিলাম।

আসলে অরুণার কোন সাধ আমার অপূর্ণ রাখার ইচ্ছে হত না। ও সেই কথাটা কেন যে মাঝে মাঝে ভুলে যেত আমি বুঝতে পারতাম না। সব ভাল জিনিসগুলোর ওপর ওর খুব একটা লোভ আছে তাও তো মনে হত না। আমরা যখন নিজেদের মধ্যে আমাদের তিনটি ছেলেমেয়ে সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তখন তাদের খুব সাধারণ ভাবে মানুষ করার কথায় একমত হতাম।

অরুণা নিজেই বলত, তা না হলে ওরা ভবিষ্যতে হয়ত কষ্ট পাবে।

অথচ পুজোর বাজার করতে গিয়ে ও একটা বেহিসেবী কাজ করে বসল। মিনু আর মুন্নার জন্যে সত্তর আশি টাকা করে এক একটা ফ্রক অর্ডার দিয়ে এল।

আমি এমনিতেই হিমসিম খাচ্ছিলাম। পুজোর সময় এমনিতেই টানাটানি, সরকারী আপিস, আমাদের তো বোনাসের টাকা নয়।

বললাম, এ কি কাণ্ড করলে।

অরুণা মুখ কাচুমাচু করে দোষ স্বীকার করলে আমার এত রাগ হত না। কিন্তু অরুণার একটা অদ্ভুত স্বভাব, ও যখনই নিজের দোষ বুঝতে পাবে তখনই আমার ওপর রেগে যায়। তাই ঝাঁঝালো গলায় বলে বসল, এ পাড়ায় থাকার দরকারটা কি, বস্তিতে গিয়ে থাকলেই হয়। রুণু আর নীপা ঐ রকম সব দামী দামী ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াবে, আর মিনু মুন্না কি ভেসে এসেছে নাকি?

আমাব নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগল। এইসব সময়ে বুকের মধ্যে থেকে একটা চাপা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। আমি কি তা হলে এতদিন ধরে ভুল করে আসছি? আমার কি তা হলে আরও আরও টাকা রোজগারের দিকে মন দেওয়া উচিত ছিল?

আমি দুর্বল গলায় বললাম, কি করে পারব আমি? এখনও তো সবই কেনাকাটা বাকী।

অরুণা কোন যুক্তির ধার ধারল না। ও বলে বসল, ওরা কি করে পারে? রুণু আর নীপার বাবা?

ওরা কি করে পারে! অরুণা মুখ ফুটে বলুক আর নাই বলুক, এই একটা

কথাই আমি বারবার শুনে আসছি। আর ততই নিজের অক্ষমতায় আমার রাগ বেড়ে যাচ্ছে।

একদিন রেগে গিয়ে বলেছিলাম, আমার প্রত্যেকটি পাই পয়সা নিজের পরিশ্রমের দাম।

অরুণা গম্ভীরভাবে বলেছিল, ওদের নয় ব্যবসা, ব্ল্যাকের টাকা। রত্নাদের তো চাকরি।

অরুণাকে আর কি বলব, যখনই অসহায় লাগত নিজের মনকে বোঝাতাম, ঘুষ না পেলে লোকটা এত খরচখরচা করে কি করে, কারও বেলা ভাবতাম, কিছু একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে।

একদিন সিনেমা দেখে ফিরছি, সঙ্গে অরুণা রয়েছে, হঠাৎ কে পিছন থেকে ডাকল, হিরণ্ময়দা, এদিকে, এদিকে।

ফিরে দেখলাম, আমাদের জীবন, পুরনো পাড়ার জীবন। বলল, চলে আসুন, নামিয়ে দেব আপনাদের।

নামিয়ে দিয়ে গেল। আর ওরা চলে যেতেই অরুণা বলল, আমি ভাবতেই পারি নি সেই জীবন, সে আবার গাড়ি করেছে!

আমি নিজেও কম অবাক হই নি। এই তো সেদিনের একটা বাচ্চা ছেলে, সেও কিনা এর মধ্যে গাড়ি কিনল।

ওর গাড়িতে আমি উঠেছিলাম ঠিকই, কিন্তু প্রচণ্ড অস্বস্তিতে সহজভাবে বসতেও পারি নি। জিগ্যেস করি নি ও কি করে।

তাই অরুণার কথার আমি কোন জবাব দিই নি। মনে মনে জীবনের ওপরেই রেগে গিয়েছিলাম।

ঐ রাগটাই বোধ হয় মনের মধ্যে পোষা ছিল। তাই অরুণা হঠাৎ একদিন গল্প করতে করতে যখন বলল, 'জান ঐ গুপ্তবাবুদের মেজো ভাই, ও খুব বড় চাকরি করে, আপিস থেকে গাড়ি পেয়েছে,' আমার সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠল। আমি মনে মনে বললাম, অরুণা, আমাকে একজন সমকক্ষের সঙ্গে লড়তে দাও। আমাকে শুধু একজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে দাও। রত্নাদের রেডিওগ্রাম, রুণু নীপাদের বিলাসিতা, জীবনের গাড়ি, রাণীমাসীমার ছেলের বউয়ের নেকলেস···তুমি সমস্ত কিছু পাল্লার একদিকে চাপিয়ে অন্যদিকে আমাকে ওজন করতে চেও না। আমি বড়জোর ওদের যে-কোন একজনের মত হবার চেষ্টা করতে পারি।

আমি জানি ওদের একজনের মতও আমি হতে পারব না। জানি বলেই অরুণার কথায় নিজেকে এত অসহায় বোধ করি। একটা অক্ষম রাগে জলে উঠতে ইচ্ছে করে। রাগটা আসলে নিজেরই ওপর। এক এক সময় তাই সন্দেহ হয়, আমি হয়ত একটা মিথ্যে অহঙ্কারের ওপর ভিত গেঁথেছি। চারপাশের সকলকে যে-কোন দামে সব কিছু পেতে দেখছে ও, তাই অরুণা হয়ত ভাবছে, আমি একটা অপদার্থ। একটা মিথ্যে অহঙ্কারের জন্তে আমি কিছুই পেতে শিখি নি।

আমার এক একদিন তাই মনে হত আমি হঠাৎ ঢুম্ করে এমন কিছু একটা করে ফেলব, অরুণাও চমকে যাবে। আমি জানতাম, ওকে চমকে দেবার মত সুযোগ আমার হাতে আছে। তখন ওর অনেক সাধ আমি মিটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু তখন আর আমি নিজের কাজে খাঁটি থাকতে পারব না। আমি জানি, অরুণার কাছেও আমার তখন আর কোন দাম থাকবে না।

মনের অবস্থা যখন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের দোরগোড়ায়, তখনই ব্যাপারটা ঘটে গেল। এমন তুচ্ছ কারণে, এমন আকস্মিকভাবে ঘটে যাবে, আমি ভাবতেও পারি নি।

আপিসে টি এ বিল-এর কিছু টাকা অনেক দিন থেকে আটকে ছিল। সেদিন হঠাৎ পেয়ে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অরুণার কথা মনে পড়ল। আমার আট বছরের ছেলে বিজুর কথা, মিন্টু মুন্নার কথা মনে পড়ে গেল। আমার হঠাৎ মনে হল, আহা, অরুণার সত্যি কোন দোষ নেই। আমি ঘুরে ঘুরে নিউ মার্কেট থেকে ওর জন্তে ভাল একটা শাড়ি কিনলাম। বিজু মিন্টু মুন্না ওরা খুব চীনে খাবার খেতে ভালবাসে। একটা চীনে রেস্টোরেণ্ট থেকে দু তিন রকমের খাবার কিনলাম।

মনটা খুব খুশী খুশী ছিল। একটা ট্যাক্সি করে একেবারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে এলাম। এর আগে একদিন শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল হঠাৎ, সেদিনও ট্যাক্সি করে ফিরেছিলাম, কিন্তু ট্রাম রাস্তা অবধি এসেই নেমে পড়েছিলাম। কুড়িটা কি তিরিশটা পয়সা কম লেগেছিল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ওদের সকলকে কেমন অবাক করে দেব সে-কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ঢুকলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে অরুণা বলল, এই জান, আজ খোকনের মা এসেছিল।

—কে খোকনের মা? আমি বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলাম।

বিজু মিন্টু মুন্না কলরব করে এল। শাড়িটা আর খাবারের প্যাকেটগুলো কেড়ে নিয়ে খুলে দেখতে গেল। অরুণা কিন্তু ওগুলো সম্পর্কে কোন আগ্রহই দেখাল না। শুধু বলল, বাঃ, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? সেই যে, খোকনের মা।

মনে পড়তেই বললাম, ও।

আমার শার্টটা খুলে দিতেই অরুণা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আলনায় রাখতে রাখতে বলল, কত সব গল্প করল। কতকাল পরে এল, সেই রাণীমাসীর বাড়ীতে দেখা হয়েছিল।

—ও। এছাড়া আর কিই বা বলব।

অরুণা প্রায় অনুযোগের স্বরেই বলল, আমরা বাড়িটাডি করছি কিনা জিগ্যেস করছিল। বললে, একটা বাড়ি করে ফ্যাল অরুণা, ভাড়াটে বাড়িতে আর কদ্দিন থাকবি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেল। কারণ অরুণার কথায় খোকনদের বাড়িটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

আমি রুক্ষ গলায় চিৎকার করে উঠলাম। —চুপ কর, দোহাই তোমার, চুপ কর। তুমি থামাবে কিনা এই সব কথা। আমি জানি, তুমি আমাকে দিনে দিনে ঘৃণা করতে শুরু করেছ। তোমার কথা শুনে শুনে আমি আজকাল নিজেকেই নিজে ঘৃণা করছি।

আমার প্রচণ্ড রাগটা শেষের দিকে নিজের কানেই কান্নার মত শোনাল। তবু আমার রাগ আমি চেপে রাখতে পারলাম না। চিৎকার করে বলে উঠলাম, ওদের সঙ্গে আমার তুলনা কর না। বাপের ব্যবসা, বাপ বাড়ি করে দিয়ে গেছে। আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি।

অরুণা অবাক হয়ে গিয়েছিল। ও কখনও আমাকে এতখানি রাগতে দেখে নি। আমার রুক্ষ গলার চিৎকার শুনে ও বোধ হয় বিরক্ত হল। আমাকে আরও রাগিয়ে দেবার জন্যেই হয়তো বলে বসল নিজের পায়ে দাঁড়িয়েও অনেকে বাড়ি করে। সুশান্তদা···

আমার আর কাণ্ডজ্ঞান রইল না। সেই পুরনো কথার ভীমরুলটা আমার কানের চারপাশে ঘুরে বেড়াল। তুমি অপদার্থ, তুমি অক্ষম।

আমি ভগ্নস্তূপের মত চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম। কিন্তু রাগটা তখনও যেন ফুলে ফুলে উঠছে। আমি চিৎকার করে বললাম, সমস্ত জীবন ধরে তুমি

আমাকে শুধু অন্যের সঙ্গে তুলনা করে এসেছ। পদে পদে বলেছ, আমার কি নেই আমার কি নেই, আমি কি দিতে পারি নি।

একটু থেমেই আমি আবার ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলাম, কিন্তু তোমারই বা কি আছে? নিজেকে ওদের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছ কোনদিন?

কথাটা বলে ফেলেই আমি অনুশোচনায় মুষড়ে পড়লাম। এ-কথাটা আমি কোনদিন ওকে বলতে চাই নি। ওর এই দুর্বল জায়গাটায় আমি কোনদিন আঘাত দিতে চাই নি। কারণ, আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যাই বলুক, আমার ভালবাসার চোখ কোনদিন ওর কালো রূপকে অসুন্দর দেখে নি।

আমি তাই কথাটা বলে ফেলে ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

কিন্তু হঠাৎ ওর হাসির শব্দ শুনে আমাকে তাকাতেই হল। কি আশ্চর্য, আমি ভেবেছিলাম, ও রেগে যাবে। আমি ভেবেছিলাম সব ভেঙে যাবে।

তার বদলে ও হাসি হাসি চোখে তাকাল, এগিয়ে এল আমার দিকে। আমি চোখ নামালাম।

অরুণা কাছে এসে আমার চুলে আঙুল ডুবিয়ে শান্ত গলায় বলল, আমার? আমার কি আছে জিগ্যেস করছ? আমার যা আছে তা আর কারও নেই।

ওর আঙুলের স্পর্শে, ওর গলার স্বরে কি ছিল কে জানে, আমার নিজেকে আবার অসহায় লাগল। আমি ওর হাতটা মুঠোর মধ্যে ধরে হাসবার চেষ্টা করে বললাম, কি আছে শুনিই না। ঠাট্টার গলায় বললাম, রূপ, গুণ, না ঐশ্বর্য?

অরুণা মিষ্টি করে হাসল। বলল, আমার যা আছে, তা কারও নেই।

আমি চোখ তুলে তাকালাম।—কি আছে বলেই ফ্যাল না।

অরুণা দু হাত ছড়িয়ে হাসিহাসি মুখে বলল, এই এত্তো বড় একটা গর্ব। ···তোমার জন্যে।

আলমারিটা

'চাই না, চাই না, আমি তোমাদের কাছে হীরো হতে চাই না।' আমি মনের মধ্যে সমস্ত বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করেও পারলাম না।

মনে মনে বললাম, ঐ গোঁয়ার বখাটে ছোকরা, ও কিনা তোমাদের কাছে…

রাস্তা পার হওয়ার আগে সকলেই যেমন একবারটি থমকে দাঁড়ায়, চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে, তেমনিভাবে থেমে পড়ে কাব ভাবতে ভাল লাগে, ভুল পথে এসেছি! ভুল পথ? জানি না, জানি না। আজকাল এক এক সময় মনে হয় কাঁটা, জঞ্জাল, বোলতা, বিছুটি যেন আমার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই যেন কুটকুট করে ওঠে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা করে ফেলতে ইচ্ছে করে। আবার এক এক সময় মনে হয় ছুঁই ছুঁই বাতিকওয়ালা বুড়ির মত পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বুঝি শান্তি।

—মিস্টার জামাইবাবু আপনার মত লোক একালে অচল, বুঝলেন? ভদ্রতা টদ্রতা এখন শিকেয় তুলে রাখুন।

আমাদের ছোট্ট ফ্ল্যাটের ছোট্ট বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ছুটির দিনের বিকেলের চায়ে সবে চুমুক দিতে যাব, রাস্তা থেকে সজোরে ব্রেক-কষা একটা গাড়ি ক্যাঁ—ও—চ্ করে শব্দ করল। তারপরই চিৎকার হৈ-হট্টগোল।

আমরা ছুটে গেলাম। আমি, অমিতা, ঋণা।

মণ্টু নয় তো?

না, পাড়ার অন্য একটি ছেলে। রাস্তা পার হতে গিয়ে এখনই চাপা পড়ত। এখন বোকার মত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থরথর করে কাঁপছে।

কিন্তু তার দিকে তাকানোর তখন আর সময় নেই। সমর—পাড়ার সেই গোঁয়ার বখাটে ছোকরা গাড়ির ড্রাইভারকে টেনে নামিয়েছে।

পাশের বাড়ি থেকে কে যেন জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে সমর?

—বাচ্চাটাকে চাপা দিচ্ছিল মোসাই, এখন আবার রোয়াব দেখাচ্ছে, বলে কিনা চাপা দিলে বলতেন।

ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলছিল বটে, কিন্তু ড্রাইভারের জামার কলারটা তখনও ছাড়ে নি। কথা শেষ করেই তাকে এক চড় মারল বখাটে ছেলেটা।

আমি ঋণা আর অমিতাকে বললাম, চলে এস, চলে এস।

স্বগতভাবে যেন নিজেই নিজেকে বললাম, ও কি ইচ্ছে করে চাপা দিচ্ছিল?

—আহা তা বলে দেখে চালাবে না? অমিতা বলল, মেরেছে ঠিক করেছে, এত জোরে গাড়ি চালায় কেন? ঐটুকুন একটা বাচ্চা, যদি চাপা পড়ত ভাবুন তো?

—সত্যি, ভাবতেও গা শিউরে উঠছে। ঋণার চোখে মুখেও আতঙ্ক ফুটে উঠল। বারান্দা থেকেই ডাকল, এই মণ্টু, তুই চলে আয়।

আমরা আবার ফিরে এসে বসলাম বেতের চেয়ারে, বারান্দায়। কিন্তু ততক্ষণে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মন বিস্বাদ। ড্রাইভারটার দোষ হয়তো আছে, কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ ঐ সমরকে জজসাহেব হবার—তা কেন, একাধারে দারোগা-জজ-জেলার হবার অধিকার কে দিল!

অমিতা হেসে উঠল।—ও বাব্বা, কথায় কথায় লজিকের বই খুলে বসতে হবে নাকি?

আমার মনের মধ্যে তখনও উত্তেজনার ঘোর কাটে নি, অথচ ঋণা আব অমিতা এর মধ্যেই কত সহজ হয়ে গেছে। দিব্যি রসিকতা করছে।

ঋণার মাসতুতো বোন অমিতা, সম্পর্কটা মধুর। ও আরও মধু মিশিয়ে হাসল। তবু আমার মনের গ্লানি দূর হল না।

বললাম, অমু, তুমি না কলেজে পড়া মেয়ে? তোমার এসব মারামারি ঝগড়াঝাঁটি ভাল লাগে?

অমিতা আবার হাসল।—ভাল লাগা টাগা জানি না, তবে আপনার মত ইস্ত্রী করা কথা বলে, ডাইংক্লিনিং ফেরৎ ব্যবহার, এমন লোকের হতে যেন না পড়ি। তা হলে সারা জীবন কপালে ভোগান্তি লেখা থাকবে, না রে সেজদি?

ঋণা হেসে উঠে বলল, যা বলেছিস।

বারান্দার একপাশে রাখা আলমারিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে। ভদ্রলোক হওয়ার ভোগান্তি। ওঁর তো সব বিষয়ে এটা করতে লজ্জা, ওটা করতে লজ্জা।

আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আমারও অবশ্য মনের ভিতরটা কেমন খিচখিচ করে উঠল।

আগে ঘরের মধ্যেই ছিল, এখন বারান্দায়। এই তো ছোট্ট এক ফালি বারান্দা, তার আধখানা জুড়ে আছে আলমারিটা। তাও সব সময় কেমন একটা সঙ্কোচ হয়, সব সময় ভয় ভয়। কবে ছোটমামা এসে পড়ে। আর আত্মীয় স্বজনদের তো বিশ্বাস নেই, খুঁৎ ধরতে পারলে কেউ ছাড়ে না।

এর মধ্যেই তো বড় পিসীমা একদিন এসেছিল, বলে গেল, তোর আপন মামা, রেখে গেল এমন বনেদী জিনিসটা, তোদের ছু ছুখানা ঘর থাকতে এটা কিন্তু অন্যায় করেছিস অরুণ।

কথা তো নয় বড় পিসীমার, যেন শিরদাঁড়ায় ওপর বিছুটি ঘষে দেন।

অথচ আলমারিটা নিয়ে কি কম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

ছোটমামা রিটায়ার করে যখন কোলকাতার বাসা তুলে দিলেন, তখন দিব্যি হাসি হাসি মুখ করে বলে গেলেন, আলমারিটা তোর এখানে দিনকয়েক রেখে দে, ভেতরে দামী জিনিষপত্র দলিলটলিল আছে, পরে নিয়ে যাব।

ব্যস, তারপব আব নিয়ে যাওয়ার নাম করেন নি।

ছোটমামার জিনিস, তাই যত্ন করে ঘরের মধ্যেই রেখেছিলাম তখন। কিন্তু ওটার যেমন দৈত্যের মত প্রকাণ্ড চেহারা, তেমনি শ্রীছাঁদও নেই এতটুকু। সেকেলে ধরনের নক্সা করা, নক্সার ফাঁকে ফাঁকে ময়লা জমে আছে। আঙুল ঢোকে না সেখানে, পরিষ্কারও করা যায় না। কেনার পর হয়তো পালিশও হয় নি কোনদিন। ঘরের আর সব আসবাবের সঙ্গে একটুও মানাত না। একে ঘর দুখানাই বেশ ছোট ছোট, তার ওপর কুপার উটকে জায়গা দিয়ে ঘরখানা এখন আমার প্রতিই কৃপণ। ওটার দিকে তাকালেই ছোটমামার ওপর রাগ হত। অসুবিধের কথা মুখ ফুটে বলতে পারি নি বলেই কি এই বেখাপ্পা, বেঢপ, বেমানান জিনিসটা ঘর জুড়ে থাকবে!

অমিতা হেসে উঠে বলল, না রে সেজদি, বনেদী জিনিস তো, জামাইবাবু হয়তো আশায় আশায় আছেন, কৃষ্ণকান্তের উইল আবার যখন ছবি হবে তখন কোন সিনেমা ডিরেক্টারকে মোটা টাকায় ভাড়া দেবেন।

বলে ও নিজের রসিকতায় নিজেই কুলকুল করে হেসে উঠল।

ঋণাও হেসে ফেলল। তারপর বিরক্তির স্বরে বলল, তাও যদি চাবিবন্ধ করে না যেতেন, দু চারটে জিনিস রাখতে পেলেও কাজ হত।

আমারও অবশ্য সে-কথা মাঝে মাঝে মনে হত। আবার ভাবতাম, ছি ছি, একটা জিনিস নয় রেখেই গেছেন, সেটার ওপর আবার লোভ জাগছে কেন। ব্যবহার করতে পেলেই তো তখন আত্মসাৎ করতে চাইব।

ঋণা চটে গিয়ে প্রায়ই বলত, দরকার নেই বাপু ব্যবহার করে, যা দৈত্যের মত চেহারা। তুমি বরং কড়া করে একটা চিঠি লিখে দাও।

--লিখব, লিখব। আমি হেসে ওর রাগ কমাবার চেষ্টা করতাম, অথচ নিজে মনে মনে চটে উঠতাম আলমারিটার ওপর, ছোটমামার ওপর। মনে হত ঐ আলমারিটাই যেন সমস্ত শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে।

ছোটমামাকে কড়া করে চিঠি লিখব? এক এক সময় আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যেতাম, স্পষ্ট কথা বলতে আমার সঙ্কোচ হয় কেন? আমি কি সত্যিই সজ্জন ভদ্রলোক? না কি সকলের মুখে ও কথাটা শুনে শুনে আমি সব সময়ে তটস্থ থাকি পাছে লোকে আমাকে অভদ্র বলে।

—আপনি অরুণদা রেগে গিয়ে কাউকে একদিন যদি 'শালা' বলতে পারেন, আপনাকে একটা কাটলেট খাওয়াব। আপিসের জয়ন্ত একদিন বলেছিল।

শুনে আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল, জয়ন্ত—যে সব্বাইকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয়, সেও আমাকে সমীহ করে।

আমি অবশ্য হেসে বলেছিলাম, আমি ভাই গ্যাসট্রিকের পেশেণ্ট, ইহজীবনে তোমার কাটলেট ছুঁতে পারব না।

—বাঃ রে, তারা তো শুনেছি খুব খিটখিটে হয়, হঠাৎ রেগে যায়। আপনার ভদ্রতার কাছে দেখছি গ্যাসট্রিকও হার মেনেছে।

বলে প্রচুর হেসেছিল জয়ন্ত।

আমি মনে মনে বলেছিলাম, ভেতরটা তো দেখতে পাও না, বিষফোঁড়া হয়ে আছে, জ্বলছে, বাইরেই শুধু সৌজন্যবোধের মলম লাগান থাকে। তাছাড়া ভাবি মেজাজ রুক্ষ করেই কি শান্তি পেতাম? তাতে অশান্তি আরও বাড়ত।

তবে মাঝে মাঝে মনে হয় ভদ্রতার এই আদ্দির পাঞ্জাবীটা দু হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিই।

—কি গো, এমন গোমড়া মুখ কেন? সেদিন বাজার থেকে ফিরতেই থলিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ঋণা প্রশ্ন করল।

তখনই তখনই কিছু বলতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে বললাম, তোমার জন্যেই।

—আমার জন্যে? ঋণা চোখে প্রশ্ন তুলল।—আমি কি করলাম?

খুকীর মা যতদিন ছিল কোন ঝামেলা ছিল না। তারপর থেকেই ঋণার অভিযোগ।—মাছ কত আন বল তো! খুকির মা মাছ আনত, দিব্যি একবেলা কুলিয়ে যেত।

—সমস্ত লোক এত অভদ্র হয়ে উঠেছে। লাঞ্ছনার ছাপটা মুছে ফেলার চেষ্টা করে বললাম, লোকটা কি বলল জান? বলল মাছ তো নেন দেড়শো, তার আবার দুবার করে ওজন করতে হবে।

পেট্রোলের গায়ে যেন জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলে দিয়েছি।

দপ করে এক ঝলক আগুন হয়ে গেল ঋণার মুখ।—তবু, তবু তুমি মাছ নিলে? মাছের টুকরোটা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে পারলে না?

বিষণ্ণতার মধ্যেও হাসবার চেষ্টা করলাম। —কি দরকার ঝগড়াঝাটি করে, কাল থেকে অন্য দোকানে নেব।

অন্য দোকানে, অন্য জায়গায়, অন্য লোকের কাছে। এক এক সময় সন্দেহ হয়, আমি ভদ্রতার ছদ্মবেশে কাপুরুষতা ঢেকে রাখছি না তো?

অমিতা কলেজে-পড়া শিক্ষিত আধুনিক মেয়ে, সেও মাঝে মাঝে বেড়াতে এসে আমার ভদ্রতাবোধকে শুধু ঠাট্টাই করে যায়। ঋণা কথায় কথায় বিরক্ত বিস্ময়ে বলে, তুমি কি!

আর মণ্টু, আমার বারো বছরের ছেলে মণ্টু—

—মা, আজ নীরুকে বেশ শুনিয়ে দিয়েছি!

—কি শুনিয়েছিস! ঋণার হাসিতে আমি দিব্যি একটা প্রশ্রয় দেখতে পেলাম।

মণ্টু বললে, বাস থেকে নামব, তখনও টিকিট কাটা হয় নি···আচ্ছা, বাবা, কণ্ডাক্টরকে ডেকে ভাড়া দেওয়াই তো উচিত?

—নিশ্চয়। আমি সায় দিলাম। আমি খুশী হয়ে উঠলাম। ভদ্রতার সঙ্গে সততার কোথাও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই আছে।

তা না হলে সৌজন্যবোধ শুধুই একটা হিপোক্রিসি হয়ে দাঁড়ায়। মণ্টু সৎ, মণ্টু আমার বারো বছরের ছেলে। আমি গর্ব বোধ করলাম।

—ভিড়ের মধ্যে কণ্ডাক্টর শুনতে পাচ্ছিল না, তাই চিৎকার করে বললাম, নেমে যাব, ভাড়া নিয়ে যান। মণ্টুর গলার স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠল। —নীরু ছিল সঙ্গে, ও কি বলল জান? বলল, দশ পয়সা ভাড়া তো, তাই খুব সাধু সাজছিস, দশ টাকা ভাড়া হলে কত ডেকে ডেকে টিকিট কাটতিস দেখতাম।

আমি চমকে উঠলাম। যেন অসতর্ক ভাবে প্লাগপয়েণ্টে হাত দিয়েছি। কি আশ্চর্য, বারো তেরো বছরের একটা ছেলেও আজকাল এমন কথা বলে? এমন কথা ভাবে?

মণ্টু হাসল। বলল, মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি।

—কি বলেছিস? ঋণা হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করল।

—বললাম, চোর যদি হতেই হয় বড় চোর হব, তোর মত ছিঁচকে চোর হব না।

আমি বোধ হয় কিছু একটা বলতে চাইলাম, এ-কথা না বললেই পারতে, কিংবা একথা বলা অন্যায়, এমনি কিছু। কিন্তু ঋণার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখ হাসছে, ও যেন মণ্টুকে তারিফ করছে।

আমি গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। প্রতিবাদ করলাম না।

কিন্তু সারাজীবন ধরে আমি কি শুধুই গুটিয়ে আসব, সরে আসব, পালিয়ে আসব?

ডাইংক্লিনিং থেকে কাপড়গুলো নিয়ে আসার পর বিছানার ওপরই পড়েছিল। কয়েকবারই ঋণাকে বলেছি তুলে রাখার জন্যে। বাইরে পড়ে পড়ে নোংরা হবে। ইস্ত্রী নষ্ট হবে সে খেয়াল নেই, ঋণা একটার পর একটা কাজ করছে। বললাম, তুলে রাখ, ধুলো পড়ছে যে।

—যা নোংরা নোংরা বাতিক ভদ্দরলোকটির, বাইরে বেরুলেই গায়ে ময়লা লাগে, ওঁকেও আলমারিতে চাবি দিয়ে রাখলে পারিস! অমিতা হেসে উঠল। ঋণা রসিকতায় যোগ দিল না। বিরক্তমুখে কাপড়গুলো নিয়ে পাশের ঘরের ওয়ার্ডরোবে রাখতে যেতে যেতে নিজের মনেই বলল, ও ব্রহ্ম-দৈত্যটাও বিদেয় হবে না, একটা আলমারিও কেনা হবে না। জায়গা আছে আর যে রাখব?

একটু একটু করে সংসার বাড়ছে, এ-ঘরের জন্যে একটা আলমারির প্রয়োজনও হচ্ছে। একদিন গিয়ে ছোট একটা ষ্টীলের আলমারি পছন্দ করেও এসেছিলাম।

তবু ফিরে এসে বললাম, কিনলেই তো হল না, রাখবে কোথায়?

ঋণা গম্ভীর মুখ করল।—তোমার শুধু ভদ্রতাটুকু থাকলেই হল, আর তো কিছু রাখার দরকার নেই।

ছোটমামার ঐ প্রকাণ্ড আলমারিটাই হয়েছে চক্ষুশূল।

শুধু জায়গা জুড়ে থাকবে, অথচ কাজে লাগান যাবে না। তাছাড়া, তাছাড়া আশপাশের অন্য জিনিসগুলো—সেগুলো যে সবই আধুনিক ধরনের, একালের। তার মধ্যে

—বাঃ বাঃ, একেবারে মিউজিয়াম করে রেখেছেন অরুণদা। জয়ন্ত একদিন বেড়াতে এসে হেসে উঠেছিল ওটার দিকে তাকিয়ে।—কতয় কিনলেন?

হেসে ফেলে বলেছিল, নকশার বাহার আছে কিন্তু। চারদিকে চারটে সাপ প্যাঁচ মেরে মেরে ফণা তুলেছে, কি ইমাজিনেশেন। আর তিনটে ফণা থাকলেই সপ্তশির, দিব্যি শ্রীবিষ্ণু হয়ে শুয়ে পড়তে পারতেন ওর ওপর।

ভীষণ অপ্রস্তুত লেগেছিল সেদিন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওটাকে যেমন করে হোক তাড়াবই।

কিন্তু চিঠি লিখলেই তো ছোটমামার কাছ থেকে দুটো কড়া কথা শুনতে হবে। যা ঠোটকাটা লোক।

—কি রে সেজদি, আমার জেন্টলম্যান জামাইবাবুর খবর কি? কলেজ ফেরার পথে অমিতা এসে হাজির হল।

পরিহাসের স্বরে বললাম, খবর আর কি, সমরের মত গোঁয়ার-গোবিন্দ একটি পাত্র খুঁজছি।

—ওঃ লাভলি। চোখ মুখের এমন ভাব করল অমিতা, যেন এইমাত্র আচারে জিভ ঠেকিয়েছে। জিভে ঝোল টেনে হেসে বলল, মেকদণ্ডওলা ছেলে আমার অ্যাত্তো ভাল লাগে···আপনার মত মিনমিনে ভদ্রলোক স্যার কোন মেয়েই পছন্দ করবে না। নেহাৎ সেজদির হাতে পড়েছেন তাই· ·

ঋণা হেসে উঠে বলল, না রে, বুড়ো হচ্ছে কিনা, তাই আজকাল একটু খিটখিটে হচ্ছে। সেদিন যা কাণ্ড করেছে!

—কাণ্ড করেছে!

আপিসের জয়ন্ত, সেও সব শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিল। অথচ আমি ভেবেছিলাম, ও অন্তত বাহবা দেবে। তা হলে হয়তো জালা জুড়োত।

সেদিনের কথা ভাবলে এখনও সমস্ত শরীর রাগে থরথর করে কেঁপে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে উঠি।

দশটা পয়সা কণ্ডাক্টরকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, না, না- ভুল করেছেন, আমি এই স্টপেই উঠেছি।

বাস কণ্ডাক্টর, ভাবলেও এখন দাঁতে দাঁত চেপে রাগ সামলাতে হয় আমাকে, আমাকে বিশ্বাস করল না। যেন আমার কথার কোন দাম নেই। যেন আমি ভদ্রলোক নই। যেন সামান্য পাঁচটা পয়সা আমি ফাঁকি দিতে চাইছি।

—আপনি তো শিয়ালদা থেকে আসছেন দাদু, আমি উঠতে দেখেছি আপনাকে।

আমি লাঞ্ছিত বোধ করলাম। তবু ক্রোধ চেপে ধীরে ধীরে বললাম, না, ভুল করছেন। আমি এখানেই উঠেছি।

লোকটি এবার রূঢ়স্বরে বলল, আরও পাঁচ পয়সা দিন, আমি দেখেছি আপনি অনেক আগে থেকে উঠেছেন।

বাসসুদ্ধ লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে, বেশ বুঝতে পারছি। তারা কৌতুক বোধ করছে। তাদের কৌতুকের চোখ, উপহাসের চোখ, ঘৃণার চোখ, আমার সমস্ত শরীরকে বিদ্ধ করছে

আমি এবার দৃঢ়স্বরে বললাম, আমি এখানেই উঠেছি।

আর সেই মুহূর্তে যাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন বলল, কেন তর্ক করছেন, আমিও দেখেছি আপনি শিয়ালদা থেকে আসছেন। যাত্রীটি যেন ধমক দিল আমাকে।

মুহূর্তের জন্যে আমার সমস্ত শরীর একরাশ ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ হয়ে গেল। আমি পকেটে হাত ডালাম। দু খানা এক টাকার নোট বেরিয়ে এল। আমি সে দুটো তুলে ধরলাম সেই কণ্ডাক্টারের সামনে।

আমি তখন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছি। আমি বললাম, এই দু টাকার মধ্যে অনেক—অনেকগুলো পাঁচ পয়সা আছে।

আমার চোখে কি ছিল জানি না, কণ্ডাক্টর ভয় পেল। বলে উঠল, কি মশাই, মারবেন নাকি?

আমি কোন উত্তর দিলাম না। শুধু সেই এক টাকার নোট দু খানা তার চোখের সামনে ছিঁড়লাম, টুকরো করলাম, আবার ছিঁড়লাম, টুকরো করলাম, তারপর হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে নেমে পড়লাম।

নেমে পড়েই আমি একটা অদ্ভুত আনন্দ পেলাম, একটা গর্বের অহঙ্কারের বিশুদ্ধ আনন্দ। বুকের মধ্যে যে জায়গাটায় সে এক ঝলক কালি ছিটিয়ে দিয়েছিল সেই জায়গাটা যেন ছুরি দিয়ে কেটে ছুঁড়ে ফেলেদিলাম। ঠিক যেমনভাবে ঋণা একদিন আমাকে না জানিয়ে বিতিকিচ্ছিরি চক্ষুশূল আলমারিটাকে বারান্দায় বের করে দিয়েছিল।

—তোমার ওসব গরমের পোশাকটোশাক কোথায় রাখবে রেখ। আর নয়তো রাস্তায় ফেলে দিও। ঋণা ঠকাস করে চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে বলল।

বুঝলাম রাগটা ছোটমামার ঐ আলমারিটার ওপর। যেটা জায়গা জুড়ে আছে, অথচ কাজে লাগে না। যেটার জন্যে ছোট একখানা স্টীলের আলমারি কেনা যাচ্ছে না।

ওটাকে আজকাল বড নোংরা লাগে। একরাশ জঞ্জালের মত।

—কি ছিরি আলমারির। যাই বলুন জামাইবাবু, আপনার ছোটমামার কি করে যে ও জিনিস পছন্দ হয়েছিল!

বলে হেসে উঠল অমিতা।

আমি বললাম, তখনকার দিনে তো ঐ রকমই ফ্যাশন ছিল। তাছাড়া ওরকম মেহগনি কাঠই কি আজকাল পাওয়া যায় নাকি!

অমিতা নাক সিটকে বলল, যখন ছিল তখন ছিল, এখন বেমানান, চেলিয়ে কাঠ করে উনুন ধরিয়ে দে রে সেজদি। সব সমস্যা মিটে যাবে।

আমি আহত বোধ করলাম। হাজার হোক আমারই ছোটমামা। তাঁর রুচিকে ঠাট্টা করলে গায়ে লাগবারই কথা।

অমিতা বিনুনীতে আঙুল খেলাতে খেলাতে বলল, আহা রাগ করতে হবে না, এমন কিছু বলি নি। তারপর হেসে উঠে বলল, যখনকার যা। সত্যি বলুন, আজকাল ওটাকে বেমানান লাগে না?

যখনকার যা। অমিতা চলে যাওয়ার পর কথাটা আমাকে বারবার ভাবাল। তাই তো! চারপাশের আসবাবগুলো এখন অন্য ধরনের, ফ্ল্যাটের ছাদ নিচু হয়ে গেছে, তার সঙ্গে ওটা মানাচ্ছে না।

·· ভদ্রতা আজকাল আর কোথাও নেই জয়ন্ত, ঠিকই বলেছ। জয়ন্ত সব শুনে হো হো করে সশব্দে হেসে উঠল।

—সে কি অরুণদা, এই সামান্য কারণে বাসের মধ্যে আপনি একটা সীন ক্রিয়েট করলেন ?

—সীন ক্রিয়েট করলাম ? আমি কেমন বোকার মত তাকালাম জয়ন্তর মুখের দিকে। বাস কণ্ডাক্টরের গালে, সেই যাত্রীর ভদ্রলোকের গালে কি এর চেয়ে জোরে থাপ্পড় বসান যেত ?

জয়ন্ত হেসে উঠে বললে, ব্লাড প্রেসারটা দেখান অরুণদা। কি লাভ হল ? লোকগুলো হেসেছে শুধু, ভেবেছে বদ্ধ উন্মাদ।

জয়ন্ত আমার সব গর্ব, সমস্ত অহঙ্কার কেড়ে নিল। আমি মুষড়ে পড়লাম।

তা হলে কি অভদ্রতাকে অভদ্রতা দিয়েই লড়তে হবে ?

—আপনি অরুণদা, যদি রেগে গিয়ে কাউকে 'শালা' বলতে পারেন, একটা কাটলেট খাওয়াব। জয়ন্তর সেই কথাটা মনে পড়ল।

—ওব সব অজুহাত রে অমু, ওর সব অজুহাত। ঐ তো আলমারিটা এখন বারান্দায় সরিয়ে দিয়েছি, এখন তো একটা ছোট স্টীলের আলমারি নিয়ে আসতে পারে। ঋণা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল।

ভদ্রতা জিনিসটাকে আমিও এখন বারান্দায় সরিয়ে দিয়েছি। কোনদিন হয়তো সেখান থেকে রাস্তায় বের করে দেব।

বললাম, না, না, শুধু ভাবছি, ছোটমামা যদি রাগারাগি করেন ··শেষে ওটাকে আবার যদি ঘরের ভেতরে নিয়ে আসতে হয়······

অমিতা সশব্দে হেসে উঠল।– নাইস! এ না হলে আমার জামাইবাবু। আলমারিটা নয় স্যার, আপনাকেই মিউজিয়মে রেখে দেওয়া উচিত। অমিতা আমাকে চটাবার জন্যে দুষ্টু হাসি হাসল।

আমি একটু উষ্মার স্বরে বললাম, তোমরা বুঝবে না, তোমরা বুঝবে না।

ঋণা বলল, কেন তর্ক করছিস অমু। আসলে ওর রুচিও ঐ বিতিকিচ্ছিরি আলমারিটার মতই।

আমি চুপ করে গেলাম। আমি চিঠি লিখলাম ছোটমামাকে সেদিনই। লিখলাম, যত তাড়াতাড়ি পারেন ওটা নিয়ে যাবেন।

আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা তুলে এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা ছোট

প্যাটার্নের, এই ঘরে, এইসব সুন্দর আসবাবের সঙ্গে মানায়, এমন একটা স্টীলের আলমারি কিনে আনলাম।

চমৎকার, চমৎকার।

ঋণা খুব খুশী হয়েছে, ওর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

অনেক ভেবেচিন্তে, ঘরের মধ্যে নতুন আলমারিটা বসানোর পর সমস্ত ঘরখানার দিকে তাকিয়ে এত ভাল লাগল। ঋণা যেদিন আমাকে না জানিয়ে ওটা বারান্দায় বের ক'রে দিয়েছিল, সেদিন যেমন ভাল লেগেছিল, ঠিক তেমনি।

অমিতা দেখে বলল, বাঃ রে, রঙটা বেশ স্যুদিং তো। কি যে বলিস সেজদি, বেশ রুচি আছে স্যার আপনার, আমার বিয়ের সময় আপনাকে বাজার সরকার করে দেব।

কোন নক্সা নেই, আতিশয্য নেই। একেবারে সিম্পল্ চাঁচাছোলা। ঘরের খাট, চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং টেবিলের মতই।

এখন ছোটমামার আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আরও যেন খারাপ লাগে। আরও অসহ্য।

তাই দিনকয়েক যেতে না যেতে আরও কড়া করে একটা চিঠি লিখলাম ছোটমামাকে।

—জয়ন্ত, আমি আরও কুৎসিত হতে পারি। চিঠি লিখতে লিখতে মনে মনে আমি বলেছিলাম।

সকলেই হয়ত বলতে চাইছে আমি এ পৃথিবীর যোগ্য নই। অথচ আমি যে ভিতরে ভিতরে এ সমাজের, একালের উপযুক্ত হয়ে উঠতে চাইছিলাম।

এমনি সময়ে, সেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

মণ্টু বাস থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হল। তিনটে দিন কিভাবে কেটে গেল জানতেও পারি নি। খবরের কাগজে, পাড়ায়, বাড়ির মধ্যে কোথায় কি ঘটে গেল, কত কি ঘটে গেল জানতেও পারি নি। স্মৃতিভ্রংশ মানুষের মত।

শুধু একটি আশংকা। মৃত্যু। শুধু একটি প্রার্থনা। মণ্টুকে বাঁচাতে হবে।

হাসপাতালের নিঃশব্দ করিডরে শুভ্রবেশে নার্সদের ত্রস্তপদের আনাগোনা।

ডাক্তারের চিন্তিত ধীর পদক্ষেপ। ভয়, ভয়, প্রচণ্ড ভয়। আর ক্ষীণ একটা আশা।

ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু জিগ্যেস করতেও ভয়।

গতকাল বিকেলে অমিতা এসেছিল। বীভৎস স্থির রক্তহীন মুখ সকলের। অমিতার, ঋণার, হয়তো বা আমার নিজেরও। একটি অবশ্যম্ভাবী শোকের জন্যে তিল তিল যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি।

—বাহাত্তর ঘণ্টা, বাহাত্তর ঘণ্টা পার না হলে কিছুই বলা যাবে না। ডাক্তারের কথাটা বড় নির্দয় মনে হয়েছিল।

কিন্তু শেষ অবধি মণ্টুর জ্ঞান ফিরে এল। ডাক্তারের মুখে হাসি। ঋণার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয়ের কি আছে, আমরা তো যথাসাধ্য করছি।

একটিমাত্র ভরসার কথা। কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এল। ঋণার মুখে বিষণ্ন হাসি।

সেই প্রথম দিন আমরা একটুখানি আশা নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরছিলাম। ঋণার মুখ প্রথম বর্ষার জল পাওয়া চারা গাছের মত দেখাচ্ছিল।

ঋণা হাসতে চাইছিল। তবু সংশয়ের কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলে, ভাল হয়ে যাবে তো।

আমি ট্যাক্সিটাকে একটু গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যেতে বললাম। আমি ঋণার মুখে একটু ভরসার বাতাস বুলিয়ে দিতে চাইলাম। ও পরম নির্ভরতায় আমার কাঁধে মাথা রাখল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার হয়ত ঋণার চোখের জল দেখেছিল, সে হয়তো আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। ডাক্তারের সান্ত্বনার কথা।

সে হঠাৎ স্তোকের মত গলায় বলল, ভাববেন না মা, ছেলে আপনার ঠিক ভাল হয়ে উঠবে।

খুব ধীরে ধীরে ট্যাক্সিটা চলছিল। আঃ, ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার যেন দূরে সরে যাচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে অত্যন্ত গর্হিত মন্তব্যের একটা তীর এসে বিঁধল।

আমি চমকে উঠলাম। ঋণার ভারহীন মুক্তস্বাদ শরীর চমকে উঠল সেই নোংরা বিদ্রূপে। আমার কাঁধ থেকে মাথাটা সরিয়ে নিল।

আমি তাকিয়ে দেখলাম রাস্তার মোড়ে গলাগলি হয়ে দাঁড়ান ছোকরাগুলো তখনও হাসছে।

একজন আবার কি যেন বলল।

আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। অশালীন কথাটা ঋণার আশাদীপ্ত ক্ষণিক আনন্দের মুহূর্তটুকু ভেঙে চুরমার করে দিল। এমন একটা কথা ঋণার কানে পৌঁছেছে ভেবে আমার মাথায় ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠল।

আমি ট্যাক্সি থামাতে বললাম। আমি তখন অন্ধ উন্মত্ত। আমি নেমে এসে বাঁ হাত বাড়িয়ে ছেলেটির সার্টের বুকটা বাঘের থাবার মত মুঠিতে কামড়ে ধরলাম।

সজোরে একটা চড় মারলাম তার গালে।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল মুদ্রণের অযোগ্য সেই কুৎসিত অভব্য শব্দটি।

আমার মনে হল জীবনে এই প্রথম আমি ভদ্রলোক হয়ে উঠলাম।

সমস্ত পথ ঋণা আর একটিও কথা বলে নি।

আমার ভীষণ অনুতাপ হল। সারা মন বিস্বাদ।

ফিরে এসে চিরাচরিত অভ্যাসে লেটারবক্সে উঁকি দিলাম। উঁকি দিয়ে একটা চিঠি দেখতে পেলাম।

সুইচ টিপে আলো জেলে চিঠিটা পড়তে পড়তে বললাম, দেখেছ কাণ্ড।

—কি হল? ঋণার গলার স্বর ম্লান।

বললাম, ছোটমামার চিঠি।

ঋণা তখনও হয়তো ছেলের কথা ভাবছে। কিংবা আজকের বিশ্রী ঘটনাটার কথা।

বললাম, এখন কি করি বল তো।

নিজেকে বড় অসহায় লাগল আমার।

ঋণা এমনভাবে 'কি লিখেছেন' জিগ্যেস করল, যেন উত্তর শোনার জন্যে ওর কোন আগ্রহই নেই।

আমার গলা ভারী হয়ে এল। চোখে জল এল। বললাম, লিখেছেন, ওটা তোকে দিয়ে দেবই ভেবেছিলাম। লিখেছেন, সোমবার গিয়ে দলিলগুলো নিয়ে আসব। আলমারিটা তুই নিয়ে নিস, রাখিস যত্ন করে। মেহগনি কাঠের তৈরী, অনেক খরচ হয়েছিল।

ঋণা কোন কথা বলল না। ও তখনও ভাবছে মণ্টুর কথা কিংবা আজকের বিশ্রী ঘটনার কথা।

আর—দৈত্যের মত ঐ বিরাট বেমানান আলমারিটা—উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভদ্রতাবোধের মত—তখন আমার বুকের ওপর চেপে বসছে।

—ওটাকে নিয়ে এখন কি করি বল তো? আমি অসহায়ের মত বলে উঠলাম।

আমরা সবাই একসঙ্গে

চমকে উঠলাম।—আমি?

চিৎকার করে উঠলাম, না না, আমি পারব না, আমি পারব না।

ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

তারপর জয়ন্ত স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুই। তুই ছাড়া আর কেউ পারবে না।

ববির মুখে কোন ভাবান্তর হল না। ও মাথা নামিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল, সোম তোকে পারতেই হবে।

আমি অসহায়ের মত ওদের মুখের দিকে তাকালাম। আমার মনে হল জয়ন্ত আর ববির মত নির্দয় আর নির্মম আর কেউ নয়। কেউ নেই।

কিন্তু আমি এতখানি নিষ্ঠুর হব কি করে।

শুভার চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার হাসি হাসি মুখ। মুখ? না, শুভার সমস্ত শরীর হাসে। সমস্ত শরীর। ঐ হাসি কাঁপা কাঁপা শরীরের ছন্দ ওকে সাজিয়ে রাখে। আর কিচ্ছু না, কিচ্ছু দরকার হয় না শুভার।

—টেরিফিক গরম রে অনিমেষ। চল না, প্রিন্সেপের দিক থেকে ঘুরে আসি। আমি বললাম শুভার মুখের দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ শুভা রাজি হলে তবেই অনিমেষ রাজী হবে।

প্যাণ্ট পরা ববি চেয়ারে বসেছিল পা দুটোকে কাঠের ক্রাচের মত এগিয়ে দিয়ে। ওর মুখের আয়েশী ছাপ বলতে চাইল, আবার কেন।

কিন্তু শুভা তার আগেই আধ পাক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আইডিয়া।

ব্যস্ কিচ্ছু না, আলমারির পাল্লায় লাগান আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কপালের ওপরটুকুতে দুবার চিরুণী বুলিয়ে নিল, কপালের টিপটা ঠিক আছে কিনা। তারপরই বলল, চলুন।

একটু একটু ভাঁজ পড়া শাড়িটা যেমন ভাবে ওর শরীরকে জড়িয়ে ছিল ঠিক তেমনি রইল। চটিতে পা গলিয়ে যখন রাস্তায় বেরিয়ে এল, তখন শুধু

লম্বা রুপোর চেনে চাবির গোছাটা একটা আঙুল থেকে ঝুলছে। এক একবার ঝাঁকানি দিয়ে সেটাকে মুঠোর মধ্যে আনছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে। ঐটুকুই অলঙ্কার।

গঙ্গার ধারের আলোয় কালোয়, ম্যাজেন্টা শাড়ির শরীর, ফ্লুরোসেণ্ট আলোর মত ফর্সা রঙ, পিঠের ওপর ঢেউ খেলান চুল, নিখুঁত নিখুঁত চোখের ভুরু, মুখের শ্রী—সব মিলিয়ে গিয়ে মনে হল শুধু একটা খুশীর শরীর এক নৌকো হাসি হয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

—কি মশাই, চোখে লাগছে কাউকে? ববির দিকে ফিরে হঠাৎ প্রশ্ন করল শুভা। আমার দিকে ফিরে একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়েকে দেখিয়ে বলল, দিব্যি ফীগার, তাই না? তারপর ঝট করে অনিমেষের দিকে ফিরে বলল, এই, তুমি তাকাবে না কিন্তু। বলে হেসে উঠল।

আমরাও হেসে উঠলাম।

অনিমেষ বলল, সোমের জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও না, তুমি। তোমার সেই অদিতি, ইস্কুলে চাকরি করে—

আমি বললাম, বাবিশ। তাকে আমি দেখেছি।

শুভা আস্তে আস্তে বলল, খারাপটা কি শুনি? তারপর ববির দিকে ফিরে হেসে উঠে বলল, বিয়ের পর আপনি নাকি জিগ্যেস করেছিলেন আমার আর বোন আছে কিনা? বলে আত্মতৃপ্তিতে মৃদু মৃদু হাসল।

ববি বোধহয় একটু লজ্জা পেল। হেসে ফেলে বলল, অনিমেষের কাণ্ড। বলেছে বুঝি আপনাকে?

শুভা বলল, বা রে, আমাকে বলবে না এমন কোন কথা আছে নাকি?

বলে এমন ভাবে হেসে উঠল যেন আমরা সবাই নির্বোধ, বিয়েটিয়ে করি নি বা হয় নি বলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কিছু বুঝি না, বুঝি না দাম্পত্য প্রেম কাকে বলে।

আসলে ওদের তো ভাব-ভালবাসার বিয়ে! যখন জানাজানি হল, শুভার মা একটুও আপত্তি করলেন না, ওর বাবা মত বদলালেন। কারণ অনিমেষ সত্যি জুয়েল, সব দিক থেকে।

তখন আমাদের খুব বোরিং লাগল। অর্থাৎ ওদের দুজনকেই আলাদা

আলাদা করে ভীষণ ভাল লাগল, কিন্তু ওরা দুজন যখন একসঙ্গে, আমাদের মনে হত আমরা কেন ঘুরছি বসছি, কথা বলছি, হাসছি!

বোধ হয় ঘুমোন হিংসে। তাই হবে, কারণ বিয়ের পরই শুভাকে ভীষণ ভাল লাগতে শুরু করল। আসলে মনের মধ্যে তো অনেক আক্ষেপ, অনেক ক্ষোভ, কিন্তু শুভার কাছে গেলেই সব জুড়িয়ে যেত। মনে হত শুভা যেন এক পুকুর তৃপ্তি।

ওরা তো এখন দম্পতি, মোস্ট আনইনটারেস্টিং। বিয়ের পর একদিন ওদের বাড়ি যাব বলাতে জয়ন্ত উত্তর দিল।

—দম্পতি! ববি হেসে উঠল। বলল, আমি পতির কথা বলছি না। দম কি দোষ করল?

শুভা সে কথা শুনে একেবারে হেসে হট্টগোল। কি সুন্দর চটপটে হাতে কফি বানিয়ে এনেছিল, আর বেসনে ভাজা ফুলকপি, গরম গরম।

আমি কফি খাই না বলেছিলাম, শুভা হেসে উঠে বলল, ঘুম হবে না? তারপর চামড়া দিয়ে মোড়া মোড়াটা কাছে টেনে নিয়ে বসে বলল, অভ্যেস করে রাখুন স্যার, পরে রাত জাগতে অসুবিধে হবে না।

আমি বললাম, না না, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।

ব্যস, চট্ করে কোত্থেকে এক ডিবে ভিক্স নিয়ে এসে এগিয়ে দিল। হাসতে হাসতে বলল, কি লাগিয়ে দেব নাকি?

আমি হাসলাম, কিন্তু ভাবি নি ও সত্যি সত্যি আঙুলের ডগায় ভিক্স্ নিয়ে কপালে লাগিয়ে দেবে।

অনিমেষ তা দেখে বলল, এই, আমার জেলাসি হচ্ছে কিন্তু।

শুভা শরীর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হেসে উঠল। তারপর হাত ধুয়ে এসে আবার মোড়াটায় বসল।

সেই হাসির শরীর, সেই কপালের উপর একটি আঙুলের ছোঁয়া আমি যেন আবার অনুভব করলাম। একটি সুখের দিঘিতে স্নান করলাম।

তারপর আমি বলে উঠলাম, না না, জয়ন্ত, আমি পারব না, আমি পারব না।

ববির মুখ এবার একটু কঠিন হল। ও বলল, তোকে পারতেই হবে।

আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। পেটের মধ্যে

চিনাচিন চিনাচিন করছিল, মাথা ঘুরছিল। সেই সকাল থেকে সমস্ত দিন…কি প্রচণ্ড গরম, স্নান দূরের কথা, কলের জলে একবার মুখ ধোয়ারও সময় পাই নি। একবার বোধ হয় গিয়ে পরপর দু কাপ চা খেয়ে এসেছিলাম। শরীর মন ভেঙে পড়ছিল।

আমি বললাম, ববি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি পারব না॥

ববি একটা নিষ্ঠুর দস্যুর মত আমার দিকে তাকাল। জয়ন্ত বোধ হয় রেগে গিয়ে দাতে দাঁত চাপল।

আমি চায়ের দোকানের ময়লা টেবিলটার দিকে তাকালাম।

তিনটে খালি কাপে উড়ে উড়ে মাছি বসছিল। টেবিলের ওপরে টাকার ব্যাগটা পড়েছিল। একটা শেফার্স কলম, রিঙে গাঁথা একটা চাবি, আর হাতঘড়িটা।

আমি প্রথমে পার্সটা দেখলাম, তারপর আমার চোখ ফাউন্টেন পেন, চাবির রিং, হাতঘড়ি দেখল। আমি ভীষণ ভয় পেলাম, আমার চোখ ঠেলে জল এল। আমি ববির হাতখানা ধরে ফেলে বললাম, বিশ্বাস কর, আমি পারব না।

জয়ন্তর চোখ দেখে আমার মনে হল ওর হাত যেন স্প্রিং টিপে ছুরির ফলাটা এগিয়ে ধরছে। নিজেকে আমার ভীষণ অসহায় লাগল।

আমার অবস্থাটা এরা যেন কেউ বুঝতে পারছে না। বুঝতে চাইছে না।

আমি বললাম, জয়ন্ত তুই পারবি। আমি, আমি সঙ্গে থাকব বরং।

—সঙ্গে থাকব। জয়ন্ত আর ববি যেন ভেংচে উঠল। বলল, দায়িত্ব কি শুধু তোর একার উপর দিচ্ছি? সঙ্গে তো আমরাও থাকব!

একদিন শুভা আর অনিমেষ ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে গিয়েছিল। সঙ্গে আমরাও ছিলাম!

ওর জামাইবাবুর পুরোন গাড়িটা যোগাড় করেছিল ববি, ওই চালাচ্ছিল! জামাইবাবুকে ও তীর্থদা বলে।

শুভার চুল উড়ছিল। ওর নরম ঢেউ খেলান চুল দেখলে সব সময়েই মনে হত ও যেন শ্যাম্পু করে এসেছে। না, ওর চুলই ঐ রকম। আর ওর ফর্সা, দারুণ ফর্সা মুখ সব সময়েই কেমন ঘুম ভাঙা ঘুম ভাঙা কুয়াশা জড়ান। ওর আঙুলগুলো খুব সুন্দর, দেখলেই মনে হয় নাচের মুদ্রার জন্যে গড়া।

ও আর অনিমেষ পিছনের সীটে বসেছিল। সামনে ববির পাশে আমি।

শুভা হাসছিল, কথা বলছিল, কথা বলার সময় হাওয়ায় ভাসা ওর চুলের মত ওর কথাগুলো হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল। আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না।

কিংবা রুপোর বাসনের আওয়াজের মত ওর গলার স্নিগ্ধস্বর ভাঙা গাড়িটার ঘর্ঘর আওয়াজে চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

শুভা হঠাৎ মুখ এগিয়ে নিয়ে এল, আমার কাঁধের একটু পাশে সীটের ওপর হাত রাখল। আমি আড়চোখে ওর সেই ফর্সা লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দেখতে লাগলাম। যে আঙুলগুলো একদিন আমার কপাল ছুঁয়েছিল।

শুভা বলল, অদিতিকে আনলে ভাল হত। বললেই আসত। এখন দেখছেন তো, আপনাদের ভাল লাগছে না।

আমাদের ভাল লাগা বা না লাগা কোন কথা নয়। আমরা চেয়েছিলাম বিয়ের পর ওদের পরস্পরকে আর একটু বেশী ভাল লাগুক। কিন্তু কথায় কথায় শুভা এমন ভাব করল যেন আমরা কিছু নই, চেষ্টা করলেও কারও ভালবাসা পেতে পারি না. অনিমেষ এ পৃথিবীতে একাই যেন জুয়েল।

চায়ের দোকানে আমরা যখন গরম কচুরি আব ডাল নিয়ে বসেছিলাম, শুভা খুব হাসছিল, দোকানের এবং চারপাশের লোক মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছিল, তখন আমি ইচ্ছে করে রাগ দেখাচ্ছিলাম। খুব চুপচাপ বসে ছিলাম, কথা বলছিলাম না।

—ভাল লাগছে না কিন্তু। হঠাৎ চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল শুভা। বলল, গম্ভীর থমথমে মখ নিয়ে বসে থাকলে কারও ভাল লাগে না।

ববি হেসে বলল, বসুন, বসুন। চটছেন কেন?

কিন্তু বসার তখন উপায় ছিল না, শুভার শরীর তখন হাসি হয়ে দুলছে। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ও তখন জলের গ্লাস উল্টে সীন ক্রিয়েট করেছে।

ও হেসে উঠল, আমরাও হেসে উঠলাম।

ফেরার পথে রাত হয়ে গিয়েছিল। অনিমেষ ডায়মণ্ডহারবার থেকে একটা ইলিশ মাছ কিনেছিল।

মাঝপথে এসে গাড়িটা খারাপ হল। খুটখাট করেও সারাতে পারল না ববি। পিছনে একটা বাস আসছে দেখে বললাম, আপনারা বাসে চলে যান, যা অনিমেষ।

ববি বলল, হ্যাঁ, আমরা যা হোক্ ব্যবস্থা করব।

শুভার মৃদু হাসি কৌতুক হয়ে উঠল। বলল, পাগল নাকি। কক্ষনও না।

আমি বললাম, ইলিশ মাছটার ওপর অন্তত নির্দয় হোস না অনিমেষ।

শুভা বলল, গাডি যদি ঠিক না হয়, আমরা চারজনে এই গাড়িতে বসে থাকব সারারাত। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার, তাই না?

ববি ক্রমাগতই কার্বোরেটর আর ডিস্টিবিউটার দেখতে দেখতে বিরক্ত হচ্ছিল, সেও হেসে ফেলল।

বলল, কাছেই টিনের ছাউনী দোকান আছে। এই ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত।

শুভা বলল, দারুণ।

গাডি অবশ্য শেস অবধি ঠিক হয়েছিল। একটা ট্রাক ড্রাইভার দয়া করে এসে ঠিক করে দিয়েছিল।

বেশ খানিকটা এসে শুভা একসময় বলল, লোকটার কি ক্ষতি করেছিলাম কে জানে।

—কার? অনিমেষ আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করল।

শুভা হেসে উঠে বলল, ট্রাক ড্রাইভারটার। গাডি ঠিক না হলে, ভাব তো, কি চমৎকার হানিমুন হত। দু দুজন বীরপুরুষ আমাদের গার্ড দিত, আমি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতাম

ববি ঠাট্টা করে বলল, অনিমেষ কিন্তু ঘুমোত না।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

আমি শুভার সেই হাসির মুখ, হাসির শরীরটা দেখতে পেলাম আবার। সেই ভরা-জোয়ার তৃপ্তির মুখ। আমি চায়ের টেবিলের ওপর রাখা মনিব্যাগটা দেখলাম, শেফার্স কলমটা দেখলাম, রিঙে লাগান একটা চাবি, আর হাত-ঘড়িটা।

ববি বিরক্ত হয়ে বলল, মিথ্যে সময় নষ্ট করিস না সোম।

জয়ন্ত বলল, এটা ছেলেখেলা নয়।

আমি বলে উঠলাম, পারব না, পারব না আমি।

তবু শেষ অবধি আমাকে রাজি হতে হল। যেন অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে আমি এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, ঠিক আছে।

চায়ের টেবিলের ওপরে রাখা মনিব্যাগটার দিকে আমি হাত বাড়ালাম। আমার হাত কেঁপে গেল কিনা আমি জানি না।

আমি একে একে মনিব্যাগটা, শেফার্স কলমটা, একানে চাবির রিংটা, হাতঘড়িটা তুলে নিলাম।

জয়ন্ত আর ববি আমার সঙ্গে সঙ্গে এল।

তখন রোদ্দুর পড়ে আসছে, কিন্তু ভ্যাপসা গরমে সারা শরীরে ঘাম। সারাদিনের ছোটাছুটিতে জামা কাপড় নোংরা, মন নিস্তেজ, অসহায়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা বাস পেলাম। আমি, জয়ন্ত, ববি। আমি সোজা হয়ে দাড়াতে পারছিলাম না. আমার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল। চারপাশ থেকে ভিড়ের চাপ আমাকে সোজা করে রেখেছিল, তা না হলে আমি যে কোন মুহূর্তে টলে পড়তাম।

বাস থেকে নেমে আমরা তিনজনে হাটতে হাটতে বরনাম সেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম, যেখানে আমাদের নিত্য গানবাজনা ছিল, বিশেষ কিছুদিন পরেই শুভা তার অনিমেষ সেখানে উঠে এসেছিল।

আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি একটি দারবানের মারখানে হঠাৎ দাড়ি টেনে দিতে হবে।

আমার ভীষণ ভয় করছিল

বাড়িটার সামনে দাড়িয়ে আমি মনের জোর সঞ্চয় করার জন্য একটা সিগারেট ধরালাম।

ববি বলল, আর দেরী করিস না।

আমি দু চোখ বুজে এগিয়ে গিয়ে দরজার পাশের ডোর-বেল টিপলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল ববি আর জয়ন্ত আমার সঙ্গে নেই। ওরা কখন ছিটকে দূরে সরে গেছে।

আমার নিজেকে আরও অসহায় লাগল।

সেই বাচ্চা চাকরটা দীনু দরজা খুলে দিয়ে আমাকে দেখেই বলল, দাদাবাবু বাড়ি নেই।

আমরা জানতাম। সেটা নতুন খবর নয়।

আমি পকেটে হাত দিয়ে কি যেন অনুভব করলাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, তোর বৌদিমণিকে খবর দে।

দীনুকে অনিমেষের মা জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া দীনুর মুখে

'মা' ডাকটা শুভা একদম পছন্দ করত না। ও নিজেই শিখিয়েছিল বৌদিমণি বলে ডাকতে।

দীপ্ত ভিতরে চলে গেল, আমি দাড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই শুভা ভিতরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল, আমাকে দেখে ওর মুখ প্রথমটা খুব হাসি হাসি ছিল। তারপর আমার সমস্ত শরীরের ওপর, পোশাকের ওপর চোখ বুলিয়ে ওর চোখের দৃষ্টি প্রশ্ন হয়ে গেল।

শুভা আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেল, ওর শরীর পাথর ?

আমি শুভার দিকে তাকিয়ে কোন কথা বলতে পারলাম না, আমার শরীর একটা খুঁটির মত।

আমি ধীরে ধীরে পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করলাম, ছোট্ট টেবিলটার ওপর রাখলাম। আমি শেফার্স কলমটা বের করলাম, টেবিলটার ওপর রাখলাম। তারপর সেই একভাবে চাবির রিং আর হাতঘড়িটা বের করে টেবিলের ওপর রাখলাম।

ছোট টেবিলটার ওপর মানিব্যাগ, কলম, চাবির রিং আর হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন অ্যাক্সিডেন্টের পরে একটা মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চারপাশে ছিটকে পড়ে আছে।

আমি শুভার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না, তবু স্পষ্টভাবে মনে হল শুভা যেন একদৃষ্টে ঐ মানিব্যাগ, কলম, চাবির রিং, হাতঘড়িটা স্থির হয়ে দেখছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

কতক্ষণ জানি না, কয়েক সেকেণ্ডই হয়তো, হঠাৎ শুভার গলা শুনলাম, বসুন।

বলেই আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবল কে জানে, ভিতরে চলে গেল।

আমি পিছন থেকে ডাকলাম, শুভা শোন!

আমি শুভাকে কোনদিন 'তুমি' বলি নি। আমরা সবাই 'আপনি' বলতাম, কিন্তু কোনদিন মনে হয় নি কোন দূরত্ব আছে। তবু হঠাৎ কেন আমি 'শুভা শোন' বলে ডেকে উঠলাম, আমি নিজেই জানি না।

শুভা অনেকক্ষণ এল না। আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি। আমার মনে হল শুভা হয়তো বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়েছে, কাঁদছে। আমার মনে হল শুভা হয়তো নিজে আসবে না, আমাকেই গিয়ে সান্ত্বনা দিতে হবে, আসল খবরটা জানাতে হবে, ও হয়ত ভুল বুঝেছে।

আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম।

একটু দূরেই জয়ন্ত আর ববিকে দেখতে পেলাম আমি। ওরা পায়চারী করতে করতে জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। বোধ হয় ইশারায় আমি কেন দেরী করছি জানতে চাইল।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ভিতরের দরজার দিকে তাকালাম। শুভা কখন এসে পড়ে। শুভাকে এখন আর বলা যায় না জয়ন্ত আর ববি দাঁড়িয়ে আছে। শুভাকে এখনও আসল কথাটাই বলা হয় নি।

শুভা অনেকক্ষণ পরে ফিরে এল। মনে হল মুখে চোখে জল দিয়ে এসেছে। হয়তো চোখের জল লুকোবার জন্যে। কিন্তু কিছু বলার আগেই দেখি শুভার হাতে একটি কাচের প্লেটে কিছু খাবার।

আমি চমকে উঠলাম। আমার কেমন বেখাপ্পা লাগল, অস্বস্তিবোধ করলাম।

আমি বলে উঠলাম, না না, একি।

—আপনার খাওয়া হয় নি। শুভা স্পষ্ট দৃঢ় গলায় বলল।

প্লেট নামিয়ে রেখেই ও চলে গেল।

আমি বোকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর বসলাম। আমি আবার জানলা দিয়ে ববি আর জয়ন্তর দিকে তাকালাম। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

শুভা চা নিয়ে এসে বলল, খেয়ে নিন।

আমার মনে হল সিঙাড়াটা আমার গলায় আটকে যাবে। আমার গলা দিয়ে কিছুই নামছিল না। আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, শুভা নিজের ঠোঁটে তর্জনী রেখে চুপ করতে বলল। —খেয়ে নিন, তার আগে আমি কিছু শুনব না।

আমি কোনরকমে চা-টুকুও শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, ডাক্তার বলছে ভয়ের কিছু নেই।

—সত্যি যা তা বলুন। আমার মত শক্ত মেয়ে খুব কম আছে। শুভা বলল।

আমি বললাম, আর কি করে। বেঁচে আছে। ডাক্তার বলেছে ·

ডাক্তার আসলে বলেছিলেন, কিছু বলা যায় না।

একুশ দিন ধরে আশা আর দুরাশার মধ্যে দুলতে দুলতে অনিমেষ শেষ পর্যন্ত মারা গেল।

শুভা তার আগে একদিন শুধু বলেছিল, আমি বারবার বারণ করেছিলাম স্কুটার কিনতে।

আমরা তিনজনই আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। আমার মনে কেমন একটা ক্ষীণ সন্দেহও হত।

রবি তো বলেই ফেলল, মেয়েদের চেনাই যায় না, চেনাই যায় না।

সেদিন আমাদের সঙ্গেই হাসপাতালে চলে এসেছিল শুভা। তারপর একুশ দিন ধরে সে কী জীবন মৃত্যুর টানাপোড়েন। আমরা জানতাম বাঁচবে না। তবু আমাদের কখনও কখনও আশা হত। আবার কখনও ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারতাম সব মিথ্যে।

শুভা বাড়ি আর হাসপাতাল, হাসপাতাল আর বাড়ি করছে, কিন্তু দিব্যি হাসিখুশি। হাসপাতালের গেটে দেখা হয়ে গেলে উৎফুল্ল মুখে বলে উঠত, জানেন, আজ আর জ্বরটা নেই। অনিমেষের বাবা খুঁটিনাটি জিগ্যেস করেছিলেন একদিন, শুভা আমাদের সামনেই হেসে বলল বাবা, আপনার কেবল ভয়। ছেলে আপনার সেরেই গেছে। শুভা একদিন তার মাকে বলল, কিচ্ছু ভাবনা নেই এখন আর।

ও হেসে হেসে কথা বলত। আমাদের ভয় ভয় করত।

জয়ন্ত বলেছিল, ভীষণ শক পাবে।

রবি বলেছিল, ওকে তো বলাও যায় না।

আমি ভেবেছিলাম, একদিন এলেই দেব অতখানি আশা করার কিছু নেই।

বলি নি। কারণ শুভাকে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। জয়ন্ত তো একদিন সেকথা আলোচনাও করেছিল। বলেছিল, ও এক অদ্ভুত টাইপ, বুঝলি। স্বামী মারা গেছে কিংবা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কিছু একটা নিশ্চয় মনে হয়েছিল তো, তবু তোকে জিগ্যেস না করে খাবার আর চা এনে দিল। রবি বলেছিল, কেউ কেঁদে ভেঙে পড়ে, কেউ পাথর হয়ে যায়। শুভার ভাবটা এই যেন কোথাও কিছু ঘটে নি, সব ঠিক আছে। কেমন সুখী সুখী ভাব।

অনিমেষের শ্রাদ্ধের দিনে আমরা আরও আশ্চর্য হলাম।

অনিমেষের বড় ছবিটা মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা ছিল, কিন্তু, শুভার যে চেহারা আমরা আশা করেছিলাম তা থেকে ও সম্পূর্ণ পৃথক। সেই ম্যাজেন্টা রঙের শাড়িটা ও পরেছিল, ঢেউ খেলান এলো চুল এলোমেলো হয়ে

উডছিল, দ্রুত পায়ে ঘোরাঘুরি করছিল, কাজ করছিল বলে কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আমাদের দেখেই মুখ হেসে উঠল।

—আসুন। চেয়ার টেনে নিজেই বসতে বলল।

চলে আসার আগে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসে বলল, আসবেন কিন্তু মাঝে মাঝে।

যেতাম, আমরা তিনজনই যেতাম। শুভার বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার পরেও গিয়েছি। কখনও একা, কখনও তিনজনেই। আমি, রবি, জয়ন্ত।

শুধু একটা খটকা লাগত। আমাদের দেখে ওর [illegible] প্রসন্ন হওয়ার কথা। অনিমেষের কথা মনে পড়ত না। কিন্তু শুভা সেই আগের মতই রঙিন শাড়ি পরত, হাসত, বসবার [illegible] বের করে বলত, আসুন বরং তাস খেলা যাক।

আমি একদিন একা গিয়েছি। দেখি শুভা সত্যিই গ্রামোফোন মেঝেতে বসে রেকর্ড বাজাচ্ছে একা একা। বলল, চুপচাপ বসে একটা গান শুনুন।

শুভাদের আত্মীয় স্বজনরা কেউ কখনও এসে পড়লে, আমাদের দেখে তাদের মুখ চোখ এমন হত, যে আমার লজ্জা লাগত। ভাবতাম, আর আসব না।

আমাদের জন্যে শুভাকে অপবাদ কুড়োতে হবে, ওর দুর্নাম হবে, ভাবতেও খারাপ লাগত।

শুভার মা বাবা কোনদিন কিছু বলেন না বরং কখনও কখনও গল্প করতেন। হয়তো ভাবতেন, মেয়েটা এদের সঙ্গে গল্প করে যদি নিজের দুঃখ ভুলে থাকতে পারে মন্দ কি

একদিন চলে আসছি সিঁড়ি বেয়ে, সেদিন শুভার একটু জ্বর জ্বর হয়েছিল, ও আর নেমে এল না, শুভার মা হঠাৎ সিঁড়ির ধার থেকে এগিয়ে এসে বললেন শোন।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

উনি একটু ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন, তোমাদের······কিছু মনে কর না, পাড়ায় থাকা যে মুশকিল হয়ে পড়ছে।

অপমানে লজ্জায় আমি কিছু বলতে পারলাম না। ঠিক এমনি কিছু হবে আমি যেন অনেকদিন আগে থেকেই আশঙ্কা করছিলাম। আমার মনে

ওর পিছনে পিছনে ওর ঘরে ঢুকলাম।

শুভার শরীর যেন আরও সুন্দর হয়েছে এই একমাসে। আমার ওকে ছুঁতে ইচ্ছে হল।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই শুভা ব্যথার সুরে বলল, কতদিন আসেন না, এত খারাপ লাগে একা একা।

এত খারাপ লাগে একা একা। কথাটা কানে কবার রেকর্ডের গানের মত বাজল। আমার সমস্ত শরীব উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল, আমার তখনই ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল শুভাকে, শুভার আশ্চর্য শ রীর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধবি।

কিন্তু তার আগেই শুভা হেসে উঠল। ধীরে ধীরে বলল, আপনি এলে, আপনারা এলে কি ভাল লাগে বুঝবেন না। যতক্ষণ থাকেন, মনে হয় আপনাদের বন্ধুটিও যেন সঙ্গে রয়েছে।

আমাব সমস্ত শবীর সেই মুহূর্তে ভেঙে পড়ল। আমি মাথা নিচু করলাম।

সেই প্রথম মনে পড়ল, অনিমেষ আমাদের সঙ্গে নেই।

স্বর্ণলতার প্রেমপত্র

ব্যাপারটা আমি তখনও বুঝতে পারি নি। অলক কি এমন কথা বলতে চায়; বলতে চায়ই যদি, তো এত উসখুস করছে কেন। বলেই ফেলুক না।

অলক তখন আমাদের সকলের কাছেই হীরো হয়ে গেছে।

হীরো হবারই তো কথা। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট ইয়ার আর্টসের ছেলেদের মধ্যে ওর মত সুন্দর চেহারা একজনেরও ছিল না। না, একজনের ছিল—অমিয়। কিন্তু তার কেমন মেয়েলী-মেয়েলী চেহারা, মুখে পাউডার মাখত, কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি পরত, কথাবার্তাতেও তার কেমন একটা সখী সখী ভাব ছিল। আমরা তাই ঠাট্টা করে বলতাম, সখীবাবু।

অলক কিন্তু অমিয়র মত ছিল না। একেবারে অন্যরকম চেহারা, অথচ সুন্দর। দোতলা বাসের সামনের সীটে ও একদিন বসেছিল কলেজে আসবার সময়, আমি পিছনে, হাওয়ায় ওর শ্যাম্পু করা হাল্কা চুল উড়ছিল, পিছন থেকে ওর ঘাড়, টিকোলো নাক, চিবুক সব মিলে এমন ছবির মত লাগছিল, আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ দেখলাম কি, ওপাশের সীটে বসা একটি সুশ্রী মেয়ে একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

আমি নিজের মনেই হেসে ফেলেছিলাম মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে। একসঙ্গে কলেজের সামনে বাস থেকে নেমেই সেকথা বলেছিলাম অলককে।

বলেছিলাম, তোর মত চেহারা হলে কি করতাম জানিস?

লজিকের ক্লাসে প্রক্সির ব্যবস্থা করে যখন রাণার কেবিনে এসে সবাই জড় হলাম, বাসে দেখা দৃশ্যটা রসিয়ে রসিয়ে আমি বর্ণনা করে মণীন্দ্রকে জিগ্যেস করলাম, ওর মত চেহারা পেলে কি করতিস্ তুই, বল তো।

মণীন্দ্র হেসে বলল, কি আবার, চুটিয়ে প্রেম করতাম।

অমূল্য আমাকে প্রশ্ন করল, তুই

বললাম, স্রেফ পকেট মারতাম। ওই চেহারায় ধরা পড়লেও কেউ বিশ্বাস করত না।

মেয়েটিকে বাসের মধ্যে ওর দিকে ওভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে

হেসে ফেলেছিলাম নিজের মনেই, কিন্তু ও-বয়সে বুকের মধ্যে কি একটু জ্বালা বোধ করি নি? একটু হিংসে? সে জন্যেই হয়তো বললাম, ওকে পেলে পকেটমাররা মাইরি লুফে নেবে।

অলক কিন্তু চটল না, ও শুধু হাসল। আসলে ও বোধ হয় কারও ওপর চটতে জানত না, এত মিষ্টি ব্যবহার ছিল ওর, এমন মোলায়েম ভাবে কথাবার্তা বলত যে ওর কাছে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হত।

কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা সবাই একমত ছিলাম, আমি, অমূল্য, মণীন্দ্র। আমরা তখন সেভেন-ও-ক্লককে দাড়ি কামিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বড হবার সঙ্গে সঙ্গে যে-কোন একটি মেয়ের চোখে বিশেষ হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে মনে তখন আমরা সকলেই জানতাম, আমাদের কারও জীবনে কোনদিন যদি সত্যি সত্যি প্রেম আসে তা হলে তা নিঃসন্দেহে আসবে অলকের জীবনে।

অথচ অলক নিজেও তখন হা-হুতাশ করছে, অমিয়র অর্থাৎ সখীবাবুর বানানো প্রেমের গল্পে ডুব দিয়ে আমাদের মতই আনন্দ পাচ্ছে।

এমন সময় সেই অঘটন ঘটে গেল।

কয়েকদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম, অলক কি যেন বলবার জন্যে উসখুস করছে।

আমি শেষ অবধি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, কি হয়েছে বলত তোর? এত অন্যমনস্ক হয়ে যাস কেন মাঝে মাঝে?

অলক কিছু বলল না, শুধু মুচকি হেসে বলল, যাঃ।

অথচ অপ্রতিভ ভাব দেখে, ওর লাজুক-লাজুক তাকানোর মধ্যে সব রহস্য ধরা দিল।

আমি বললাম, নির্ঘাত তুই প্রেমে পড়েছিস, বল, সত্যি কিনা?

অলক এস-বি'র ক্লাসে কোনদিন নোট নেয় নি। তবু সেদিন নোট নেওয়ার ছলে মুখ নামাল খাতার ওপর। তারপর ধীরে ধীরে বলল, বলব, বলব।

তাহলে সত্যিই কিছু ঘটেছে? সত্যিই কোন মেয়েকে ভালবেসেছে ও? শুনে অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ হল। আর অদম্য এক কৌতূহল। যেন অলক নয়, আমি নিজেই কাউকে ভালবেসে ফেলেছি।

ক্লাস শেষ হতেই রাণার কেবিনে চা খেতে এলাম দুজনে।

আর অলক বলল, অমূল্যদের বলবি না বল ?

—না, কক্ষনো না।

একে একে সব কথা বলে গেল অলক, মনে হল এ কদিন কারও কাছে তার এই গোপন আনন্দের খবরটুকু না দিতে পেরে ও নিজেও যেন দম বন্ধ হওয়া যন্ত্রণায় ভুগছিল।

কি আশ্চর্য, অলকের ওপর আমার কিন্তু একটুও হিংসে হল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি সব কথা জিগ্যেস করলাম। আর অলক যখন মেয়েটির সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়ার কথা, তার মনের ভয়-সংশয়-অনিশ্চয়তার কথা বিশদভাবে বলে যেত তখন আমি তন্ময় হয়ে শুনতাম। যেন অলক নয়, আমি নিজেই একটি উপন্যাসের নায়ক হয়ে উঠেছি।

যেটুকু বা দূরত্ব ছিল, এই একটি ঘটনায় অলক আর আমি যেন আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম।

আমি জিগ্যেস করলাম, কি নাম রে তার ?

—স্বর্ণ, স্বর্ণলতা। অলক মৃদু হেসে কেমন সলজ্জভাবে বলল, বলেই প্রশ্ন করল, ভারী মিষ্টি নাম, তাই না ?

নামটা আমার খুব সেকেলে লাগল, তবু, তবু কেন জানি না খুব ভাল লাগল। বললাম, খুব মিষ্টি নাম।

স্বর্ণকে দেখবার জন্যে আমার তখন প্রচণ্ড আগ্রহ। আলাপ করার তীব্র ইচ্ছে। আমি কি তা হলে অলকের মুখে তার কথা শুনে শুনে নিজের অজান্তেই স্বর্ণর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম ! কি জানি।

অলক কিন্তু কিছুতেই আমাকে নিয়ে যেত না, এমন কি চোখের দেখাতেও তার যেন আপত্তি। আমি বুঝতাম, ও আমাকে ভয় পায়, কিংবা বিশ্বাস করে না। সে-কথা ভেবে হাসি পেত, কখনও বা রাগ হত। আমি কি ওর হাত থেকে স্বর্ণকে ছিনিয়ে নেব ? ছিনিয়ে নেওয়া কি সম্ভব ? তবু ও কেন এড়িয়ে যেতে চায় আমি বুঝতে পারতাম না।

আমি তাই মাঝে মাঝে ওকে ঠাট্টা করতাম। বলতাম, আমার সঙ্গে আলাপ হলেই আমার প্রেমে পড়ে যাবে নাকি তোর স্বর্ণ ?

স্বর্ণকে নিয়ে কোন ঠাট্টা অলক কিন্তু একেবারেই সহ্য করতে পারত না। ওর উজ্জ্বল মুখখানা তখন কেমন যেন হঠাৎ ম্লান হয়ে যেত।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন খুব খুশী খুশী মুখ নিয়ে হাজির হল অলক। যেন পৃথিবী জয় করে এইমাত্র ফিরে এল।

বললাম, কি ব্যাপার? এত ফুর্তি কিসের?

অলক লাজুক হাসি হেসে একটা চিরকুট বের করল বুক পকেট থেকে। এগিয়ে দিল আমার দিকে।

মাত্র দু লাইনের একটা চিঠি। স্বর্ণর লেখা। যেন এর চেয়ে মূল্যবান পৃথিবীতে আর কিছুই নেই, থাকতে পারে না, এমনভাবে চিরকুটটা ফেরৎ নিল অলক, সযত্নে নরম হাতের স্পর্শে সেটা ভাঁজ করল, করে পকেটে রাখল।

তারপর ওর কপালে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কি করি বলত? উত্তর চেয়েছে।

—উত্তর দিবি!

অলক চুপ করে রইল, তারপর বলল, যা হাতের লেখা আমার···

আমি হেসে ফেললাম। সত্যি, বেচারীর হাতের লেখা সত্যিই একেবারে বিশ্রী। ওই হাতের লেখায় কি প্রেমপত্র লেখা যায়?

অলক নিজের মনেই বলল যেন, স্বর্ণর হাতের লেখাটা খুব সুন্দর, না রে?

সুন্দর না হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন, বেশ স্পষ্ট।

অলক কি যেন ভাবল, তারপর বলল, তো[illegible] মত হাতের লেখা যদি হ[illegible] আমার ··

শুনে ভীষণ ভাল লাগল আমার, বুকের গোপনে একটা গর্বের ফুল যেন পাপড়ি মেলতে চাইল। অলকের সঙ্গে কোন দিক থেকেই তো আমার কোন তুলনা হয় না, তবু, তবু একটা জায়গায় আমার মাথা যেন অলককে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। আমার হাতের লেখা সুন্দর, খুব সুন্দর। আর প্রেমের চিঠিও হয়তো আমি ওর চেয়ে অনেক ভাল করে লিখতে পারব। ও কি লিখবে? ও তো বনলতা সেন পড়েই নি।

অলক তখনও উসখুস করছে। কি যেন বলতে চায়। যদি বলতেই চায় বলেই ফেলুক না। যদি চায়, ওর হয়ে আমি একটা চিঠি ড্রাফট্‌ করেও দিতে পারি, ও সেটা নকল করে স্বর্ণকে পাঠিয়ে দিতে পারে।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম, ও কি বলে শোনবার জন্যে।

অলক অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ বলল, স্বর্ণ তো আমার হাতের লেখা চেনে না, তুই লিখে দে না!

আমি হেসে ফেললাম।—আহা রে, তোমার হয়ে আমি চিঠি লিখি, তারপর বাপের কাছে ধরা পড়লে আমাকে ঠ্যাঙানি খেতে হোক্‌ আর কি!

অলক বাধা দিল।—যাঃ, তা কেন হবে। তোকে তো কেউ চেনেই না।

ওঃ হো, আসলে হাতের লেখা টেখা তা হলে বাজে কথা। ধরা পডার ভয়ে নিজের হাতে চিঠি লিখতে চাইছে না অলক। তাছাড়া আর কি, যাকে ভালবাসিস তার কাছ থেকে হাতের লেখাটা লুকোবার কি দরকার শুনি!

অলক কিন্তু ততক্ষণে আমার কাঁধে হাত রেখে অনুনয়ের কণ্ঠে বলছে, শোন আনন্দ, তোকে লিখে দিতেই হবে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি 'না' বলতে পারলাম না। অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতার লাইন দিয়ে, অনেক ফুল-তারা-পালক সাজিয়ে একটা চিঠি লিখে দিলাম। লিখতে লিখতে মনে হল যেন অলক নয়, আমিই না-দেখা, না-জানা একটি ষোল বছরের মেয়ের উদ্দেশ্যে আমার বুকের সুপ্ত অনুভূতিগুলো উজাড় করে দিচ্ছি।

কিন্তু একখানা চিঠি লিখেই কি নিস্তার আছে। দিন কয়েক পরেই স্বর্ণর উত্তরটা নিয়ে এসে হাজির হল অলক।—ত্যাখ, আনন্দ, তোর চিঠির, তোর হাতের লেখার কত প্রশংসা করেছে।

সত্যিই। স্বর্ণর চিঠিটা পড়তে পড়তে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। অলকের লেখা মনে করে স্বর্ণ যা কিছু লিখেছে, যা কিছু প্রশংসা, তা যেন আমারও প্রাপ্য।

আমি তাই ঠাট্টা করে বললাম, দেখিস অলক, শেষ অবধি স্বর্ণ না আমার প্রেমে পড়ে যায়।

শুনে অলক হাসল। বলল, এবাবে আরও ভাল করে লিখে দে উত্তরটা।

আমি কি অলকের অনুরোধ শুনে ভাল করে লিখতে চেষ্টা করতাম? না। জীবনে যে কোনদিন প্রেমের স্পর্শ পায় নি, প্রেম যার কাছে শুধু বইয়ে পড়া অনেক দূর থেকে দেখা অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা, অথচ অভাবে হতাশায় কল্পনার রঙে মেশান একটা অনুভূতি একটা চিঠি লেখার সুযোগ পেয়ে তার হৃদয়ই হয়তো কপাট খুলে দিয়েছিল।

একদিন তাই সন্দেহ হল, আমি অলকের হয়ে স্বর্ণকে চিঠি লিখছি, না আমি নিজেই তার কাছে কৃপাপ্রার্থীর মত ছুটে যেতে চাইছি।

স্বর্ণ কে, সে কেমন দেখতে, আমাকে দেখে সে ঘৃণায় মুখ ফেরাবে কিনা

এ-সবের হিসেব নিতে ইচ্ছে হত না। আমার শুধু মনে হত, আমি নিজেই যেন স্বর্ণ নামের কোন একটি মেয়েকে প্রেম নিবেদন করছি।

এক একসময় তাই অলককে আমার অসহ্য লাগত, অসহ্য লাগত স্বর্ণর চিঠিগুলো। কারণ, সে চিঠিতে আনন্দর কোন ভূমিকা নেই। সেখানে দেখতাম স্বর্ণর সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে অলক। আনন্দ বলে কেউ আছে এ-খবরও সে জানত না।

সেদিন তাই অলক যখন আবার একটা চিঠি লিখে দিতে বলল, আমি হেসে বললাম, ওসব চলবে না রোজ রোজ। স্বর্ণকে একটা চুমু খেতে দিবি বল, তা হলে লিখে দেব। তা না হলে যাও বাবা, নিজে লিখে নেবে যাও।

আমি ভেবেছিলাম আমার কথা শুনে অলক হাসবে। কিন্তু ও হাসতে পারল না। অসহ্য কোন কষ্টে ওর সমস্ত মুখ মুহূর্তে কেমন বিকৃত হয়ে গেল। বুঝলাম, ও খুব আঘাত পেয়েছে। তখন তো জানতাম না, কাউকে যখন আমরা ভালবাসি তখন ভিতরে ভিতরে আমরা তাকে শ্রদ্ধাও করি।

অলক অসহায় দুর্বলের মত আমার হাতের ওপর হাত রাখল। বলল, তুই আনন্দ, তুই এসব বলিস না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অপ্রতিভ বোধ করলাম। মনে হল এখনই বুঝি ওর দু চোখ ঠেলে জল গড়িয়ে পড়বে।

অলক আমাকে বলেছিল, অমূল্যদের তুই এসব কথা বলিস না। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বলব না। কিন্তু আমার মাঝে মাঝেই ভয় হত, যদি কোন কারণে স্বর্ণ তার বাবা-মার কাছে ধরা পড়ে, যদি অলকের বাবার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন তাঁরা···

মণীন্দ্র প্রথম শুনেই বলেছিল, করেছিস কি তুই? ধরা পড়লেই তো ও-শালা বলবে তোর লেখা। মরবি তুই, দেখিস।

বাড়ি জিনিসটা তখন আমাদের কাছে একটা কঠোর শাসনের রক্তচক্ষু। বাবাকে কোন কোন পারিবারিক অশান্তির মুহূর্তে দেখে মনে হত পুলিশ ফাঁড়ির দারোগা। সাদা কথায়, বাবা, মা, মেজকা, বড়দা, এমন কি সেজদিকেও আমরা ভয় পেতাম।

তাই প্রায়ই মনে হত প্রতিজ্ঞা চুলোয় যাক্, অমূল্যদের সব কথা খুলে বলি,

ওরা অন্তত সাক্ষী দেবে যে চিঠিগুলো আমার লেখা নয়। অর্থাৎ হাতের লেখাটাই শুধু আমার।

সেদিন রাণার কেবিনে এসে বসেছি, মণীন্দ্র অমূল্য ওরা সথীবাবুকে ঘিরে ধরেছে, আর কোঁচানো ধুতির ডগাটা কাগজের ফুলের মত বাঁ-হাতের মুঠোতে তুলে ধরে অমিয় দিব্যি তার প্রেমের গল্প বলে যাচ্ছে। ছেলেটাকে দেখলেই আমার গা-জ্বালা করত। আমরা যে এমন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই, কই একটি মেয়েও তো ফিরে তাকায় না। অথচ প্রতিদিনই এক একজন নতুন প্রেমিকা জোটে ওর।—আমি তো দেখি নি, বাস থেকে নামতেই একটা মেয়ে বলল, শুনুন…

সথীবাবু বলে যাচ্ছিল, আর অমূল্য মণীন্দ্র গোগ্রাসে গিলছিল তার বানান গল্প।

আমি অমিয়কে আঘাত দেবার জন্যেই বললাম, আরে দূর, ওসব কে শুনতে চায়। অলক আসুক, তার কাছে শুনবি।

—অলক? ওরা সকলেই চমকে উঠল।

আর আমি যতখানি সম্ভব বাড়িয়ে বাড়িয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে, যতখানি সম্ভব সুন্দর করে তার প্রেমের গল্প শোনালাম ওদের। চিঠি লিখে দেওয়ার কথাও।

মণীন্দ্র সব শুনে বলল, ও-ব্যাটা ধরা পড়লে মরবি তুই, ও স্রেফ তোর ঘাড়ে দোষ চাপাবে।

তা চাপাক, ওরা তো সাক্ষী রইল, তখন দেখা যাবে। কিন্তু আমার ইচ্ছে হত, অলক তার স্বর্ণকে বলুক, চিঠিগুলো আমার লেখা, তার প্রতিটি শব্দ আমার অনুভূতি দিয়ে গড়া, হাতের লেখাটাও।

কিংবা সে-সবই ও গোপন করে রাখুক, শুধু একটি দিন ও স্বর্ণকে দেখতে দিক। শুধু চোখের দেখা, আর কিছু নয়।

আমি তখন কল্পনায় স্বর্ণকে দেখি, স্বর্ণর একটা মিষ্টি সুন্দর চেহারা আমার বুকের মধ্যে আঁকা হয়ে গেছে।

এদিকে অলক আমার ওপর খুব চটে গিয়েছিল, আমি কেন সব কথা অমূল্যদের বলে দিয়েছি।

আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, বেশ করেছি, তুই আর আসিস না আমার কাছে চিঠি লেখাতে।

কিন্তু বেচারী না এসেই বা পারবে কেন! তখন ও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে, তখন ইচ্ছে করলে আমি ওকে দু আঙুলে ধরা ফড়িঙের মত ছটফটিয়ে মারতে পারি, ইচ্ছে করলে ওকে কাশের আকাশে উড়িয়ে দিতে পারি।

অর্থাৎ তখন আর হাতের লেখা বদলানোর উপায় নেই অলকের। আমার শরণাপন্ন তাকে হতেই হবে। তখন আর সব কথা স্বর্ণকে খুলে বলারও সাহস নেই তার, পাছে সব কথা শুনে স্বর্ণ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে, অবিশ্বাস করতে শুরু করে।

আমি তাই সেদিন আবার বললাম, এক একটা চিঠির দাম এক একটা চুমু। স্বর্ণকে একটা চুমু খেতে দিবি বল, তবে লিখে দেব।

অমূল্য আর মণীন্দ্র হো হো করে হেসে উঠল, বলল, ঠিক বলেছে আনন্দ।

কিন্তু অলকের মুখ সাদা হয়ে গেল, ও এক অসহ্য যন্ত্রণা লুকিয়ে হাসবার চেষ্টা করতেই ওর মুখটা কেমন বিশ্রী দেখাল।

তা দেখাক, ওই বা আমাকে এ-ভাবে এড়িয়ে এড়িয়ে চলবে কেন? স্বর্ণকে একটা দিন কি ও চোখের দেখা দেখাতে পারে না? একটা দিন আলাপ করানোর সুযোগ পায় না? আমি বুঝতাম, ও নানা অজুহাতে স্বর্ণকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

কিন্তু ও প্রায়ই বলত, স্বর্ণর সঙ্গে দেখা হল, স্বর্ণ কি বলেছে জানিস? বলেছে, আমাকে না পেলে সারা জীবন···

—রেখে দে তোর স্বর্ণ! আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম। তার পর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কষ্ট হয়েছিল। বলেছিলাম, হ্যাঁ রে, প্রায়ই তো তোদের সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে এত চিঠি লেখালেখি কেন?

অলক খুব লজ্জা পেয়েছিল, তারপর বলেছিল, মুখে কি মনের কথা বলা যায় রে!

কিন্তু চিঠিতে তো অলকের মনের কথা আমি লিখতাম না, লিখতাম বোধ হয় নিজেরই মনের কথা। স্বর্ণকে নয়, যে কোন একটি মেয়েকে। আমার কামনা বাসনা অতৃপ্তির রঙ বুলিয়ে লিখতাম সে সব চিঠি।

এমনি ভাবেই চলছিল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

হঠাৎ একদিন অলককে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল। দিনে দিনে ওর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন কে ধীরে ধীরে নিঙড়ে নিচ্ছে। ওর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। কেমন একটা রুক্ষ প্রতিবাদের মত ওকে মনে হত।

একদিন জিগ্যেস করলাম, কি হয়েছে রে অলক? আর তো চিঠি লেখাস না?

একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে অলক বলল, বলব, বলব।

সেদিন কলেজ ছুটির পর আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কের দিকে চলে গেলাম। তখন কার্জন পার্কের অন্য চেহারা, অন্য রূপ। ট্রামের ঘর্ঘর ছিল না, লোকের ভিড় ছিল না এত, অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুল-ফুল ঘাস নিঃশব্দতা ম্লান আলো অন্ধকার 'মা-লি-শ'।

আমরা দুজনে এসে আরও নির্জন একটা কোণ বেছে নিয়ে বসলাম, বাঁ কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া, দাঁতে ঘাসের একটা লম্বা শীষ কাটলাম, জিগ্যেস করলাম, বল তো কি ব্যাপার।

অলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, স্বর্ণর বিয়ে।

—কার সঙ্গে? আমি চমকে উঠে জিগ্যেস করলাম।

অলক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, কে জানে, আমি জানতে চাইও নি।

তারপর পকেট থেকে একটা বাণ্ডিল বের করল। সেই চিরকুট থেকে শুরু করে যত চিঠি স্বর্ণ তাকে লিখেছিল, যেগুলো উত্তর লেখার জন্যে দরকার এই অজুহাতে আমি মাঝে মাঝেই পড়তে নিতাম, পড়ে ভাল লাগত, নতুন করে বেঁচে উঠতে ইচ্ছে হত, যেগুলো পড়ে মনে হত যেন কোন একটি মেয়ে, একটি শান্ত স্নিগ্ধতার শরীর, একটি উজ্জ্বল গভীর মন, আমাকেই লিখেছে, আমাকে। আমার সমস্ত অতৃপ্তি আর শূন্যতা ভরে যেত।

অলক সেই বাণ্ডিলটা সামনে রাখল। তারপর দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বলল, সব শেষ হয়ে গেল আনন্দ, সব শেষ।

বলে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাকে একটা দিল, একটা প্যাকেটের গায়ে ঠুকে ঠুকে নিজের ঠোঁটে চেপে রইল। তারপর অনেকক্ষণ কি যেন ভাবল ও।

দেশলাই বের করে ফস করে একটা কাঠি জ্বেলে আমার সিগারেটটা ও ধরিয়ে দিল, নিজেরটা ধরাল।

কে সি দাশের মাথায়, একেবারে আকাশ ছুঁয়ে আলো জ্বলে জ্বলে তখন খেলার খবর লেখা হয়ে যাচ্ছে, খবর জ্বলে উঠছে এক এক লাইন।

কিন্তু আমার সেদিকে কোন আগ্রহ নেই তখন।

অলক আবার বলল, আজ রাত্রেই সব শেষ হয়ে গেল।

—আজ রাত্রে? আমি চমকে উঠলাম।

—হ্যাঁ। আজ স্বর্ণর বিয়ে।

আমার মনে হল আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমার মনে হল আমার শরীরে কোন শক্তি নেই, আমি ভেঙে পড়েছি। 'সব শেষ হয়ে গেল', কথাটা বারবার আমার কানের কাছে বাজল। আমার মনে হল যেন আমি নিজেই আমার কোন প্রেমিকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। মনে হল কেউ আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ শুষে নিয়ে চলে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি স্বর্ণকে কোনদিন দেখি নি, চিনি না, তার কণ্ঠস্বরও আমার অচেনা, তবু আমি যেন নিজেরই অজান্তে তাকে কখন ভালবেসে ফেলেছিলাম।

অলক সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান দিল, তার পর ফস্ করে আরেকটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে চিঠির বাণ্ডিলটা তার ওপর ধরল।

—অলক! আমি চিৎকার করে উঠলাম।

আমি চিঠির বাণ্ডিলটা দ্রুত হাতে কেড়ে নিলাম।

বললাম, এ কি করছিস অলক?

অলকের মুখ আবছা দেখা যাচ্ছিল। মনে হল একটা অসহ্য যন্ত্রণাকে ও বুকের মধ্যে চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

ও অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইল। তারপর বললে, দে আনন্দ, পুড়িয়ে শেষ করে দিই। ওগুলোকে বড় ভয় আমার। কাছে থাকলে জানি না কবে কি করে বসি। ছি ছি, শেষে স্বর্ণর যদি কোন ক্ষতি করে বসি, যদি রেগে পাগল হয়ে গিয়ে···

আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। বললাম, তোর ভয় নেই, এগুলো আমার কাছে থাক্। যখন এ চিঠিগুলোকে তোর আর কোন ভয় থাকবে না, যখন জ্বালা জুড়িয়ে গিয়ে শুধু একটা মিষ্টি স্মৃতি হয়ে থাকবে চিঠিগুলো, তখন তোকে এগুলো দিয়ে দেব।

অলক আর স্বর্ণর চিঠিগুলো ফেরত চায় নি। নাকি একবার চেয়েছিল আমি খুঁজে পাচ্ছি না এই অজুহাতে ফেরত দিই নি।

এ চিঠিগুলো যে তখন আমার, আমারই। কতদিন কতবার যে পড়েছি, কতবার লিখে দেওয়া উত্তরের লাইনগুলো মনে পড়েছে।

এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি স্বর্ণকে দেখেছি, আমি স্বর্ণকে চিনি, স্বর্ণর কথা শুনেছি, ঐ তো হেসে হেসে কত মিষ্টি করে ও বলছে, এই, তুমি শরীরের যত্ন নিচ্ছ না কেন বলত! এই, তুমি ও-ভাবে চলন্ত বাস থেকে কোনদিন নামবে না।

আজ অলক কোথায় চলে গেছে জানি না। অলক কি করে, কোথায় আছে, বেঁচে আছে কিনা কিছুই জানি না। কয়েকটা যুগ পার হয়ে গেছে। অলক আজ দূরে সরে গেছে, অনেক দূরে।

কিন্তু স্বর্ণ আজও আমার কাছে কাছে, আমার পাশে পাশে। যেদিনই নিজেকে নিঃস্ব মনে হয়, যেদিনই কোন গভীর বেদনা আমার বুকে পাথর হয়ে চেপে বসে, সেদিনই স্বর্ণর সেই চিঠিগুলো বের করে খুলে দেখি, পড়ি।

আর মনে মনে কল্পনায় ভাবতে ইচ্ছে করে, স্বর্ণ কোথায় জানি না, অনেক দূরে, অনেক বিস্মৃতি পেরিয়ে কোন এক অশান্ত অতৃপ্ত মুহূর্তে তার স্বামী-সন্তানদের লুকিয়ে হয়তো, হয়তো তার ভাঙা তোরঙের নীচে থেকে দুপুরের নির্জনতায় আমার লেখা চিঠিগুলো খুঁজে বের করে, সে-চিঠি পড়ে। পড়তে পড়তে···অলকের চেহারা এখন নিশ্চয় তার কাছে ঝাপসা হয়ে গেছে, অলককে সে ছুঁতে পারে না, চিঠিগুলো পড়তে পড়তে তাই কোন এক সময় আমার লেখা তারা-ফুল-কাশ-আকাশ গভীর যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে আমাকেই ছুঁয়ে যায়। আমাকে।

ঠিক যেভাবে আজও আমি মাঝে মাঝে স্বর্ণর চিঠিগুলো···

তবে কি আমরা যখন গল্প লিখি, গল্প পড়ি, তখন এমনি কোন অদেখা স্বর্ণ আর বিস্মৃত অলকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই!

একটি হাসপাতালের জন্ম ও মৃত্যু

১

স্নেহের অনন্ত,

তোমার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম, কিন্তু নানা কাজের ব্যস্ততায় উত্তর দিতে পারি নি। তোমরা জান আমি ঠিকাদার মানুষ, ইট-সুরকি নিয়ে বাস করি। কিন্তু আমাদের গ্রামটির কথা আমার মন থেকে কখনও দূর হতে পারে না। শহরে বড় বড় বাড়ি বানান আমার কাজ হলেও খেলাই গ্রামের সেই মাটির ঘরের স্মৃতি কোনদিনই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। একটু অবসর পেলেই ওখানে ছুটে যাওয়ার জন্যে মন হাঁসফাঁস করে। তোমার পরের চিঠিতে জানলাম একটা হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজে তোমরা অনেকখানি এগিয়েছ। আমার কাছে দশ হাজার টাকা চেয়েছ, কিন্তু হয়তো বিশ্বাস করবে না, খরচ করার মত দশটা পয়সাও আমাদের কণ্ট্রাক্টরদের হাতে থাকে না। তবে যথাসাধ্য আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করব। কিন্তু গ্রামের ও আশেপাশের বড় জোতদার বা ব্যবসাদারদের দানে কোন কিছু গড়ে তোলার দিন কি এখন আর আছে? সে সব এখন আর সম্ভব নয়। সরকার যদি এদিকে মন না দেয়, তা হলে কিছুই হবার নয়। তোমরা বরং মন্ত্রী ধর, চারপাশের গ্রামের লোকদের দিয়ে দরখাস্ত করাও। চেষ্টা করলে সরকারী টাকায় বেশ বড় একটা হাসপাতাল ওখানে হতে পারে। তারপর আমি তো আছিই। ইতি

গুণময়দা

২

ঘুটুদা,

বারাসতের সেই ব্যাপারটা নিয়ে টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা হওয়ার পর একদিন যাব যাব করেও যেতে পারলাম না। তাই খেলাই গাঁয়ের এই

ছেলে কটিকে আপনার কাছে পাঠালাম। ওরা ওখানে একটা হাসপাতালের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, আমি বলেছি আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করব। স্বাধীনতার পর কত জায়গায় কত ইস্কুল-কলেজ-হাসপাতাল হল, অথচ আপনার গ্রাম কালিকাপুরের জন্যে কিছুই হল না। আপনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তার ওপর মন্ত্রী, আপনার পক্ষে, নিজের গ্রামের জন্যে কিছু করলে পক্ষপাতিত্ব মনে হবার সম্ভাবনা বলেই আপনি এদিকে নজর দেন নি, একদিন বলেছিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকদেরও তো একটা দাবী আছে। আপনি এদের কথা একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন আশা করছি। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

গুণময়

৩

অনন্ত,

ফুটুদার সঙ্গে তোমরা দেখা করার পর আমার কথাবার্তা হয়েছে। তোমরা হাজার পনের টাকা চাঁদা তুলতে পারলে বোধ হয় একটা সুরাহা হবে

খবর দিও মাঝে মাঝে। ইতি

গুণময়দা

৪

অনন্ত,

অনেকদিন তোমাদের চিঠি না পেয়ে ভেবেছিলাম তোমরা আশা ছেড়ে দিয়েছ। যাই হোক, টাকার প্রতিশ্রুতি যখন পেয়েছ তখন বাকী টাকাটা গভর্নমেণ্ট থেকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ফুটুদাদের কালিকাপুর থেকে আমাদের খেলাই পর্যন্ত বারো মাইলের মধ্যে একটাও হাসপাতাল নেই, গ্রামের লোকদের দুঃখকষ্ট ইত্যাদি জানিয়ে তোমরা খবরের কাগজে কয়েকখানা চিঠি ছাপানোর ব্যবস্থা কর। রমেশ নন্দীর ছেলে খবরের কাগজের লোক, তাকে গিয়ে ধরতে পার। ইতি

গুণময়দা

৫

অনন্ত,

খবরের কাগজের কাটিংগুলি পেলাম। আমাকে পাঠানোর দরকার ছিল না, আমি আগেই দেখেছি। তাই ফেরত পাঠালাম। এগুলি নিয়ে জগৎপুরের নিশা ভট্‌চাযের সঙ্গে দেখা কর। উনি যদিও আমাদের পাশের নির্বাচনকেন্দ্র থেকে বিধানসভায় এসেছেন, তবু খেলাইয়ের প্রতিবেশী গ্রামের লোক তো উনি। তাছাড়া বিরোধী পক্ষের সদস্য হিসাবে ওঁর পক্ষে হাসপাতালের অভাবের কথাটা তোলা অনেক সহজ। নিশাবাবুকে আমিও চিঠি দিলাম। ইতি

গুণময়দা

৬

অনন্ত,

কাল স্থটুদার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল। নিশাবাবু বিধানসভায় আলোচনার সময় বেশ বুদ্ধি করে বলে নিয়েছেন। স্থটুদার উত্তরটাও আশাপ্রদ। তোমরা দু একজন চিঠি পেয়েই স্থটুদার সঙ্গে দেখা কর। আর নিশাবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে এস। আমিও তাঁকে টেলিফোনে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ইতি

গুণময়দা

৭

স্থটুদা,

শেষ পর্যন্ত যে ব্যবস্থা হল, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা সত্যিই আপনার জন্যে এতকাল গর্ববোধ করে এসেছি। এখন আরও কৃতজ্ঞ রইলাম। আমার কর্মচারী শিবেনবাবু চিঠি নিয়ে যাচ্ছে, ওর কাছে সব শুনবেন। আপনার লিভারের ব্যথাটা এখন কমেছে কিনা জানাবেন। প্রতিদিন এক চামচ করে কালমেঘের রস খেয়ে দেখলে পারতেন। আমি উপকার পেয়েছিলাম। যদি না পান, আমাকে জানাবেন, প্রতিদিন টাটকা কালমেঘ পাঠানোর ব্যবস্থা করব। পরের সপ্তাহেই দেখা করছি। ইতি

গুণময়

প্রিয় শিবেন,

আমি রাঁচি থেকে এ সপ্তাহে ফিরতে পারব না। বারাসতের কাজ কতদূর এগিয়েছে, সিমেন্ট রাখার কি ব্যবস্থা করলে, যতীনবাবু ইস্কুলবাড়ির প্ল্যান সাবমিট করেছেন কিনা সব জানাবে। আর মুটুদার সেক্রেটারী ভদ্রলোক—নামটা ভুলে গেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করে খেলাইয়ের হাসপাতালের অর্ডার ইস্যু করার জন্যে তাগাদা দেবে। একটু চা-টা খাইও। ইতি

গুণময় সেন

৯

যতীনবাবু,

আমার ফিরতে আরও তিন চারদিন লাগবে। এখানকার বিলটা আদায় হলেই যাব। কাজ করে টাকা আদায় করা এক সমস্যা। ব্যবসাপত্র গুটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। যাই হোক, আপনার ইস্কুলবাড়ির প্ল্যানটা ওদের খুব পছন্দ হয়েছে শুনলাম।

আমাদের খেলাই গ্রামের মাঠে বড় রাস্তার ধারে একটা বড় হাসপাতাল হবার সম্ভাবনা আছে। সরকারী আপিসের কাজ তো জানেন, কত টাকা মোট খরচ হবে ঠিক করতেই আঠার মাস লাগবে। অতএব আপনি একটা প্ল্যান এঁকে রেডি করে রাখুন, লাখ দেড়েক টাকার মত খরচ করাতে চাই। হাতের কাছে প্ল্যানটা ফেলে দিয়ে অর্ডার পাস করান সহজ হবে।

আজ সকালে শিবেন ট্রাঙ্ক কল করেছিল, তাকেও বুঝিয়ে দিয়েছি। ইতি

গুণময় সেন

১০

মুটুদা,

শিবেনকে আপনার কাছে হাসপাতালের প্ল্যান সমেত পাঠালাম। আপনি একটু দেখবেন। আপনাদের ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে প্ল্যান করাতে গেলে আমরা আর হাসপাতাল দেখে যেতে পারব না। তাই নিজের খরচেই করালাম। প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম যখন উপকৃত হবে, তখন প্ল্যানের খরচ না হয় আমিই দিলাম।

আমি কাল রাঁচি থেকে ফিরেছি। আজ রিষড়া যাচ্ছি। দু দিন থাকব। ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টে আপনি একটু বলে দেবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানবেন। ইতি

গুণময়

পুঃ—আপনার নির্দেশমত শঙ্করের চাকরির কথা কলিন সাহেবকে বলেছি। বোধ করি হয়ে যাবে।

১১

শিবেন,

আমাদের করা হাসপাতালের প্ল্যানটা একটু অদলবদল করে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে জেনে খুশী হলাম। টেণ্ডার ইনভাইট করে কবে বিজ্ঞাপন বের হবে আগে থেকে জেনে নিও। অদলবদল হওয়ার ফলে এষ্টিমেট কি দাঁড়াবে যতীনবাবুকে ভাল করে হিসেব করতে বলবে। খাঁকতি আজকাল সবারই বেড়ে যাচ্ছে, সেদিকটা মনে রাখতে বলবে। বসন্তবাবু লোকটাকে না ট্র্যান্সফার করাতে পারলে চলছে না। সামান্য এটুকু কাজের জন্যে এত টাকা? ইতি

গুণময়

১২

বসন্তবাবু,

শিবেনবাবুকে আপনার কাছে পাঠালাম। শুনবেন। আপনি চিরকালই আমার উপকারী বন্ধু, কৃতজ্ঞচিত্তে সে কথা আমি চিরকাল মনে রাখব। কে কে টেণ্ডার দেবে আন্দাজ পেলে অনুগ্রহ করে জানবেন। আর চিনি চাই? ইতি

গুণময়বাবু

১৩

শিবেন,

পরশুদিন দুর্গাপুর থেকে ফিরতে পারব আশা করছি। কিন্তু তার আগেই খেলাইয়ের হাসপাতালের টেণ্ডার সাবমিট করতে হবে। বসন্তবাবুর সঙ্গে ভিতরের খবর পেয়ে যতীনবাবুকে ফ্রেস এষ্টিমেট দিতে বলবে।

রিষড়ার বিলটা পাশ করাতে একবার যেতে হবে তোমাকে। আমি সেবার টু পারসেন্টের বেশী রাজি হই নি। তুমি দরকার হলে একটু বাড়িও। ইতি

গুণময় সেন

১৪

শিবেন,

টেণ্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে জেনে খুশী হলাম। স্থটুদা কি কিছু বলে দিয়েছিলেন? ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্তর সঙ্গে তুমি এখনও আলাপ করে উঠতে পার নি কেন বুঝলাম না। অত্যন্ত অন্যায় করছ। কাজটা হাতে পাওয়ার আগেই আলাপ জমিয়ে রাখলে হত। এখন গেলে শুধুই টাকা পয়সার সম্পর্ক। ইতি

গুণময় সেন

১৫

অনন্ত,

অনেকদিন তোমাদের কোন খবরাখবর নেই। তোমরা কি আমাকে ভুলে গেলে? অথচ তোমাদের উৎসাহ দেখেই হাসপাতালের জন্যে আমি আজ ন মাস ধরে কি পরিশ্রম করেছি ভাবতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল হচ্ছে। যদিও গ্রামের হাসপাতালের বাড়িটা বানিয়ে ব্যবসায় বিশেষ কোন লাভই হবে না, তবু এ কাজটা আমি নিজে হাতে নিয়েছি। ঠিকাদারদের কোন বিশ্বাস নেই, জান তো। শেষে এত চেষ্টায় একটা হাসপাতাল স্যাংশন করিয়ে দু দিনে ধসে পড়বে এ আমি চাই নি। তাই কাজটা নিজেই নিয়েছি।

তোমরা একটু সহযোগিতা কর। ইতি

গুণময়দা

১৬

শ্রদ্ধেয় নিশাবাবু,

অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। সাত কাজে এত ব্যস্ত থাকি যে সময় করে উঠতে পারি না। আজকাল কণ্ট্রাক্টারদের অবস্থা তো

জানেন, সরকারী আপিসের পেয়াদা থেকে মন্ত্রী অবধি সবাই ধমক দেয়। আর পদে পদে হাত বাড়িয়েই আছে। আপনারা তবু মাঝে মাঝে দু একটা সত্যি কথা মুখের ওপর বলেন।

খেলাইয়ের হাসপাতালের কাজটা আমি নিয়েছি। লাভ হবে না, লাভ একমাত্র আমাদের ও তল্লাটে একটা বড় হাসপাতাল হবে। বুড়ো বয়সে ওখানে গিয়েই থাকব, আমার সাধ, তাই হাসপাতালটা যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করছি। তবে, জানেন তো, সব সময়ে সব কাজ নিজে দেখতে পারি না। কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। যদি হাসপাতালের কাজে কোন ভুল ভ্রান্তি দেখেন, দয়া করে কোন হৈ চৈ করবেন না। আমাকে জানাবেন, আমি ঠিক করে দেব।

সেদিন হঠাৎ কিছু গলদা চিংড়ি পেয়ে গেলাম, আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। খারাপ হয়ে যায় নি তো? ইতি

গুণময় সেন

১৭

শিবেন,

ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার দাসগুপ্ত দিনকয়েক কোলকাতায় থাকবেন, ওঁকে কারনানি ম্যানশনের ফ্ল্যাটটা খুলে দিও, বগলাকে কাজকর্ম করে দিতে বল। আর সব আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করে দিও। ইতি

গুণময় সেন

১৮

অনন্ত,

তুমি খেলাইয়ের ছেলে, আমিও খেলাইয়ের ছেলে। তোমার বাবা ও আমার বাবার মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল, আমি আজও ভুলি নি। তাছাড়া এই হাসপাতালের জন্যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তুমি জান না। সরকারী আপিসে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে একটা চিঠি সরতে তিন মাস লাগে। আমরা কন্ট্রাক্টররা চেষ্টা করি বলেই সেগুলো নড়াচড়া করে। এদেশে যদি কিছু কাজ হয়ে থাকে তা আমাদেরই চেষ্টায়। এর জন্যে এরই মধ্যে কত টাকা জলে গেছে তার হিসেবও জানি না। তবে সে টাকা জলে যায় নি বলে মনে করি, কারণ নিজের গ্রামের কাছে একটা এত বড়

হাসপাতাল হচ্ছে এইটুকুই আনন্দ। অন্তত পাশাপাশি পঞ্চাশটা গ্রাম ও থেকে উপকার পাবে।

শুনলাম ছেলেদের দল নাকি আমার রাজমিস্ত্রী ও ওভারসিয়ারদের নানাভাবে উত্যক্ত করছে। তামরা এর বিহিত কর। আর ইটের কোয়ালিটি, দরজা জানালার কাঠ ইত্যাদি নিয়ে তাদের বাজে প্রশ্ন করার কোন মানে হয় না। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, মিস্ত্রীরাই যদি জানত, তা হলে তারাই তো কণ্ট্রাক্টর হয়ে যেত। বিশ্বাস রেখ, আমার গ্রামকে অন্তত আমি ঠকাব না। তা ছাড়া ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্ত নিয়মিত ইন্সপেকশনে যাচ্ছেন।

তোমাদের সহযোগিতা কামনা করি। ইতি

গুণময়দা

পুঃ—হাসপাতাল সম্পূর্ণ হতে দাও, তখন দেখলে তোমরাও খুশী হবে। এখন খুঁটিনাটি ব্যাপারে বাধা দিলে শেষ অবধি হয়তো হাসপাতাল হওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

১৯

শিবেন,

ইঞ্জিনীয়ার দাশগুপ্তের জন্যে চারখানা ক্রিকেটের টিকিট যেভাবে পার যোগাড় করে তাঁকে পৌছে দেবে। ইতি

গুণময় সেন

অনন্ত,

তোমার চিঠি পেলাম, তুমি যে আমার কথা বুঝতে পেরেছ জেনে খুশী হলাম। আমার চিঠিতে আমি কি তোমার ওপর দোষারোপ করেছিলাম? আসলে আমার সন্দেহ বিরোধী পক্ষের সদস্য নিশা ভট্টচায কয়েকটি ছেলেকে নাচিয়েছিল। গভর্নমেণ্ট কোন ভাল কাজ করে, এ তো ওরা সহ্য করতে পারে না, যে কোন প্রকারে বাধা দিতে চায়। তোমরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা কর। ইতি

গুণময়দা

২১

শ্রদ্ধেয় নিশাবাবু,

কাল আপনার বাড়ি থেকে ফেরার পর আপনার কথাগুলি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। সত্যি, এ-ভাবে চললে এ দেশের কোন উপকার হওয়া সম্ভবই নয়, আপনাদের পার্টির ফাণ্ডে পাঁচ শো টাকা দিতে বলেছিলেন, আমি আজ শিবেনের হাতে এক হাজার টাকা পাঠালাম। আমার পক্ষে যেটুকু সাধ্য সেটুকুই বা করব না কেন। আপনারা হয়তো ভাবেন আমরা অনেক লাভ করি। কিন্তু ধারণাটা ভুল। একদিকে ট্যাক্স সতের রকমের, অন্যদিকে পদে পদে ঘুষ। ব্যবসা করতে ইচ্ছে হয় না। আর দিশি জিনিসের যা হাল হচ্ছে আজকাল, আমরা নিরুপায় বলে ব্যবহার করি, লোকে দোষ দেয়।

আগামী ইলেক্‌শনে আপনি আর দাঁড়াবেন না বলছিলেন। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ যে আপনার মুখ চেয়ে আছে এ-কথাটা ভুলবেন না। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।। ইতি গুণময় সেন

২২

মাই ডিয়ার দাশগুপ্ত,

লঞ্চে করে দিনকয়েক সুন্দরবনের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি, পাখি শিকার করা যাবে। ইট কাঠের জগৎ কি আপনারই ভাল লাগে, না আমার ভাল লাগে। মিসেস ও বাচ্চাদের নিয়ে চলুন না, ঘুরে আসি। খুব ভাল লাগবে।

মিসেসকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন, বাচ্চাদের আমার স্নেহ। ইতি

সেন

পুঃ—বেনারসীখানা মিসেসের পছন্দ হয়েছে কিনা জানাবেন।

২৩

ন্টুদা,

খেলাই-কালিকাপুর হাসপাতালের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু এবার বোধ হয় কাজ বন্ধ রাখতে হবে। প্রথম কিস্তির বিলটার এখনও পেমেণ্ট পেলাম না। অনেক চেষ্টা করেছি। মুকুজ্যে সাহেবকে একটু ফোনে বলে দিন না দয়া করে।

সেদিন আপনার ওখান থেকে আসার পর ভীষণ সর্দি কাশিতে কাহিল ছিলাম। আপনি কেমন আছেন? ইতি গুণময়

পুঃ—জমিটা কিনে ফেলুন বাড়ির জন্যে ভাববেন না।

২৪

শিবেন,

মুকুজ্যে সাহেব কি চায় স্পষ্টাস্পষ্টি জেনে নাও ক্লার্কটার কাছে। এই জন্যেই বলেছিলাম যতীনবাবুকে এষ্টিমেট বাড়িয়ে করতে।

রাঁচির ব্যাপারটা আই টি ও মূর্তি এটা কি করল ? হাতে মাথা কাটতে শুধু বাকি। ইতি

গুণময় সেন

২৫

শিবেন,

প্রথম কিস্তির টাকাটা পেমেণ্ট পেয়েছ জেনে খুশী হলাম। দাশগুপ্ত আবার পার্সেণ্টেজ বাড়াতে চায়। দিয়ে দিও, উপায় তো নেই। যত ঝামেলা আমরা পোয়াব আর লাভের ভাগ ওরাই পাঁচ ভূতে লুটেপুটে নেবে।

হাসপাতালের অ্যাকাউণ্টের একশ টন কাপুরকে দেবে। নগদ। ইতি

গুণময় সেন

২৬

শিবেন,

হাসপাতালের কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। আরও মিস্ত্রী লাগাও। দুর্গাপুরে আরেকটা টেণ্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সব বেকার বেকার বলে, অথচ কেউ কাজ করতে চায় না। লোক পেলেই নিয়ে নিও।

হাসপাতালের জানলা দরজাগুলো তাড়াতাড়ি রঙ করিয়ে দিও, আর চুনকাম। কে কখন এসে দেখে যাবে, শেষে কাঠের কোয়ালিটি নিয়ে গোলমাল করবে। ইতি

গুণময় সেন

২৭

অনন্ত,

তোমার চিঠি পেলাম। চারপাশের গ্রামের লোকে হাসপাতাল বাড়িটা দেখে খুশী হয়েছে জেনে আমিও খুশী হলাম।

আমার যেটুকু কর্তব্য সেইটুকুই করেছি। শুভেচ্ছা জেন। ইতি

গুণময়দা

২৮

শিবেন,

বসিরহাটের টেণ্ডার দেবার ব্যবস্থা কর। যতীনবাবুকে বলো মার্জিন বেশী রাখতে। খেলাইয়ের ব্যাপারে দেখলে তো এস্টিমেটের চেয়ে কত বেশী উপরি খরচ হয়ে গেল। এদিকে আবার ইনকাম ট্যাক্সের খাঁড়া ঝুলছে। ওদের তো ধারণা হাতে যা পাই সবই লাভ।

যাক্, খেলাইয়ের দ্বিতীয় বিলটার পেমেণ্ট পেয়েছ এই সান্ত্বনা। ইতি

গুণময় সেন

২৯

ভাই অনন্ত,

তোমার তিনখানি চিঠিই পেয়েছিলাম। এই এক মাস নানা কাজে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে উত্তর দিতে পারি নি। খেলাইয়ের হাসপাতালের যে কথা লিখেছ তা শুনে সত্যিই খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বল। যেটুকু ভার নিয়েছিলাম তা আমি করে দিয়েছি। শুনে আশ্চর্য হবে, এখনও তার সব টাকা পাই নি। তোমার মুটুদাকে ধর। উনি যদি কিছু করতে পারেন। অবশ্য উনিই বা কি করবেন। সরকারী ব্যাপারই এমনি। কণ্টাক্টরদের সকলে গালাগাল দেয়, বলে গভর্নমেণ্ট নিজে করলে নাকি অনেক ভাল হবে। দেখছ তো সরকারী আপিসের কাণ্ড। আমি হাসপাতালের বিল্ডিং তৈরীর দায়িত্ব নিয়েছিলাম, করে দিয়েছি। ডাক্তার, নার্স, যন্ত্রপাতি —এসব তো আমার কাজ নয়। যন্ত্রপাতি আর ওষুধপত্র যদি আসে শেষ অবধি, সেও জেনো কোন কণ্টাক্টরের কল্যাণে। এখন তো মনে হচ্ছে ডাক্তার নার্স যোগাড় করার কাজটার জন্যেও যদি টেণ্ডার ইনভাইট করে তবেই কাজ হবে।

এ-দেশে যেটুকু কাজ হয়েছে তা আমাদের চেষ্টায়। যেখানেই কণ্টাক্টর নেই, সেখানেই কাজ পড়ে থাকে। তোমরা মুটুদার সঙ্গেই দেখা কর। ইতি

গুণময়দা

৩০

শিবেন,

খেলাই হাসপাতালের সব পেমেণ্ট পেয়ে গেছ শুনে খুশী হলাম। বসিরহাটের টেণ্ডার অ্যাকসেপ্টেড হল কিনা জানাবে।

আমি এখন দুর্গাপুরেই থাকব। ইতি

গুণময় সেন

৩১

অনন্ত,

তোমার কয়েকখানা চিঠিই পর পব পেযেছি। আমার যা বলাব তা তোমাকে আগেই জানিয়েছি। ডাক্তার নার্সের ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।

লিখেছ, হাসপাতাল বিল্ডিযের একটা দেযাল ধসে পড়ছে। এ ব্যাপাবেও আমাদেব কিছু করার নেই। যথারীতি ইনস্পেকশন হযেছিল, তখন কেউ কোন ত্রুটি পায় নি। বাড়ির যত্ন না নিলে বাডি তো ধসে পডবেই। ইতি

গুণময়দা

৩২

অনন্ত,

তুমি বার বার আমাকে বিরক্ত করছ কেন বুঝলাম না। এ ব্যাপাবে আমার কিছুই করার নেই। ইতি

গুণময়দা

৩৩

শিবেন,

অনন্তর চিঠি এলেই ছিঁড়ে ফেলে দিও। বিডাইরেক্ট করে আমাকে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। ইতি

গুণময়

ড্রেসিং টেব্‌ল

অঙ্কের দিদিমণি বললেন, বেলা, তুমি কাল থেকে শাড়ি পরে আসবে।

শুনে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ক্লাশের অন্য সব মেয়ের দিকে তাকাতে আমার খুব লজ্জা করছিল। তা হলে কি আমি বড় হয়ে গেছি! মা আমাকে কিছুতেই শাড়ি পরতে দিত না। এক এক সময় আমার খুব রাগ হত। দিদি ও জামাইবাবুরা এসে যেবার আমাদের সকলকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল সেইবার শুধু দিদি আমাকে তার একটা ভাল শাড়ি দিয়ে বলেছিল, কি রে, শাড়ি পরতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব, তাই না?' সেদিন খুব সেজেছিলাম আমি। সাজতে আমার এত ভাল লাগে। আর মা সাজগোজ একদম পছন্দ করত না। মা বোধ হয় ভয় পেত, সাজগোজ করলেই রাস্তাঘাটে কোন ছেলের যদি আমাকে ভাল লেগে যায়, শাড়ি পরলে কেউ যদি মনে করে আমি বড় হয়েছি। আর যদি বড়দের দিকে ছেলেরা যেমন করে তাকায় তেমনিভাবে আমাকেও দেখে। এ নিয়ে ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আমরা খুব হাসাহাসি করতাম।

বাড়ি ফেরার সময় আমার কিন্তু ভয় কেটে গিয়েছিল। ভাবছিলাম, মা বেশ জব্দ হবে, এখন আর কিছু বলতেও পারবে না। কিন্তু রানীর কথা ভেবে মনটা একটু খারাপ হয়েছিল। আমরা প্রমোশন পাবার পর মাত্র দিনকয়েক ইস্কুলে আসছি, অঙ্কের দিদিমণি রানীকে ঠিক এমনিভাবে হঠাৎ একদিন বললেন, রানী, কাল থেকে তুমি শাড়ি পরে আসবে। তার মাস-কয়েক পরেই রানীর বিয়ে হয়ে গেল। আমারও যদি তেমনি হয়! না বাবা, এর মধ্যে ওসব কিছুতেই না, আমি পড়ব। পাস করব, গ্র্যাজুয়েট হব। মীনাপিসি গ্র্যাজুয়েট। গ্র্যাজুয়েট কাকে বলে আমি অবশ্য ঠিক জানতাম না।

দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে যেদিন সিনেমা গিয়েছিলাম সেদিন সবাই বলেছিল আমাকে নাকি খুব মানিয়েছে শাড়িটা, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আমার কেবলই নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কি করেই বা দেখব। আমাদের

বাড়িটা বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি। বাবা যে এত গরীব কেন……দুর্ গরীব না ছাই, বাবার কাছে সবই শুধু শৌখিনতা। যেন শৌখিন হওয়াটা খারাপ। তাই, একটা বড় আয়নাও ছিল না বাড়িতে। কি আর করি, দেয়ালে টাঙানো কাঠের ফ্রেমের ছোট্ট আয়নাতেই মুখ দেখে শখ মেটাতে হয়েছিল।

রানীর বিয়েতে গিয়ে আমি প্রথম ড্রেসিং টেব্‌ল দেখলাম। তার আগে শুধু সিনেমার ছবিতে দেখেছি। মীনাপিসিদের অবশ্য আলমারির কবাটে বেশ বড একটা আয়না ছিল। কিন্তু সত্যি সত্যি ড্রেসিং টেব্‌ল দেখলাম রানীব বিয়েতে। রানীর বাবা রানীকে বিয়েতে কত কি যে দিয়েছিল। এক গা জড়োয়া গয়না, খাট আলমারি ড্রেসিং টেব্‌ল। আমি সেদিনও খুব সেজেছিলাম, বানী ঠাট্টা করে বলেছিল, দেখিস ভাই, আমার বরটা যেন কেড়ে নিস না, যা দারুণ দেখাচ্ছে না তোকে! ইস্কুলের সব বন্ধুগুলো হেসে উঠেছিল। সব্বাই সায় দিয়েছিল। আব আমি বারবার ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে দিয়ে ঘুরে আসছিলাম, আডচোখে আড়চোখে নিজেকে দেখছিলাম। ঠিক মীনাপিসিদের বাডিতে গেলে যে-ভাবে আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখতাম তেমনিভাবে।

ড্রেসিং টেব্‌লের শখ আমার তখন থেকে।

তারপর তো কত কি হয়ে গেল, বাবা বদলি হল কলকাতায়, আমরা একবালপুরের বাসায় এসে উঠলাম। আমি পাস করে কলেজে ঢুকলাম। আর কলেজের বন্ধুরা কেউ জানত না, মাঝে মাঝেই আমি ইণ্টারভিউ দিতাম। হঠাৎ একদিন শুনি কি, আমার বিয়ে।

কোনদিন দাদা বৌদির সঙ্গে, কোনদিন দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে তখন বিয়ের বাজার করে বেডাচ্ছি। বিয়ের চেয়ে বিয়ে-বিয়ে ভাবটাই ভাল। তখন সবাই আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমার কোন শাড়িটা পছন্দ, নেকলেসের কোন ডিজাইনটা আমার চাই, কি কি সাধ আছে। বর পছন্দর কথাটা অবশ্য কেউ জিগ্যেস করে নি, না করুক, ঠকি নি। ওকে আমার সত্যি খুব মনে লেগেছিল। তা, সব যখন কেনাকাটা হচ্ছে, আমি বাবাকে বললাম, আর কিছু দাও না দাও, একটা ড্রেসিং টেব্‌ল আমাকে দিতেই হবে। শুনে বাবা এমন অসহায়ের মত আমার মুখের দিকে তাকাল আমার কান্না পেয়ে গেল। বাঃ রে, একটাই তো শখ তাও দিতে পারবে না বাবা।

মা সেদিন রাত্তিরে ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ রে, বেলা, তুই নাকি ড্রেসিং টেব্‌ল চেয়েছিস বাবার কাছে ?

আমার তখন এতদিনের সাধটা মিটবে না বলে বিয়ে সম্বন্ধেই আর কোন উৎসাহ নেই। আমার মনে হল রানীর বিয়ের কাছে আমার বিয়েটা যেন বিয়েই নয়। অথচ রানীর তুলনায় আমি তো সত্যি সুন্দরী। ততদিনে আমি তো তা বুঝতেও শিখেছি।

আমার ভীষণ রাগ হল, আমি মার কথার উত্তরই দিলাম না।

মা আমার পিঠে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বলল, শোন বেলা, ওসব বলিস না। তোর বাবা কষ্ট পাবে। এমনিতেই দেড় হাজার টাকা বেশী খরচ হয়ে গেছে। তাছাড়া, ওরা গডরেজ চেয়েছে, রেডিও চেয়েছে······

কিন্তু আমি তো ও-সব কিছুই চাই নি। আমি সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে ভেবে রেখেছি, বিয়ের সময় একটা ড্রেসিং টেব্‌ল দিতে বলব বাবাকে। আমার কতদিনের ইচ্ছে অমনি গদি-মোড়া টুলে বসে আয়নার সামনে সাজব, টিপ্, লিপস্টিক, স্নো, ক্রীম সব টুকিটাকি সাজানো থাকবে সেখানে, ঘরময় খুঁজে বেড়াতে হবে না। আর বেশ আরামে চুলে চিরুনি দেব, চুল বাঁধব···চুলের জন্যে আমার কিন্তু বেশ গর্ব ছিল।

ও তো একদিন বলেছিল।

আমি নিজেই একদিন জিগ্যেস করেছিলাম, এই, আমাকে দেখে তোমার এত পছন্দ হয়ে গেল কেন বল তো? আমি তো একটুও দেখতে ভাল নই।

মিথ্যে করে বলেছিলাম অবশ্য। আমার চেয়ে যেন আরও কত সুন্দর মেয়ে ও পেত। পেলে আমাকে বিয়ে করতে যাবে কেন, শুনি।

ও শুনে কিন্তু মিটমিট করে হাসল। ওর হাসিটা এত সুন্দর, আর কি সরল! বলল কি, তোমার চোখ দেখেই······তুমি চটাস করে একবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকালে, যেদিন দেখতে গিয়েছিলাম, ব্যস একেবারে কাৎ, আর যখন চলে গেলে তোমার পিঠের দিকে তাকিয়ে······অমন সুন্দর চুল, একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে গেলাম।

আমার সেদিন ভালবাসায় একেবারে গলে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। তবু ইচ্ছে করেই ভুল বোঝার ভান করেছিলাম, জানি জানি, দেখতে যে ভাল নই সে আমি জানি। ওভাবে ঘুরিয়ে না বললেও চলত।

মিথ্যে মিথ্যে অভিমান দেখিয়ে ওর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে কি মজা যে লাগত!

আমি তো তখন খাটের ওপর বসে গল্প করছিলাম। আর ও শুয়েছিল। এমন পাজি না, হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, 'তাই বুঝি', আর তারপর আমাকে দু হাতে টেনে নিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিল। আর রাগ থাকে!

ও আদর করতে করতে বলল, সুন্দর কিনা ঠিকই জান, শুধু আমার মুখ থেকে শুনতে চাও।

আমি হেসে উঠে বললাম, বাঃ, আমি কি করে জানব, আমি কি নিজেকে দেখতে পাই?

আচ্ছা, নতুন বিয়ের পর 'এটা চাই, ওটা চাই' স্পষ্ট করে বলা যায়? কি জানি বাবা, আমার কিছু চাইতে লজ্জা করত। তাছাড়া ও তো বলতে পারত, 'কেন, আয়নায় দেখ না নিজেকে?' ব্যস্, তা হলেই ড্রেসিং টেব্‌লের কথাটা বলতে পারতাম।

ওদের বাড়িতেও ড্রেসিং টেব্‌ল ছিল না। মানে, বেশ ভাল ডিজাইনের বেশ বড় আয়না দেওয়া টেবিল না হলে তো আর ড্রেসিং টেব্‌ল বলে না। ওদের যেটা ছিল সেটাকে কি যে বলব ভেবে পাই না। একটা চারকোণা উঁচু টেবিলের ওপর একটা মাঝারি সাইজের আয়না বসান। আর সে আয়নার পিছনের পারা উঠে উঠে কালো কালো দাগ দেখা যেত। চিকেন পক্স সেরে যাওয়ার পর অমন ফর্সা মিঠলুকে যেমন লাগত ঠিক তেমনি। মিঠলু আমার ভাসুরের মেয়ে। মিঠলুর অত্যাচারে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার পাউডারে কৌটো ঢেলে ছড়িয়ে রাখবে, চন্দন সাবান এনে দিত ও, দু দিনেই শেষ. সোপ-কেসে একবাশ জল, সাবানটা যে গলে যাবে সে জ্ঞানও নেই, আর ঘুরছে ফিরছে আমার লিপস্টিকটা ঠোঁটে ঘষছে।

আমি একদিন খুব বকে দিয়েছিলাম মিঠলুকে।

আমার জা প্রথম প্রথম সত্যি আমাকে খুব ভালবাসত। ও মাঝে মাঝে একটু রাত, মানে এই সাড়ে নটা দশটায় ফিরত, আর তা দেখে জা বলত, হ্যাঁ রে ছোটকি, ঠাকুরপোকে একটু কড়কে দিতে পারিস না।

আমি হাসতাম।

এক একদিন জোর করে সিনেমা দেখতেও পাঠাত আমার জা। ওকে বলত, অত লজ্জা লজ্জা ভাল নয় ভাই, শেষে বৌটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তখন জা কে আমার খুব ভাল লাগত। তারপর ভাসুরের যখন আপিসে প্রোমোশন হল, মাইনে বাড়ল, তখন থেকেই একটু একটু করে কেমন যেন বদলে গেল। একটু একটু করে সমস্ত সংসারের কাজ আমার ওপর চাপিয়ে দিল। ও বেচারীও তাড়াহুড়ো করে আপিস যাবে, ক্লান্ত হয়ে ফিরবে, বাজার যাওয়া থেকে কলের মিস্ত্রি ডেকে আনা অবধি সব কাজ যেন ওর। আমার খুব রাগ হত। আসলে আমার তখন দিনরাত ওর কাছে কাছে থাকতে ইচ্ছে করত, গল্প করতে ইচ্ছে করত, কিন্তু সংসারের কাজ করতে গেলে তো তার সুযোগ মিলত না। ওকে বলতাম, সব কাজ তোমাকেই বা করতে হবে কেন! ও হেসে বলত, বাঃ রে, এতকাল করে এসেছি, এখন কি বলব, বউকে ছেড়ে যেতে পারব না? আমার কিন্তু অপমান অপমান লাগত। মনে হত, ও তো ভাসুরের মত বড় চাকরি করে না, মাইনে পায় কম, তাই অমন হেনস্থা।

এদিকে কাজ করে করে, তখন মন্টু হবে, আমার শরীর ভেঙে পড়ছিল। মাথা ঘুরত সব সময়, ক্লান্ত লাগত। অথচ আমার যে একটু বিশ্রাম দরকার, একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া দরকার এ সব বলব কি করে। খবরটা আমাদের দুজনের মধ্যেই গোপন রেখেছিলাম। আর কেউ জেনে যাবে, সে ভীষণ লজ্জা। আমি তো সাকে বৌদিকেও প্রথম প্রথম জানাই নি।

ও একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেল আমাকে। ওর সবেতেই লজ্জা। সবেতেই ভয়। বৌদি কি মনে করবে। ও তো পুরুষমানুষ, ওর এত লজ্জা কিসের, ওর এত ভয় কেন!

ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল, রক্ত কম শরীরে, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করুন। দুধ, মাখন, দুটো করে মুর্গীর ডিম···

বলা তো সোজা, খাই কি করে। ভাসুরের ছেলেমেয়েরা রয়েছে, শ্বশুর শাশুড়ি রয়েছে, তার ওপর মিঠলু তো একটা বিচ্ছু, আমাদের মধ্যে যে কথাই হোক ঠিক আড়ি পেতে শুনে নিয়ে সাত কাহন করে লাগাবে। লুকিয়ে লুকিয়ে মুর্গীর ডিম খাচ্ছি দেখলে কি বলে বসবে কে জানে। আমার নিজেরও নিজেকে বড় স্বার্থপর লাগছিল। তাছাড়া ও মানুষটাও তো খেটেখুটে আসে, ওরও তো দরকার।

ও বলল, এক কাজ কর, বাজার থেকে একটা করে মুর্গীর ডিম আনব, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে সেদ্ধ করে নিও।

আমি বললাম, তুমি না খেলে আমিই বা খাব কেন!

ও হেসে ফেলল। বললে, রোজ দুটো করে ডিম? আমি ফতুর হয়ে যাব।

আমি প্রথমে রাজী হই নি। কিন্তু ও একদিন রেগে গিয়ে বলল, নিজে তো মরবেই, ওটাকেও মারতে চাও? সেদিন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। যে আসছে তার কথা ভেবেই নয়, আমার মনে হল, দেখেছ, ও আমাকে কত ভালবাসে।

ওর কথা রাখতে আমি সত্যিই লুকিযে লুকিয়ে একটা করে মুর্গীর ডিম সেদ্ধ করে খেতে শুরু করলাম। উঃ সে কি অস্বস্তি। সারাক্ষণ ভয়, কে কোত্থেকে দেখে ফেলে। এক একদিন এমন হয়েছে মুর্গীব ডিমটা সেদ্ধ করার সময়ই পাই নি, এক একদিন ডিম সেদ্ধ করে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখেছি খেতে পারি নি।

শেষে একদিন ধরাই পড়ে গেলাম, মিঠলু দেখে ফেলল।

আমি জানতাম, আমার জা একদিন না একদিন কথা শোনাবেই। হয়তো সকলের সামনে ঠাট্টা করবে, হয়তো বলবে, তোর কি ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিচার নেই? ঘরের মধ্যে মুর্গীর ডিম খাচ্ছিস? কিন্তু জা-কে আমি এত ছোট ভাবি নি।

টাকাপয়সা নিয়ে কথা হতে হতে ওব সঙ্গে জায়ের কথা কাটাকাটি হল একদিন, আর জা দুম্ করে বলে বসল, যা দাও তা তো মুর্গীর ডিম কিনেই উশুল কবে নাও।

সেদিন আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। ছি ছি আমার জন্যেই তো ওকে এ কথা শুনতে হল। মুর্গীর ডিম তো ও নিজেই পয়সা দিয়ে কিনে আনত, আর জা ভাবল কিনা বাজারের পয়সা যা দিত সে, তার ভেতর থেকেই ডিম কেনা হয়।

আমি তারপর থেকে ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। জায়ের ওপর রাগ থেকে আমার ইচ্ছে হত কিচ্ছু খাব না আরও দুর্বল হব, কষ্ট পেতে পেতে আমি হঠাৎ একদিন মরে যাব। এমনিভাবে সকলের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হত। তার বদলে হঠাৎ একদিন মাকে চিঠি দিলাম আমাকে নিয়ে

যাবার জন্যে। আর দাদা আমাকে নিতে এসে বলল, এ কি চেহারা হয়েছে রে তোর!

এত সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল আমার, এত সুন্দর ছিলাম, তা হলে কি সত্যি দেখতে খুব বিচ্ছিরি হয়ে গেছি নাকি। টেবিলে বসান আয়নাটা ছিল জায়ের ঘরে, ভাসুর না থাকলে যেতাম আগে, কিন্তু ঝগড়াঝাটি হতে হতে আবহাওয়া যখন গরম হতে শুরু করল তখন থেকে আর যেতাম না। দাদার কথা শুনে সেদিন আমি ওর দাড়ি কামানোর আয়নাটাতেই মুখ দেখলাম ভাল করে। সত্যি তো, মুখটা এত রোগা, চোয়ালের হাড় দেখা যাচ্ছে···

মণ্টু হওয়ার পর আমি যখন বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলাম ও একদিন ফিস ফিস করে বলল—

ফিসফিস ছাড়া কথা বলার উপায়ই ছিল না। আড়ি পেতে কথা শোনা ওদের সব্বারই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

ও বলল, এই শোন, আমি ভাবছি এবার এখান থেকে উঠে গিয়ে আলাদা বাসা করব।

শুনে আমার এত ভাল লাগল। বাব্বা, বাঁচা যাবে এই নরক যন্ত্রণা থেকে; মুক্তি পাব। খাই না-খাই, নিজের ইচ্ছেয় চলে ফিরে বেড়াতে পারব।

ও মাঝে মাঝে বাসা খুঁজতে যেত বিজ্ঞাপন দেখে দেখে, এসে বলত কি কি সুবিধে, কি অসুবিধে।

ও কত কি কল্পনা করত, কি ভাবে ঘর সাজাবে, এই অল্প মাইনেতেও কি করে সুন্দর একটা সংসার চলে যাবে সে-সব কথা শুনতে শুনতে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

ও একদিন এসে বলল, একটা বাসা প্রায় ঠিক করে এসেছি, দাদাকে কালই বলে ফেলব।

এমনভাবে বলল যেন দাদাকে বলতে ওর খুব ভয়।

আমি কিন্তু সে সব কথা চিন্তার মধ্যেই আনলাম না। আমি ভুম করে বলে বসলাম, এই, নতুন বাসাতে গিয়ে তুমি একটা জিনিস আমাকে কিনে দেবে?

ও হেসে বলল কি?

—একটা ড্রেসিং টেব্‌ল। আমি হেসে ফেলে বললাম, আমার না এত সাজতে ইচ্ছে করে, একটা ড্রেসিং টেব্‌ল নেই বলে···

দোজবরে বর তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে এমনি ভাবে ও আমাকে বলল হবে হবে, একটু গুছিয়ে বসতে দাও আগে।

গুছিয়ে বসা যে এত কঠিন আমরা জানতাম না। আলাদা বাসা করা, আলাদা সংসার চালানো এত শক্ত!

মাসের প্রথম মাইনে পেয়ে ন খানা দশ টাকার নোট—কড়কড়ে নব্বইটা টাকা বাড়িওয়ালার হাতে তুলে দিতে কি যে কষ্ট তা আর বলে বোঝানো যায় না। কেবলই মনে হত বাকী মাসটা চলবে কি করে। হিসেব নিয়ে, টাকার অভাব, টাকার অভাব, টাকার কথা শুনলেই ও এক একদিন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত। অথচ আমিই বা কি করে চালাই। মণ্টু তখন কোলে, তার দুধ, ফলের রস, আমাদের র‍্যাশন বাজার, একটা পয়সাও তো বাজে খরচ কবি না। অথচ ও এমন ভাব করত যেন আমি শুধু আমার শাড়ি আর গয়না কিনছি।

ও এই সময়ে একটা ট্যুইশনি নিল। বলল, যা তিরিশ চল্লিশ টাকা পাওয়া যায়।

ওর শরীরও ভেঙে পড়ছিল। চোয়ালের হাড় দেখা যায়। ওর জন্যে আমার মায়া হত, কিন্তু ট্যুইশনিটা না করলে চলবেই বা কি করে।

ও বলল, ক্লাশ টেনের একটি মেয়েকে পড়াতে হবে দেবে তিরিশ টাকা।

—ছাত্রী? আমি বললাম, দেখতে কেমন?

ও হেসে বলল, খুব সুন্দরী, আর বুদ্ধিমতীও খুব।

ও ঠাট্টা করেই বলল। আমিও ঠাট্টা করলাম। কিন্তু ওব ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তবু রোজ ফিরে এসে, কিংবা যখন-তখন ও ওর ছাত্রীর কথা বলত। সে কি বলেছে, কি গল্প করেছে—

মনে মনে আমি কি ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম? জানি না। কিন্তু একদিন খেতে বসে ও যেই ওর ছাত্রীর কথা বলল, আমি রেগে গিয়ে বললাম, তুমি তাকে পড়াও কখন, রোজ যদি এত গল্প কর।

ও গুম হয়ে রইল, উত্তর দিল না।

আমি ভাবলাম, তবে কি আমার ওপর ওর আর কোন টান নেই। আমাকে ও আর ভালবাসে না? ঐ ছাত্রীটাকেই ও ভালবাসতে শুরু করে নি তো!

মাঝে মাঝে আমি বিকেলে স্নান করে একটু সাজগোজ করতে শুরু করলাম। ভাবলাম এইভাবেই হয়তো ওর মন পাব। ওর দাড়ি কামানো

আয়নার সামনে মেঝেয় বসে খোঁপা বাঁধতাম, ঘাড়ে ভিজে গামছা ঘষে মুখ মুছে কত যত্ন করে সিঁথেয় সিঁদুর দিতাম। কিন্তু নতুন শাড়ি পরে আমার সমস্ত শরীরটা কেমন দেখাচ্ছে, পিছনে গোড়ালি দিয়ে পাড়টা চেপে ধরে ঠিক ঠিক হল কিনা বুঝতে পারতাম না। তবু আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। একদিন রাস্তা দিয়ে একজন বেল ফুলের মালা বেচতে যাচ্ছিল, আমি একটা মালা কিনে খোঁপায় জড়ালাম। ও দেখলই না। আমি লক্ষ্য করছিলাম, ও আজকাল আর আমার দিকে ভাল করে তাকায় না।

এই সময়ে আমি মাসে মাসে পাঁচ দশ টাকা করে ওকে না জানিয়ে জমাতে শুরু করেছিলাম। কত কষ্টে যে জমাতাম আমিই জানি। আমার তখনও ইচ্ছে হত একটা ড্রেসিং টেব্‌ল কিনি। আমি একদিন পাশের বাড়ির রুমির মাকে জিগ্যেসও করেছিলাম। রুমিদের বাড়িতে একটা সাদামাঠা ড্রেসিং টেব্‌ল ছিল। রুমির মা বলল, দেড়শো টাকা।

আমার তাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল ঐ দেড়শো টাকা জমানো। ঐ দেড়শো টাকা জমিয়ে কিনব। আমার সেই ইস্কুলে পড়ার দিন থেকে, সেই রানীর বিয়েব দিন দেখে আসার পর থেকে সারা জীবন ধরে যে সাধটুকু লুকিয়ে রেখেছি সেটা মিটিয়ে ফেলব। সাতাশ বছর বয়সেও যদি সেটুকু মেটাতে না পারি তবে আর কবে মেটাব।

হ্যাঁ, সাধটা মনের মধ্যে পুরে রেখে সাধ্য যোগাড় করতে করতে কতবার অসুখ-বিসুখে কিংবা টানাটানিতে খরচ হয়ে গেছে। আবার নতুন করে জমাতে শুরু করেছি।

যে-মাসে সত্যি সত্যি দেড়শো টাকা হল সেদিন আমার কি আনন্দ। ঠিক করে ফেললাম, ও ফিরলেই ওকে বলব।

আঃ, একটা ড্রেসিং টেব্‌ল এতদিনে কিনতে পারব। সুন্দর একটা ড্রেসিং টেব্‌ল, বড় একটা আয়না থাকবে, স্নো ক্রিম পাউডার টিপ লিপস্টিক সব—সব কিনব, সাজিয়ে রাখব তার ড্রয়ারে। গদি-আঁটা টুলটায় বসে সাজব, শাড়ি বদলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করে দেখতে পাব···

ওর কত ছাত্র কত ছাত্রী এই ক বছরে বদলে বদলে গেল, কিন্তু আমাদের অবস্থা একটুও বদলাল না। ও তখন দু দুটো ট্যুইশনি সেরে রাত করে ফিরত। মন্টুর পড়াশুনো ও একটুও দেখত না। কখন দেখবে বেচারী!

আমি মণ্টুকে বললাম, এই ঘরে একটা ড্রেসিং টেব্‌ল হলে কেমন মানাবে বল তো!

মণ্টু তো এ গল্প কতবার শুনেছে, তবু খুশী হয়ে বলে উঠল, সত্যি কিনবে মা?

ওর বাবাকে সেদিনই এক সময় বললাম, এই, আমি অনেক টাকা জমিয়েছি, আমাকে সেই জিনিসটা কিনে দেবে?

ও বিরক্তির সঙ্গে তাকাল আমার দিকে।—জমিয়েছ? টাকা?

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু কিনে দেবে কিনা বল।

ও জিগ্যেস করলে, কি?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, একটা ড্রেসিং টেব্‌ল।

আর সঙ্গে সঙ্গে, আমি ভাবতেও পারি নি, ও বলে উঠল, যা চেহারা হয়েছে, আর ড্রেসিং টেব্‌ল কেনে না।

আমি লজ্জায় অপমানে চোখ বন্ধ করলাম। আমি একটাও কথা না বলে রান্নাঘরে চলে এলাম। পিঁড়িতে বসে কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তে আমি নিজের মনেই কাঁদলাম।

আর ও বেরিয়ে যেতেই আমি ছুটে এসে ওর দাড়ি কামানো আয়নাটায় নিজের মুখ দেখলাম। আরে আরে, আমি এত বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে গেছি। এত রোগা, রুগ্ন? আর আমার সেই কোমর পর্যন্ত লুটিয়ে পড়া চুল কোথায়! সিঁথির দু পাশের চুল ফিকে হয়ে হয়ে…

আমি আর নিজেকে দেখতে পারলাম না। বিছানার ওপব লুটিয়ে পড়ে আমি ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

ছুরি

কাঁটাতারের ঘেরা বাগানের মধ্যে ও আমার পাশেপাশে হেঁটে এসে পেয়ারা গাছটার নীচে দাঁড়াল।

ওকে কিছু দেখাতে ইচ্ছে হল।

একটা ডাল বেশ উঁচুতে, ডালে দু তিনটে পেয়ারা ঝুলছে। ওকে দেখালাম।

সরু কোমরের ওপর ক্রমশ ফেঁপে ওঠা শরীরটা হেসে উঠল। ও হাত বাড়িয়ে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে একটা পেয়ারা পাড়বার চেষ্টা করল। একবার লাফ দিয়ে ছুঁতে চেষ্টা করল। পারল না।

ওকে কিছু দেখাতে ইচ্ছে হল আমার।

আমি হাত বাড়িয়ে অনায়াসে পেয়ারাটা পেড়ে দিলাম। বেশ বড় একটা ডাঁশা পেয়ারা।

ও মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল, হাসল মিষ্টি করে, যেন মনে মনে বলল, অনেক উঁচুতে তোমার হাত যায়, তুমি অনেক উঁচুতে।

পেয়ারা গাছের নীচে পরিষ্কার ঘাস ছিল, ও ঘাসের ওপর বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে 'দ' হয়ে। আমিও বসলাম।

ওর ব্লাউজের মধ্যে আরও কিছু থাকতে পারে আমি ভাবি নি।

—দেখি দেখি, কি ওটা? আমি বলে উঠলাম।

ও টুপ করে ব্লাউজের বুকে হাত ডুবিয়ে ছোট্ট ছুরিটা ততক্ষণে বের করে ছুরির ফলাটা খুলে ফেলেছে। ছুরি বসিয়ে পেয়ারাটা দু ফালি করেছে।

বাঃ ছুরিটা খুব সুন্দর তো! হাতির দাঁতের মত রঙের ছুরির বাঁট, তাতে কারুকাজ রয়েছে। এত ছোট অথচ এত সুন্দর ছুরি আমি আগে কখনও দেখি নি।

—কোথায় পেলে? খুব সুন্দর তো। আমি হাত বাড়ালাম।

ও ছুরিটা দিল না, আধখানা পেয়ারা এগিয়ে দিল। বলল, ইস্ অসিতকেই দিই নি!

ঐ সুন্দর ছুরিটা সব সময়েই ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

যখনই দেখতে চাইতাম, ও ফলাটা বন্ধ করে টুপ করে ব্লাউজের বুকে ফেলে দিত। আমার খুব ইচ্ছে হত ওটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে। ইচ্ছে হত ব্লাউজের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে ওটা ছিনিয়ে আনতে। সাহস হত না।

একদিন ওদের বাড়িতে ও ছুবিটা নিয়ে আনারস কেটে কেটে দিচ্ছিল আমাকে।

বললাম, ছুরিটা দেখি।

—উঁহু। শুধু একটা শব্দ করল ও মুখে, আর সরে বসল, যাতে ছুরিটা কেড়ে নিতে না পারি। আমাব দিকে না তাকিয়ে ঈষৎ হাসি ছোঁয়ানো ঠোঁটে, অস্ফুটে বলল, অসিত কতবার বলে চেয়েছে। তাকেই দিই নি।

আমি প্লেটসুদ্ধ আনারস ঠেলে দিলাম। অসিতকে দিও। বলেই গটগট করে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

অসিতের সঙ্গে ওকে দেখলে, কিংবা অসিতের কথা ওর মুখে শুনলে আমার ভীষণ রাগ হত। বুকের ভিতবটা জ্বালা করত। অথচ ওর সঙ্গে কাঁটাতারে ঘেরা বাগানে ঘুবতে, পাশাপাশি হাঁটতে আমাব খুব ভাল লাগত।

একদিন ওদের বাড়ি থেকে চলে আসছি, বাগানের মধ্যে দিয়ে, লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে লোহাব ফটকের দিকে চলেছি, ও হঠাৎ বলল, এই দাঁড়াও।

ব্লাউজের ভেতর হাত ডুবিয়ে ছুরিটা বের করে ফটকের পাশের রজনীগন্ধার বেড থেকে গোটা কয়েক রজনীগন্ধা খচ্ খচ্ কবে কেটে ষ্টিকগুলো আমাকে দিল। তোমার টেবিলে রেখে দিও, কাল গিয়ে দেখে আসব। বলে হাসল।

আমি হাত বাড়িয়ে নিলাম। তারপর বললাম, ছুরিটা দাও না, দেখি একবার।

হাতিব দাঁতের মত ঘি ঘি রঙেব বাঁট ছুরিটার, সুন্দর কারুকাজ করা। আমার দেখতে খুব ইচ্ছে হল।

ও আমার চোখেব দিকে তাকাল করুণভাবে, কি যেন বলতে চাইল, তারপর সত্যি সত্যি ছুরিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, নাও; তোমাকেই দিলাম, অসিতকেও দিই নি কোনদিন। বলে মুগ্ধচোখে হাসল।

আর আমি অসিতের নাম শুনেই ছুরিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে, ছুরির ফলাটা তখনও খোলা, ঝট্ করে সেটা ফিরিয়ে দিলাম ওর বুকে।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুল, ও বিমূঢ় চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল, বুকের ওপর হাত বুলিয়ে রক্ত মাখা হাতটা দেখল বিস্ফারিত চোখে, তার পর ছুটে পালাল। আমার হাতে তখনও রজনীগন্ধার স্টিকগুলো।

আমার ধারণা হয়েছিল ছুরিটা ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি। সেই কুড়ি বছর আগের দিনটিতে। কিন্তু এখনও যখন একা থাকি, হঠাৎ গেঞ্জির ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরতে হয়। দুটো পাঁজরের ফাঁকে আটকে থাকা ছুরি ফলাটায় বড় ব্যথা লাগে। মনে হয়, আসলে ওটা চুরি করে রেখেই দিয়েছি।

অটোগ্রাফ

আমার একটা অটোগ্রাফের খাতা ছিল। বাবা ওটা দিদিকেই কিনে দিয়েছিল। তখন দিদি আমাকে খাতাটা ছুঁতেই দিত না। বিয়ের পর দিদি যখন শ্বশুর বাড়ি চলে যাচ্ছে, ওর দেরাজের কাগজপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে অটোগ্রাফের খাতাটা বেরিয়ে পড়ল। আমি ঠাট্টা করে বললাম, কি রে দিদি, তোর মহামূল্য সম্পত্তিটা নিয়ে যাবি না? দিদি তখন শাড়ি গয়না গোছগাছ করতেই ব্যস্ত। তবু আমার কথা শুনে তাকাল, উঠে এসে খাতাটা হাতে নিল, তারপর মলাটের ওপর মায়ার মত করে হাত বুলিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টে উল্টে দেখে বলল, মলি, এটা তোকেই দিয়ে দিলাম।

খাতাটার অনেকগুলো পাতা তখনও সাদা।

ওটা পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল।

আমি তখন ক্লাস টেন-এ পড়ি, বাবাকে বললে হয়তো ওর চেয়ে আরও ভাল একটা অটোগ্রাফ খাতা আমাকে কিনেও দিত, কিন্তু প্রথম দিকের এ-সব লোকের সই কি আমি জোগাড় করতে পারতাম নাকি! দিদি আমার মত এতটা লাজুক ছিল না, অনেক জায়গায় যেত, মিটিং টিটিং-এ কিংবা খেলার মাঠে দিব্যি এগিয়ে গিয়ে অটোগ্রাফ জোগাড় করে আনত। আমি ওসব একটুও পারতাম না।

ঐ খাতাটার প্রথম পাতায় ছিল দিদিদের ইস্কুলের বড় দিদিমণির আশীর্বাণী গোছের কয়েক লাইন লেখা। ঐ টুকুর জন্যেই যা কিছু খুঁতখুঁতনি। তারপর পতৌদি, চুণী, গিনসবার্গ—আরও অনেক। প্রথম দিন পাতা উল্টে উল্টে শেষ অটোগ্রাফটায় এসে চোখ আটকে গিয়েছিল। দু লাইনের একটি কবিতা। ওঁর কবিতার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। কবিতা না ছড়া, আমি অতশত তখন বুঝতাম না। কিন্তু ও দু লাইন পড়েই মনে হয়েছিল ওর ফাঁকে ফাঁকে যেন কয়েকটা লাইন লুকিয়ে আছে। প্রথমবার পড়ে আমার খুব মজা লেগেছিল, হেসেও ফেলেছিলাম। আর আড়চোখে একবার বোধ হয় দিদির মুখের দিকেও তাকিয়ে ছিলাম।

দিদি চলে যাওয়ার পর আমার ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগত। মা বাবাও কেমন চুপ চুপ হয়ে গিয়েছিল। কথা বলত কম, আর যেটুকু বা বলত শুধু দিদি সম্পর্কে। বাবা একদিন মাকে বলছিল, 'মলিটা একদম মনমরা হয়ে গেছে'। শুনতে পেয়ে আমার কষ্ট হয়েছিল। চোখে জল এসে গিয়েছিল। সত্যি, দিদি চলে যাওয়ায় আমার একটুও ভাল লাগত না। আমরা দু বোনে কত আনন্দেই না ছিলাম।

দিদির কথা ভাবতে গেলেই ঐ অটোগ্রাফ খাতাটার কথা আমার মনে পড়ে যেত আর খাতাটার কথা মনে পড়লেই সেই দু লাইন কবিতার কথাও।

আমার হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিল, আচ্ছা, ঐ কবিতার পর দিদি আর কোন অটোগ্রাফ জোগাড় করে নি কেন? ওর অটোগ্রাফের নেশা কেটে গেল কেন?

এখন তো খাতাটা আমিও হারিয়ে ফেলেছি, পর পর বেশ কয়েকটি সই টই জোগাড় করার পর আমারও নেশা তো হঠাৎ কেটে গিয়েছিল। তা হোক, সেই দু লাইন কবিতা আমি এখনও মনে করে রেখেছি।

অথচ আমার তো মনে করে রাখার কথা নয়। যদি সত্যি সত্যি ও দু লাইনের ফাঁকে আরও অনেক লাইন লেকে থাকে তা হলে দিদিরই মনে রাখার কথা।

দিদি একবার দিন পনেরর জন্যে দুর্গাপুর থেকে এসে আমাদের কাছে ছিল। সে সময় ওর মুখে সর্বদাই 'তোর সুশান্তদা,' 'তোর সুশান্তদা'। 'তোর সুশান্তদা' কি ভাতু রে, একদিন যা করেছে না' বলতে গিয়ে আসল কথাটা বলবে কি, হাসি থামাতেই পারে নি।

আমি কিন্তু দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে বের করতে চাইতাম।

আচ্ছা, দিদি কিভাবে ওঁর কাছে অটোগ্রাফ নিতে গিয়েছিল? একা, না আরও কেউ ছিল? দিদি কি এসে অটোগ্রাফটা বাবাকে দেখিয়েছিল, মাকে? কই আমার কাছে তো গল্প করে একদিনও বলে নি।

দিদি বসে বসে সেদিন সুশান্তদাকে চিঠি লিখছিল, আমি ইচ্ছে করে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দিদি হেসে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

আমি বললাম তোর বরের চিঠি দেখতে বয়ে গেছে আমার, দেখছিলাম কোন রঙের কালিতে লিখছিস।

বলেই আমি টেনে টেনে আবৃত্তি করলাম :

রঙিন কালির কলম এনো
এই কালি তো ফিকে
এই কালিতে সুখ নেইকো
মনেব কথা লিখে।

তাকিয়ে দেখলাম দিদিব মুখে কোন ভাবান্তবই হল না। ও তখন মন দিয়ে চিঠিই লিখছে।

আমাকে কেউ যদি এমন একটা অটোগ্রাফ দিত তা হলে আমি নিশ্চয় খুব লজ্জা পেতাম। অথচ কেন জানি না আমার কেমন ভাবতে ভাল লাগত ও দুটি লাইন যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। তখন অবধি আমি ওঁর নামই শুনেছি, ওঁব কবিতাটবিতা তখনও পড়ি নি। ওঁর সম্পর্কে আমাব কোন ধাবণাই ছিল না। তবু একদিন শুয়ে শুযে কল্পনা কবতে ভাল লেগেছিল, যেন আমি নিজেই অটোগ্রাফেব খাতাটা নিয়ে ওঁব সামনে ভযে জড়সড় হয়ে গিযে দাড়িয়েছি, আব উনি আমাব দিকে তাকিযে মৃদু হাসলেন, চোখে চোখ পড়ল, আমার বুকেব ভেতবটা থবথব কবে কেঁপে উঠে আনন্দ উপচে দিল, আব ঠিক তখনই আমাব কাছ থেকে কলম চেয়ে নিয়ে অটোগ্রাফেব ঐ দুটি লাইন উনি লিখে দিলেন।

মনে মনে তাই বললাম, দিদি, তুই খুব লাকি রে। সবাই বলে তুই খুব সুন্দর। সবাই বলে তুই খুব স্মার্ট। আব সেজন্যেই উনি বোধ হয় তোকে এমন সুন্দর একটা অটোগ্রাফ দিযেছিলেন। অথচ ঐ খাতাটা নিয়ে আমি যাঁর কাছেই গিযেছি তিনি হয় শুধুই সই দিয়েছেন, আর নয়ত বড বড কথা, যে সব কথা ধবা যায় না, ছোঁযা যায় না।

আচ্ছা, আমি কি তখন আমাব মনের ভেতবের কোন শূন্যতাকে ভবিয়ে তুলতে চাইছিলাম? তা না হলে সামান্য একটা অটোগ্রাফ নিয়ে কেই বা এত কথা ভাবে। হয়তো তাই। ঠিক ঠিক, এখন মনে পড়ছে, কলেজে ভর্তি হওযাব মাস কয়েক বাদেই খাতাটা হাবিয়ে গেল। কারণ, অনেকদিন আমি আর ঐ খাতাটার খোঁজই রাখি নি। আমার তখন অনেক বন্ধু, বাড়ির ছোট্ট গোল বারান্দার বাইরে তখন আমার অঢেল উঠোন—কলেজের কমনরুম, সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট। আমি, রুমা, জয়ন্তী, অলকা—সব জায়গায় আমরা

একসঙ্গে। জয়ন্তী তখন লুকিয়ে লুকিয়ে সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করত, একদিন ধরা পড়ে গেল আমাদের কাছে, তারপর আমাদের কাছে আর কিছুই লুকিয়ে রাখল না, বরং পোস্ট আপিস থেকে যখন সুপ্রকাশকে ফোন করত তখন আমাদের ডেকে নিয়ে যেত। আমরা ওর কথা শুনতাম, হাসাহাসি করতাম আর সুপ্রকাশকে টেলিফোনে কত মিথ্যে অজুহাতই না দিত জয়ন্তী। একদিন আমাকেও রিসিভার ধরে মিথ্যে সাক্ষী দিতে হয়েছিল।

জয়ন্তী শেষ অবধি সুপ্রকাশের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। আর সুপ্রকাশের কাছেই আমি ওঁর নাম শুনেছিলাম।

একটা কবিতা আবৃত্তি করে একদিন সুপ্রকাশ বলল, কার লেখা জান?

অলকা বলল, তোমার মত অত কবিতার খোঁজ রাখার আমাদের এখনও প্রয়োজন হয় নি।

রুমা হেসে বলল, কবিতাটবিতা আমি পড়িই না।

আমি বললাম, শুনে তো মনে হচ্ছে তোমারই লেখা।

সুপ্রকাশ হো হো করে হেসে উঠল। বলল, তা হলে তো জীবন ধন্য হয়ে যেত। এমন কবিতা একজনই লিখতে পারেন।

বলে তাঁর নামটা স্পষ্ট করে টেনে টেনে উচ্চারণ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ গর্বের গলায় বলে উঠলাম, জান সুপ্রকাশ, আমি কিন্তু ওঁকে চিনি। আমার কাছে ওঁর অটোগ্রাফ আছে।

আমি অবশ্য একটা ছোট্ট মিথ্যে কথা বলে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমি ওঁকে দেখেছি, আলাপ হয়েছে, অটোগ্রাফ নিয়েছি নিজেই। কিন্তু খুব মিথ্যে কথা কি বলেছিলাম? আমার কাছে তো সত্যিই ওঁর অটোগ্রাফ ছিল। আর ঐ দুটি লাইনের মধ্যে দিয়ে ওঁকে সত্যিই আমার খুব চেনা মনে হল।

সুপ্রকাশ তখন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। ও যখন আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিত তখন মুখে আগল রাখত না। আমরাই কি কম ইয়ার্কি ফাজলামি করতাম। আমরা যে সবাই সুপ্রকাশকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছিলাম আর সুপ্রকাশও যে আমাদের 'তুমি' বলত সে ঐ ইয়ার্কির ছলেই। কিন্তু সুপ্রকাশের মুখে ওঁর প্রশংসা শুনে আমার যেমন ভাল লেগেছিল তেমনি খারাপ লেগেছিল ও আমার কথাটাকে কোন আমল দিল না বলে। যেন অটোগ্রাফটার কোন দাম নেই, গর্ব করার মত কোন বিষয় নয়।

আমি তাই অস্বস্তি চাপা দেবার জন্যে সুপ্রকাশকে বললাম, তোমার কাছে ওঁর কোন কবিতার বই আছে?

জয়ন্তী বলল, আছে, আমার কাছে। দেব এখন।

প্রথম বইটা জয়ন্তীর কাছ থেকে নিয়েই পড়েছিলাম। তারপর একে একে তাঁর সব বই। সব কবিতা।

বই পড়ার নেশা হয়ে গিয়েছিল আমার ইস্কুল থেকেই—সব রকমের বই। কবিতার নেশা কলেজে এসে। কিন্তু ওঁর কবিতা আমি খুঁজে খুঁজে পড়তাম। যে কোন কাগজে ওঁর একটা কবিতা ছাপা হলেই সেটা আমার কাছে একটা বড় খবর হয়ে আসত। আর নির্জনে একা একা যখনই ওঁর কবিতা পড়তাম, মনে হত উনি যেন নির্জনে একা একা আমার সঙ্গে কথা বলছেন, আমার মনের গভীরে পৌঁছে গিয়ে আমার বুকের ভিতরের শূন্যতা, আমার চাপা কষ্ট আমার অতলান্ত দুঃখকে স্নেহের হাত দিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছেন। ওঁর কবিতার সবাঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে থাকত একটা তীব্র দুঃখ—যেটা আমারও। তাই কখনও সেই অদেখা কবির জন্য আমার মায়া হত কখনও মনে হত, তিনি আমাকে না দেখেও কি করে আমার মনের কথাগুলো এমন ভাবে কানে কানে শুনিয়ে যান।

ওঁর যে-কোন একটা নতুন কবিতা আবিষ্কার করতে পারলেই আমি জয়ন্তী কিংবা রুমাকে ডেকে পড়ে শোনাতাম। আবার কখনও ইচ্ছে হত ওঁকেই সরাসরি একটা চিঠি লিখে বসি।

দু' একদিন লিখেছি। কিন্তু সে চিঠি ঠিক মনের মত হয়ে ওঠে নি। ভয় হয়েছে এ চিঠি পড়ে তিনি হয়তো হাসবেন, হয়তো ছিঁড়ে ফেলবেন। অনুরাগীদের এমন চিঠি তো তিনি কতই পান। একটি তুচ্ছ মেয়ের উপচে পড়া প্রশস্তির কিই বা দাম আছে তাঁর কাছে।

তবু শেষ অবধি একটা চিঠি লিখেই ফেললাম। কারণ, তার একখানা বই নিয়ে অনেক রাত অবধি নাড়াচাড়া করতে করতে, বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে হঠাৎ ভূমিকার পাতাটায় চোখ পড়ল, ভূমিকার নীচে তাঁর বাড়ির ঠিকানা, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল উনি যেন আমার এই চিঠিটার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন—আমার, কিংবা আমার মতই অন্য কারও। তা না হলে ঠিকানাটা উনি দিয়েছেন কেন।

আমি বড় আলোটা জ্বেলে তখনই চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

আলো জ্বলছে টের পেয়ে মা পাশের ঘর থেকে বলল, শুয়ে পড় মলি, শুয়ে পড়। বেশী রাত জাগলে তোর শরীর খারাপ হয়।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তোমরা ঘুমোও তো, আমার কথা ভাবতে হবে না।

আসলে মা আমাকে সব সময়ই সন্দেহ করত। কিংবা আমারই দোষ, আমার মনে হত মা আমাকে সব সময়ই সন্দেহ করছে। যেন আমি জয়ন্তীর মত কোন ছেলে বন্ধু জুটিয়েছি, যেন রাত জেগে প্রেমপত্র লিখছি।

আমি ভেবেছিলাম চিঠিটা রুমা কিংবা জয়ন্তীকে দেখাব। কিন্তু শেষ অবধি দেখাতে ইচ্ছে হল না। আমার মনে হল, তাঁর কবিতা আমার ভাল লাগা, আমার চিঠি লিখতে ইচ্ছে হওয়া সবই আমার নিজস্ব। আমার একার।

আমি নিজে গিয়ে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে এলাম। আর তার পর থেকে অধৈর্য হযে কেবলই অপেক্ষা করা। যদি উত্তর আসে। বারবার চিঠির বাক্সটা হাতড়ে দেখি প্রতিদিন। এক একদিন ভাবি আজ নিশ্চয়ই উত্তর আসবে। তারপর হতাশায় আমাব যেন চোখ ঠেলে জল আসতে চায়। নিজেকে ভীষণ তুচ্ছ মনে হয়, যেন কারও কাছে কোনও দাম নেই আমার।

কিন্তু হঠাৎ একদিন উত্তর এল। সে কি আনন্দ আমার। সেই দ্বিতীয়বার ওঁর হাতের লেখা দেখলাম। কি সুন্দর হাতের লেখা, আর কি আন্তরিক সরল ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল।

আমি অধীর আনন্দে তখনই রুমাদের বাড়িতে ছুটে চলে গেলাম। ট্রাম থেকে নেমে হাঁটছি, তখনও আমার বুকের মধ্যে কি যেন হয়ে চলেছে।

—রুমা, তোদের আমি বলি নি। এই ছাখ।

আমি চিঠিটা এগিয়ে দিলাম। রুমা তর তর করে পড়ে শেষ করে মুগ্ধ চোখ তুলে বলল, চিঠি দিয়েছিলি? তুই কি লাকি রে!

জয়ন্তী ভীষণ খুশী হল। বলল, দেখিস, তুই যেন ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে যাস না।

আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীর কথাটা আমার খারাপ লাগল। মনে হল ওঁকে শ্রদ্ধার আসন থেকে ও যেন টেনে নামিয়ে দিচ্ছে।

জয়ন্তী বলল, দেখা করতে যাবি? চল না, আমরাও যাব।

কিন্তু আমি মনে মনে জানতাম, আমি ওদের একজনকেও সঙ্গে নিয়ে যাব না। অথচ একা যেতেও আমার ভীষণ ভয়। কি কথা বলব! কিই বা বলার আছে। যা বলতে চেয়েছি তা তো চিঠিতেই লেখা হয়ে গেছে।

আমি সেদিন বার বার কল্পনায় তাঁর ছবি আঁকতে চাইলাম। তাঁর ভাব ভঙ্গী, কথা বলা। চোখ বুজে স্বপ্ন গড়লাম, আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি তাঁর সামনে, দু হাত তুলে নমস্কার করলাম। তিনি মুগ্ধভাবে তাকালেন আমার দিকে, বললেন, আমার প্রকৃত সৌন্দর্য তুমিই ধরতে পেরেছ···তুমি···

উনি অবশ্য আমাকে দেখা করার কথা কিছুই লেখেন নি। তবু চিঠিটা পড়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম, দেখা করতে গেলে উনি বিরক্ত হবেন না। তা হলে কি আর এমন আন্তরিক চিঠি লিখতেন। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এই চিঠির ভাষায় কোথায় একটা অলিখিত আমন্ত্রণ রয়েছে।

আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না, আবার একটা চিঠি লিখব, না টেলিফোন করব। ওঁর চিঠির কাগজে ফোন নম্বর তো ছাপাই আছে। কিন্তু ফোনে কথা বলতে গিয়ে আমি নার্ভাস হয়ে যাব না তো!

ওঁকে চিঠি লিখতেই যেখানে এত ভয়, টেলিফোনে কথা বলব কি করে। এক একসময় মনে হচ্ছিল, দূর, মিথ্যে কল্পনা সব, ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পারব না।

তার চেয়ে চিঠি লেখাই ভাল। সঙ্গে সঙ্গে সেই হারিয়ে যাওয়া অটোগ্রাফ খাতার লাইটা মনে পড়ে গেল : এই কালিতে সুখ নেইকো মনের কথা লিখে। আচ্ছা সবুজ কিংবা লাল কিংবা ভায়োলেট কালিতে লিখলে কেমন হয়। কি জানি, উনি নিশ্চয় ছেলেমানুষ ভাববেন।

আসলে আমি কি একটা সম্ভাবনার কথা কিছু ভাবছিলাম?

কিন্তু কি সে সম্ভাবনা? কিসের এত ভয়? আমি তো তাঁর কাছে কিছুরই প্রার্থী নই। তবে?

প্রথম দিকে আমার তো শুধুই একটা কৌতুহল ছিল, আর কিছুই নয়। ক্রমে ক্রমে সেটা কিভাবে জানি না, কৃতজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল। কিংবা তার চেয়েও বেশী, তাকে আমি মনে মনে একান্ত আপন করে তুলেছিলাম। যখনই রুমা কিংবা জয়ন্তীদের সঙ্গে গল্প করতাম, কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করতাম, ওঁর কথা কোন না কোন ভাবে এসে যেত।

সেদিন মাসীমার বাড়ি গিয়েছি, দুপুরে ওখানেই খাওয়া দাওয়া করে

বিকেলে ফিরব, মাসীমা নীচের তলায় কি কাজে যেন ব্যস্ত, টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের দিকে চোখ যেতেই আমার ভীষণ লোভ হল। আমি দু দুবার রিসিভারের ওপর হাত রাখলাম, দু দুবারই হাত সরিয়ে নিলাম। আসলে আমি বোধহয় একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। অথচ রুমা জয়ন্তী ওরা একটুও নার্ভাস হয় না। ওরা একদিন পর পর কয়েকজন আধ-অচেনা লোককে দিব্যি ফোন করল, মজার মজার কথা বলল পরিচয় না জানিয়ে।

রিসিভারে অকারণেই হাত রেখেছিলাম, ফোন নম্বরটা তখন আর মনে নেই। তাই ফোন গাইডটা খুলে বসলাম, ওঁর নাম খুঁজে বের করলাম। ডায়াল করে বসলাম হঠাৎ। আর যখন রিং হচ্ছে তখন আমার বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে, উত্তেজনায় ভয়ে।

—হ্যালো। রিসিভার তুলে মেয়েলী গলায় কে একজন 'হ্যালো' বলল।

আমি ভেবেছিলাম রিসিভার উনিই তুলবেন। কেন ভেবেছিলাম তাও জানি না। তাই হঠাৎ মেয়েলী গলা শুনে কি বলব ঠিক করতে পারলাম না। কয়েক সেকেণ্ড আমি চুপ করে রইলাম। তারপর অনেক সাহস সঞ্চয় করে জিগ্যেস করলাম উনি আছেন কি না।

—তুমি কে বলছ? প্রশ্ন এল এবার, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও, দাঁড়াও, দিচ্ছি, কে বলছ?

আমি কিছু উত্তর দিয়েছিলাম কিনা মনে পড়ছে না। কিন্তু ততক্ষণে উনি এসে ফোন ধরেছেন।

আব কি সহজভাবে উনি কথা বললেন. আমার সব ভয় কেটে গেল।

আমি অনেকক্ষণ ধরে ওঁর সঙ্গে কথা বললাম। তারপর বললাম, একদিন দেখা করতে যাব, বিরক্ত হবেন না তো?

—না, না, বিরক্ত হব কেন, এস একদিন। উনি বললেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত মন এক আকাশ নানা রঙের বেলুন হয়ে উড়তে লাগল।

সেদিন আমার খুব সাজতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আবার ক্ষণে ক্ষণেই কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম। একবার ভাবলাম, সাজগোজ করে নিজেকে সুন্দর করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব। একবার ভাবলাম, উনি তো মানুষের ভিতর

অবধি দেখতে পান, বাইরের চেহারার কোন দামই তো নেই ওঁর কাছে।

আমি ভেবে নিয়েছিলাম, উনি যা কিছু জানতে চাইবেন, কিছুই লুকোব না। উনিই তো আমার সবচেয়ে আপন, ওঁর কাছে স-ব বলা যায়। ক্ষমা জয়ন্তীদের কাছে যা বলা যায় না, দীপঙ্করকেও যা বলতে পারি নি, সব-সব।

দীপঙ্কর সেই ছোট্ট বয়সে, আমার সতের বছর বয়সে যে শূন্যতা দিয়ে গিয়েছিল, ওঁর কবিতার সঙ্গী হতে না পারলে আর কি নিয়েই বা আমি বাঁচতাম।

ওর বাড়িটা যত কাছে এগিয়ে আসছিল ততই আমার পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ফিরে যাই। ফিরে যাই। অথচ অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি যা কিছু জানতে চাইবেন, আমার যা কিছু গোপন, জীবনের ঢাকনা খুলে দিয়ে সব প্রকাশ না করে দিলে যেন শান্তি নেই।

ওঁর জন্যে যখন অপেক্ষা করছি তখনও কি উত্তেজনা।

একটু পরেই যিনি এলেন তাঁকে বললাম, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

উনি বললেন, আমিই। বস, বস।

আমি ওকে প্রণাম করে চেয়ারটায় কোনরকমে জড়সড় হয়ে বসলাম।

উনি নাম জিগ্যেস করায় উত্তর দিলাম, শ্যামলী, শ্যামলী দত্ত।

কোথায় পড়, কোথায় থাক, খুব বই পড় বুঝি, মেয়েরা তো কবিতা পড়ে না

আমি হাসবার চেষ্টা করে বললাম, আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম একদিন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঃ তুমিই? বলে হাসলেন। জিগ্যেস করলেন, তুমি নিজেও বুঝি কবিতাটবিতা লেখ?

আমি বলে উঠলাম, না, না। আমি একজন পাঠিকা শুধু।

ওঁর আড়ষ্টভাব এবার যেন একটু স্বস্তি পেল।

আমি বললাম, আপনার কবিতা আমার ভীষণ ভাল লাগে। বললাম, আপনাকে এর আগে একটা চিঠি লিখেছিলাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই তো, মনে আছে। উনি হাসলেন।

আমি পর পর ওঁকে অনেক প্রশ্ন করলাম, কখন লেখেন, কিভাবে লেখেন।

তারপর হঠাৎ বললাম, আপনার একটা অটোগ্রাফ আছে আমার কাছে।

ছিল না, তখন সেই অটোগ্রাফের খাতাটা হারিয়ে গেছে তবু বললাম।

অটোগ্রাফের লাইন দুটো তো আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমি আবৃত্তি করে শোনালাম। বললাম আপনার লেখা।

উনি মৃদু হেসে ভাববার চেষ্টা করলেন। বললেন, আমার ? হবে হয়তো।

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে, নাকি মনে পড়িয়ে দেওয়ার জন্যে জানি না, বললাম, আমার দিদিকে দিয়েছিলেন অটোগ্রাফ।

এবারও উনি হাসলেন শুধু, কোন প্রশ্ন করলেন না। দিদির নামটা কিংবা কোথায় দিয়েছিলেন অটোগ্রাফটা সে কথাও জিগ্যেস করলেন না। আর আমার মনে হল এতদিন ধরে বানিয়ে রাখা আমার সব প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে, সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

একটুখানি চুপচাপ কাটল, আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিল, তাই বললাম, আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত করলাম।

—না, না, বিরক্ত কেন হব। ভদ্রতার মত শোনাল কথাটা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমি হঠাৎ আবার বললাম আচ্ছা, কখন লেখেন আপনি ?

উনি হাসলেন, জবাব দিলেন না। পরিবর্তে বললেন, বস, বস, একটু চা বলি তোমার জন্যে।

একটুক্ষণ পরেই চায়ের কাপ হাতে যিনি ঢুকলেন তিনি যে ওঁর স্ত্রী বুঝতে অসুবিধে হল না।

তিনি মৃদু হাসলেন, দু একটি কথা বললেন। তারপর উঠে পড়ে বললেন, তোমরা গল্প কর আমার এখন অনেক কাজ।

কিন্তু কি কথা বলব ? সব কথা যে তখন আমার ফুরিয়ে গেছে। সব প্রশ্ন যে তখন অবান্তর মনে হচ্ছে।

—তোমারই নাম কি বললে যেন, শ্যামলী, না ?

আমি ছেলেমানুষির গলায় বললাল, হ্যাঁ কিন্তু সবাই মলি বলে ডাকে।

উনি শুধু মাথাটা দু বার দোলালেন। কোন কথা বললেন না।

আমি হঠাৎ উঠে পড়লাম অস্বস্তি কাটাবার জন্যে। বললাম, এবার যাই।

উনিও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আবার এস।

আমি জানতাম আর কোনদিনই আমি আসব না। ওঁর কাছে আর কোনদিনই আমি ফিরে আসতে পারব না।

একটা অসীম শূন্যতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমার চোখ ঠেলে জল আসবার উপক্রম হল। মনে হল আমার কি যেন হারিয়ে গেছে, এই মাত্র আমি হারিয়ে ফেলেছি। ট্রামের ঘন্টিটা যেন দমকলের ঘন্টি হয়ে বাজছে আমার চারপাশে। যাঁকে এতদিন আমার পাশে পাশে অনুভব করেছি, আপন মনে হয়েছে, আজ কাছে গিয়ে তাঁকে দূরের মানুষ করে দিলাম। তাঁব সম্পর্কে আমার আর কোন কৌতূহল নেই।

কারণ আমার সম্পর্কে তার কোন কৌতূহলই নেই।

একুশ

আমি তখন একুশ। আমরা সকলেই।

এক এক বেঞ্চে পাঁচজন করে সেঁটে আছে, সুরঞ্জন কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে বলল, অশোক, অশোক! থার্টি সেভেন এসেছে।

সেটা বোধ হয় কলেজের তৃতীয় দিন। ডাইনে বাঁয়ে দু সারি নারায়ণী সেনা নিয়ে প্রফেসররা বসেন, রোল নম্বর ধরে ডাকেন, মেয়েরা দস্তার মত মুখ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে, নোট নেয়।

কেউ কারও নাম জানি না।

ভুলু বাঁদিক থেকে বলল, গোলাপী শাড়ি। ববি, গোলাপী শাড়ি।

যেন কারও কিছু বলে দেওয়া দরকার ছিল। যেন এক চুপ্‌ড়ি গাঁদাফুলের ভিড়ে একটি ছোট্ট লাল গোলাপ হারিয়ে যেতে পারে।

আমি কোন কথা বললাম না। ভুলু আমার ডাক নাম বলায় আমার একটু অস্বস্তি লাগল।

পি. এন. জি. সেদিনই প্রথম। আমাদের চোখ তখনও তাঁকে যাচাই করছিল।

তিনি বিশাল খাতাখানা খুলে রোল নাম্বারের বদলে নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন।

ছত্রিশটি নামের মধ্যে পাঁচ সাতটি মেয়েও ছিল। তারা উঠে দাঁড়িয়ে সীসের মত হেসে, উপস্থিতি জানিয়ে, পানকৌড়ির মত টুপ করে ভিড়ের মধ্যে ডুব দিয়েছিল। তাদের আসল নাম কেউ শোনে নি, মুখে মুখে নতুন নাম চালু করেছিল।

থার্টি সেভেনে এসে পি. এন. জি. তোৎলাতে শুরু করলেন। —দিশন··· দিশান···দিশ্যান···

রাত্তিরে গোলাপী কুঁড়ি ছিল, ভোরবেলায় হঠাৎ পাপড়ি মেলে লাল গোলাপ। থার্টি সেভেন ততক্ষণে ওঠে দাঁড়িয়েছে, তারা ঝরানো হাসি, গোলাপী শাড়ি তো নয়, গোলাপের পাপড়িতে ধরা ভোরের শিশিরের মত

মুখ। বললে, দিশন্তী লাহিড়ী স্যার। লাহিড়ী পদবীটা সেই মুহূর্তে লহরীর মত শোনাল।

কেউ কোন কথা বলল না, কেউ কেন টিপ্পনি কাটল না। কেউ নতুন নামে তাকে বিদ্রূপ করল না। ক্লাসসুদ্ধ সমস্ত তরুণের দল যেন 'একজন' যুবক—বিমুগ্ধ, রোমাঞ্চিত।

কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত কলেজ জুড়ে দিশন্তী, দিশন্তী। দিশন্তী কারও দিকে এক পলক চোখ ফেললে সে ধন্য হয়ে যাবে। দিশন্তী কোন ছেলের সঙ্গে দুটি কি একটি কথা বললে সমস্ত কলেজ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই ছেলেটির টুঁটি চেপে ধরবে।

কিন্তু কি ছিল দিশন্তীর! ছিপছিপে শরীর· সে তো অনেকেরই। এক মুঠো আবীর বাঁধা সাদা সিল্কের রুমালের মত রঙ। আছে, আরও অনেকের আছে।

কিন্তু ঐ চোখ কারও নেই, কোথাও নেই। ঐ চোখ একবার দেখলে ভুলে যাওয়ার উপায় নেই। ওর শরীর, মুখশ্রী, চলার ছন্দ, চুল—সব যেন ওর দুটি চোখকে সাজিয়ে রাখার ফুলদানী, মানান ফুলের তোড়া।

আমি একদিন বললাম দিশন্তীর চোখ দেখলে কি মনে হয় জানিস, ভুলু?

বললাম, দুটো ময়ূর মুখোমুখি।

আসলে আমি একটু আধটু ছবি আঁকতে পারতাম। নোট লেখার খাতার পিছনে একদিন অন্যমনস্কভাবে দিশন্তীর ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলাম। দিশন্তীর—মানে দিশন্তীর চোখের। চোখের মধ্যেই ও যেন সম্পূর্ণ, ওর নাম শুনলে শুধু চোখ দুটোই মনে পড়ে যেত। কিন্তু সেই চোখ হয়তো আঁকা যায় না। টানাটানা দুটি চোখের ঢলে পড়া ঢেউ আরও কয়েকটি রেখার মুখোমুখি দুটি ময়ূর হয়ে গিয়েছিল।

চটুল অথচ স্নিগ্ধ, সরল অথচ দীপ্ত সেই চোখের তারায় কি যেন জাদু ছিল?

সুরঞ্জন একদিন বলল, অশোক, হৃৎপিণ্ড তো একটা? বাঁদিকে থাকে?

আমি ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, দিশন্তীর দুটি চোখের দিকে তাকানোর পর থেকে আমার দুটো বুকের দুদিকেই ধুকধুক করছে অনবরত।

ভুলু বলল, দিশন্তীর ওপর তোর বড্ড লোভ।

লোভ! লোভ কথাটা এত কুৎসিত আমি জানতাম না। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল দিশন্তী বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় পা পিছলে পড়ে গেল। মনে হল ভুলু ইচ্ছে করে কলার খোসাটা ওখানে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

—রোল নাম্বার থার্টি সেভেন।

কেউ সাড়া দিল না। আমরা জানতাম কেউ দেবে না। করিডরে কড়িডরে আমরা সকাল থেকেই ঘুরে বেড়িয়েছি, মেয়েদের কমনরুমে ভিড করে দাঁড়ান হট্টগোলকে মনে হয়েছে একটা উপচে পড়া ডাস্টবীন। কারণ দিশন্তী সেদিন আসে নি।

আমাদের কারও সেদিন কিছু ভাল লাগল ন। আমাদের কারও ক্লাস করতে ইচ্ছে হল না। যেদিন নেহাতই দিশন্তীর সঙ্গে কোণাকুণি বসার মত বেঞ্চি পেতাম না সেদিনই ক্লাস পালাতাম। দিশন্তী আসে নি, দেখা গেল অর্ধেক ক্লাস ফাঁকা।

ক্যান্টিনে, চায়ের কেবিনে, কোথাও সেদিন আর স্বস্তি নেই।

আমি বললাম, বিরক্ত করিস নে, ভুলু।

সুরঞ্জন বলল, ধুৎ।

ভুলু বললে, শালা রাবিশ চা।

পরের দিনই দিশন্তী আবার এল, আমরা আবার নিজেদের ফিরে পেলাম। কিন্তু ও কিছুতেই যেন কারও দিকে চোখ তুলে তাকাত না। কিংবা কারও দিকে তাকাতে হলে চোখের তারাকে স্থির হতে হয়, দিশন্তীর চোখ সব সময় অস্থির।

আমার ইচ্ছে হত একবার, একবার অন্তত ওর চোখের সামনে পড়ব। দেখে দেখে মানুষের কতটুকুই বা আশ মেটে, দেখা দেওয়ার জন্যেই তো দেখা। উঁচু সিলিং, দীর্ঘ করিডরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে হঠাৎ দেখলাম দিশন্তী দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্য প্রান্ত থেকে আসছে। ভুলুকে সুরঞ্জনকে কনুইয়ের ইশারা দিয়ে এগিয়ে এলাম, কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই দিশন্তী প্রফেসরদের ঘরে ঢুকে পড়েছে, একটু পরেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে গিয়ে কমনরুমে।

কতবার সামনা সামনি পড়েছিও। কিন্তু…

—ও মাইরি নির্ঘাৎ ট্যারা। ভুলু ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল। বলেছিল, নিশ্চয় সোজাসুজি তাকায়, আমরা ধরতে পারি না।

আমি তখন একুশ। আমরা সকলেই।

আমাদের তখন আরেকটা মন ছিল, বয়সের মন। আমরা সবাই একটি একটি শরীরকে ভালবাসতে চাইতাম। একটি শরীরকে ভাল বাসতে পেতাম না বলে আমরা সকলের শরীরকে ভালবাসতাম।

দিশন্তীর বাড়ি থেকে একটা সুন্দর দু ঘোড়ার ল্যাণ্ডো গাড়ি আসত, স্কুল ফেরত ওর ছোট বোন ফ্রক-পরা হাসি নিয়ে বসে থাকত। মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ও লোহার ফটক পার হত, কাউকে হাত নেড়ে হাওয়ায় ভাসা কাশের মত ছন্দে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসত। চোখ তখন ছোট্ট বোন কিংবা কোচোয়ান কিংবা রাস্তার কোন মজা।

মৈনুদ্দিন ইশাভী একটা সাদা শেভ্রলে গাড়িতে আসত। পদ্মাবতী বড়ুয়া আসত একখানা রেসিং কারে। ঘোড়ার গাড়ি কলকাতার রাস্তায় তখন গ্যাসবাতির মতই নিবু নিবু, তবু ঝকঝকে ল্যাণ্ডোতে দিশন্তীকেই মানাত।

মেজবৌদি তার দিদির ছোট দেওরের বউ দেখে এসে বলল, চোখ দুটো বেশ বড় বড়, বেশ সুন্দর।

বললাম, ধুস্, কাকে সুন্দর চোখ বলে তোমরা দেখেছ? বড় বড় চোখ তো গরুর মতো। আমাদের ক্লাসে দিশন্তী লাহিড়ীর···

মেজবৌদি সবজান্তার হাসি হেসে বলল, আরে বোকা, ওরা সব এঁকে আসে।

আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে তো বেরোও নি, তুলসীর চারা তোমাদের কাছে বৃক্ষ। দিশন্তীর চোখ নাকি ড্রয়িং স্কুলের খাতা।

দিশন্তীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আমার গায়ে ছ্যাঁকা লাগত। আমি মেজবৌদিকে বোঝাতে চাইতাম সুন্দর বলতে চোখ বোঝায়, সুন্দর চোখ বলতে দিশন্তী। অথচ কি নির্দয় আর অকৃতজ্ঞ ত্যাখ মেয়েটা, একদিন চোখাচোখি তাকাল না, একটা কথা বলার সুযোগ দিল না।

এমনি সময় একদিন শুনলাম ক্লাসের অনিরুদ্ধর সঙ্গে ওর নাকি আলাপ হয়েছে।

অনিরুদ্ধর ওপর আমার খুব হিংসে হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশা জাগল। অনিরুদ্ধর সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে তখন আমাদের সঙ্গে আলাপেই বা বাধা কি।

কিন্তু দিশন্তী ছুটির পর চলে যেতেই আমাদের মন কেমন করতে করতে মন যেন কেমন হয়ে যেত। আমরা তখন শরীর দেখার নেশায় মেতে উঠতাম।

ভুলু একটার পর একটা ট্রাম ছেড়ে দিত।—এতখানি বসে বসে যেতে হলে পিঠ ব্যথা হয়ে যাবে মাইরি।

স্বরঞ্জন একটার পর একটা দোতলা বাস ছেড়ে দিত।—বাসটা শালা গল্‌স্‌ওয়ার্দির মত বোরিং।

আসলে তখন তো ট্রামে বাসে বসতে পাওয়া যেত, কিন্তু ও-সব তুচ্ছ সুখ-সুবিধে নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামায়।

—ভাখ ববি, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা কিচ্ছু নয়, চোখ টায়ার্ড হলেই শরীর ক্লান্ত। ভুলু বলত।

আসলে তখন আমাদের সকলের মনেই দেখার নেশা। এগিয়ে গিয়ে কথা বলার, আলাপ করার সাহস স্বরঞ্জনেরও ছিল না।

চক্ষু মৈত্রী বলে একটা কথা আছে না, প্রতিদিন কিংবা মাঝে মাঝেই দেখা হত তিন চারটি সুশ্রী চেহারার মেয়ের সঙ্গে। অর্থাৎ বাসস্টপে কিংবা ট্রামের সীটে তাদের দেখতে পেতাম। তারা দিশন্তীর মতো কৃপণ ছিল না, চোখ তুলে তাকাত দু একবার, কেউ কোনদিন মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসত। কিন্তু চোখে চোখেই তারা চেনা হয়ে গিয়েছিল।

কালো শাড়ি-পরা একটা ফর্সা মেয়ে চারটে চুয়াল্লিশে মাঝপথে উঠত। স্বরঞ্জন ঘড়ি ধরে একদিন আধঘণ্টা পায়চারী করে তবে বাসে উঠেছিল। তারপর থেকে রোজ। কখনও দেখা পেত, কখনও পেত না।

একদিন স্বরঞ্জন আসে নি, কিন্তু মেয়েটা আমাদের দেখতে পেয়েই ভিড়ের মধ্যে স্বরঞ্জনকে খুঁজেছিল।

পরের দিন সে কথা শুনে স্বরঞ্জন আমাদের দুজনকে চায়ের সঙ্গে দুখানা করে টোস্ট খাইয়েছিল। ব্যাটা কিপটের জাসু, আমি হলে মামলেট খাইয়ে দিতাম।

ভুলু টোস্ট আর চা শেষ করে বলেছিল, স্বরঞ্জন, তোর টেস্ট নেই। মেয়েটার মধ্যে আছে কি ? নিঙড়োলে এক ফোঁটা রক্ত বেরোবে না।

আমারও একজনকে একটু একটু ভাল লাগছিল। বইখাতা বুকে নিয়ে এগারটা সাতে সে আমাদের বাড়ির কাছে স্টপ থেকে…না, তার পরের স্টপ

থেকে উঠত। আমি তাড়াতাড় খেয়ে বোরয়ে পড়তাম, হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে একটা স্টপ হনহন করে হেঁটে এসে বাস ধরতাম। যেদিন দেখতে পেতাম না সেদিন পনের মিনিট কি আধঘণ্টা অপেক্ষা করতেও খারাপ লাগত না।

একদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল, দূর থেকেই দেখতে পেলাম কমলা রঙের শাড়ির মেয়েটি একটা বাস ছেড়ে দিল। ভিড় ছিল বলেই হয়তো। কিন্তু আমার ভাবতে ভাল লাগল, আমার জন্য।

সে যাক্ গে, রাঙাদির ননদ কিন্তু প্রায়ই আসত, মেজদি আর ছোটদির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে যাবার সময় আমার সঙ্গে হেসে দু একটা কথা বলে যেত। রাস্তায় একদিন দেখা হয়েছিল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করেছিল। একদিন—নিচের ঘরে মেজদিকে না পেয়ে ছাদে চলে এসোছল। আমি তখন ছাদে একা। আলসের ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, মেজদি এসে পড়বে ভেবে আমি ভয়ে ভয়ে নিচে নেমে এসেছিলাম।

রাঙাদির ননদ নিশ্চয় ভুল বুঝেছিল।

রাঙাদি একদিন বলেছিল, আমার ননদের খুব চুল।

আমি বলেছিলাম, আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে পড়ে, এত সুন্দর চোখ। চোখই আসল।

লেকের ধারে একটা তালগাছের নিচে বসে আমরা আড্ডা দিতাম সন্ধেবেলায়। বার্টাণ্ড রাসেল আর হাক্সলি থেকে লীলা দেশাই হয়ে আমরা কিছুক্ষণ টেররিস্টদের মত চটপট দেশোদ্ধার করে শেষে সুন্দর চেহারার কোন মেয়েকে কোন ছেলের সঙ্গে হাঁটতে দেখলে নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলতাম।

তারপর ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন হঠাৎ কখন দিশন্তীর দুটি চোখ আমার বুকের মধ্যে দুটি হৃৎপিণ্ড হয়ে ধুকধুক ধুকধুক করত।

একদিন কলেজ ছুটির পর আমি আর সুরঞ্জন তর্ক করছি উত্তেজিত হয়ে, ভুলু ফটকের কাছ থেকে আরও উত্তেজিত গলায় বললে, ববি, ববি।

ও ছুটে এসে বলল, শিগ্গির চল্।

না বুঝেও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। দেখলাম ট্রাম স্টপে দিশন্তী দাঁড়িয়ে আছে।

ভুলু বলল, গাড়ি আসে নি।

সুরঞ্জন বলল, ঈস, যাবে তো উল্টো দিকে।

আমি বললাম, চল্ চল্, না হয় ফিরেই আসব। তবু তো অনেকক্ষণ দিশন্তীর সঙ্গে এক ট্রামে থাকতে পাব।

সেই প্রথম।

দিশন্তী আমাদের দেখে প্রথমটা একটু অস্বস্তিবোধ করল। কিন্তু ট্রামে উঠে লেডিজ সীটে বসে চোখ তুলে তাকাল।

সেই প্রথম আমার সঙ্গে তার চোখোচোখি হল।

হৃৎপিণ্ড নাকি রক্তকমল। পদ্মের মতই পাপড়ি মেলল আমার হৃদয়—আমার আবার হৃদয়!—আর পাপড়ি মেলে ধরা পদ্মের মাঝখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটল।

এক সময় দিশন্তী নেমে গেল। কে যেন পার্কের ফোয়ারাটা চাবি ঘুরিয়ে হঠাৎ বন্ধ করে দিল।

'অনিরুদ্ধটা ভীষণ সেলফিশ,' আমি বলেছিলাম। কারণ অনিরুদ্ধ একদিন তো আলাপ করিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে কথা শোনার পর থেকে ও কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলত।

আমার সন্দেহ হত, অনিরুদ্ধ হয়ত দিশন্তীকে ভালবাসে। দিশন্তী অনিরুদ্ধকে ভালবাসতে পারে এ কথা ভাবতেও আমার বুক ফেটে যেত।

অথচ আমি তো তাকে ভালবাসতাম না। আমার শুধু সুন্দর ছবি কিংবা সিনেমা দেখার মত দিশন্তীকে দেখতে ভাল লাগত, দিশন্তীর চোখ

একদিন দুপুরে হঠাৎ কলেজের গেটের কাছে দেখলাম একজন দাঁড়িয়ে আছে, দু আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে উদাস উদাস চোখে অপেক্ষা করছে। শ্যাম্পু করা হাওয়ায় ওড়া চুল ভদ্রলোকের, বেজায় ফর্সা আর লম্বা, মুখে কেমন মিষ্টি কুয়াশা লেগে আছে।

দিশন্তী হাসতে হাসতে কোত্থেকে এগিয়ে এল, কথা বলল তার সঙ্গে, তারপর দুজনে তারা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল, পরক্ষণেই আমি খুশী হয়ে উঠলাম। মনে হল আমি যেন অনিরুদ্ধের ওপর রীতিমত একটা রিভেঞ্জ নিয়েছি।

কলেজ ছাড়ার দিনে আমি যতবার পারলাম, যতক্ষণ পারলাম দিশন্তীকে

দেখলাম। অন্য সকলেই হয়তো খুব খুশী, এতদিনে কলেজের বাঁধন কাটল, আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এরপরই শূন্যতা।

আমরা সকলেই, আমি, সুরঞ্জন, ভুলু পরস্পর থেকে ছিটকে পড়েছিলাম। সুরঞ্জন যখন বিয়ে করল তখন বরযাত্রী গিয়েছিলাম, গল্প করতে করতে ভুলু বলল, দিশন্তীকে মনে আছে ?

আমি ভেবেছিলাম দিশন্তীকে ভুলে গেছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

সুরঞ্জন বরের আসনে বসেই বলল, জানি জানি। সেই বেজায় ফর্সা উদাস উদাস লোকটাকেই বিয়ে করেছে।

ভুলুর বড ছেলের পৈতের সময় আবার দিশন্তীর নাম শুনলাম। সুরঞ্জন আসে নি, সে তখন নাগপুরে বদ'ল হয়েছে। ভুলু বলল, চিঠি দেব কি, ঠিকানাই জানি না। অনিরুদ্ধ এসেছিল, সে বলল, দিশন্তীর মেয়ে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে।

আমি কিছুই বললাম না। কিছুই বললাম না দেখে ওরা একবার আমার টাক নিয়ে ঠাট্টা করল, তারপর বলল টাকের জন্যেই নাকি আমার বিয়ে হল না।

আমি শব্দ করে হাসলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাঙাদির ননদের কথা মনে পড়ে গেল। আমি একদিন সিঁড়ির বাঁকে তার হাত ধরেছিলাম। হাত ছাড়িয়ে ও ভয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে এমন চোখে তাকাত আমি বেশ বুঝতে পারতাম।

বিয়ের পর প্রথমে একটা বাচ্চাকে নিয়ে সে আসত কখনও কখনও, তারপর দুটো বাচ্চাকে নিয়েই আসত। শেষে তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে। আমার তখন বিরক্ত লাগত।

তারপর একদিন হঠাৎ অনিরুদ্ধ আমার বাড়িতে এসে হাজির হল। ওর ছেলেকে কলেজে ভর্তি করানোর জন্যে।

কথায় কথায় ও বলল আমরা সবাই বুড়িয়ে গেলাম, দিশন্তী কিন্তু এখনও সুন্দর।

আমি বললাম, তার সঙ্গে তোর এখনও দেখা হয় ?

—বাঃ, হয় না ? এলেই তো দেখা করি। অনিরুদ্ধ বলল। তারপর একটু থেমে বলল, তোর কথাও একদিন বলছিল।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ও ফ্ল্যাটারি করছে। হেসে বললাম, আমার কথা? আমাকে ও চিনতই না।

অনিরুদ্ধ সিরিয়াস হয়ে গেল। —কি বলছিস? তোকে চেনে, চেনে। তুই নামকরা কলেজের নামকরা প্রফেসর···

অনিরুদ্ধ একটা ইডিয়েট। আমি যেন সেই চেনার কথা বলছি।

আমি দিশন্তীকে চিনি, কারণ তার কথা উঠলেই আমার চোখের সামনে মুখোমুখি দুটো ময়ূর ভেসে ওঠে। দুটি চোখ।

অনিরুদ্ধ হাসল। বলল, একুশ বছর পার হয়ে গেছে মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, একুশ বছর। সেই চোখ দিশন্তীর অনেক কাল হারিয়ে গেছে।

একুশ বছর?

আমি চমকে উঠলাম। হিসেব করলাম। হ্যা, একুশ বছর।

আমি তখন একুশ। আমরা সকলেই।

কিন্তু বিশ্বাস হল না, দিশন্তীর সেই চোখ হারিয়ে যেতে পারে।

সুরঞ্জনের দুটো অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল, থার্ড অ্যাটাকে ও মারা গেল। মাত্র বছর খানেক আগে ও বদলি হয়ে এসেছিল।

ভুলু সকালবেলাতেই খবর দিল। আমারা ক্যাওড়াতলায় গেলাম, অনিরুদ্ধ বলল, ইলেকট্রিকে পোড়ান হবে, ইলেকট্রিকে।

থমথমে মুখে সবাই বসে ছিল, দাঁড়িয়ে ছিল, ফিসফিস কথা বলছিল।

শুধু ভুলু বলল, চুল্লী খালি হতে আরও এক ঘণ্টা।

আর আমি হঠাৎ দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে—দিশন্তী। কালো পাড় সাদা শাড়ী মুখে বিষণ্ণতা আঁকা।

ভুলু বলল, অনিরুদ্ধের সঙ্গে এসেছে। অনিরুদ্ধ একসময় বলল, পালাস না তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

আর অনিরুদ্ধ ওর দিকে যখন এগিয়ে গেল, আমি দেখলাম, দিশন্তীর সেই চোখ সত্যি হারিয়ে গেছে। দিশন্তী যেন অন্য মানুষ।

আমি আর ভুলু কিছু না বলে চলে এলাম। কারণ, আমাদের তখন ভীষণ খারাপ লাগছিল। আমার, আমার কান্না পেল। সুরঞ্জনের জন্যে নয়, নিজের জন্যে। দিশন্তীকে দূর থেকে দেখে আমার মনে হল আমি বুড়িয়ে গেছি।

সেই প্রথম মনে হল আমার সব হারিয়ে গেছে।

এতদিন ভাবতাম, আমি এখনও একুশ। আমরা সবাই।

দিশন্তীর ঈষৎ মোটা-হওয়া সুন্দর চেহারায় সবই ছিল, ছিল না শুধু সেই চোখ।

একুশ বছর পরে আমার কিছুই ছিল না, ছিল শুধু একুশ বছরের চোখে দেখা একজোড়া চোখ।

তাও হারিয়ে গেল। সেই একুশ বছরেব বয়সটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল।

ফিরে আসা

গ্রামের নাম কানিয়ালুকা। শুদ্ধ করে বলতে হয়—কন্যালুকা। শুধুই একটা খেয়ালী মিষ্টতা, নাকি কোন ইতিহাস লুকিয়ে আছে ও নামের পিছনে? কোন্ সে কন্যা, যাকে হাঙরের লোভ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, ওখানে! কিংবা, কে জানে, পুরুষচিত্তে লোভ জাগাবার মত কন্যা এখনও হয়তো ঐ জংলা গ্রামেই লুকিয়ে আছে।

মুশাবনীর রোপওয়ের বাকেটের সারি চলেছে মাথার ওপর দিয়ে, মাটিতে হাওয়ায় কি এক বিচিত্র ধাতব গন্ধ। চালকো পাইরাইট ওরের বাকেট থেকে, কিংবা খনিজ কপারের গভীর খাদ থেকে রেণু রেণু তাম্রগন্ধ এসে মিশছে বাতাসে। পাথর, বনঝোপ, আকাবাঁকা ট্রেঞ্চের মত অগভীর খাদ—রক ফসফেট, অ্যাসবেসটস, কোয়ার্টজাইট। রত্নগর্ভা মাটি মুশাবনীর। মাটি, কিংবা সাদা আর সবুজাভা কায়ানাইটের পাথুরে ওর। ওদিকে জাদুগোরায় ইউরেনিয়াম মাইন্‌স—ড্রিলিঙের আওয়াজ আসছে সেখান থেকে।

তীব্র শীতের বিকেলে আমরা চার বিবেকবান ভদ্রসন্তান বেওয়ারিশ লম্পট হয়ে উঠতে চাইছিলাম। নবাবী গেস্ট হাউসের আরামের দেয়াল যেন আমাদের টুঁটি চেপে ধরতে চাইছিল। হাটের সেই উন্মত্ত যৌবনের শরীরী অরণ্যতার মধ্যে আমরা মুক্তি চাইছিলাম।

—কোথায় বাড়ি রে তোর? অবিনাশ জিগ্যেস করেছিল মেয়েটাকে।

কালো চকচকে মুখটা পরিচ্ছন্ন দাঁতের হাসি ছিটিয়ে বলেছিল, কানিয়ালুকা গো, ঐ শুঁড়গি পাহাড়ের নীচে।

কানিয়ালুকা নামটা তখনও আমাদের কানের পাশে গুনগুন করছে।

কিন্তু জিওলজিস্ট সুনন্দর পাশে পাশে ঘুরছে ছোট্টু প্রধান। কেউ কেউ বলে ছোটু মিঞা। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার লোকটা হঠাৎ মিঞা হল কেন বলা দুষ্কর।

সুনন্দর পিছনে যেন আঠার মত লেগে আছে প্রথম দিন থেকে। ঠিক গেস্ট হাউসের বিনয়ী খানসামা মৈহুদ্দিনের মত।

সুনন্দ নালার মত সরু সরু খাদের এক এক টুকরো ওর তুলে ধরছে চোখের সামনে, বলছে, এই লেয়ারটা বুঝলি বরেন, কায়ানাইটের। এই যে সবুজ সবুজ পাথর···

কিংবা একটা কালো মাটির ঢেলা তুলে বলছে, এই সোনালী সোনালী ফাইবার—এ হল কপার পাইরাইট। তামা তামা।

অবিনাশ বিরক্ত হয়ে বলল, ধুত্তোর কোনটা অ্যাসবেসটস, কোনটা কোয়ার্টজাইট জেনে আমার কি হবে?

উ চিনাই তো আসল বাবু। ছোট্টু প্রধান দাঁত বের করে হেসে উঠে বলল। তারপর ধীরে ধীরে সুনন্দকে বলল, একটা মাটি ইজারা করে দিন হুজুর, ব্যস্, ছোট্টু আপনার গোলাম।

অবিনাশ ক্ষেপে উঠেছিল। সে বলল, তার চেয়ে একটা ভাল সাঁওতাল মেয়ে চিনিয়ে দাও না বাবা, আমরা তোমার গোলাম হয়ে যাব।

সুনন্দ ভুরু কোঁচকাল। জিওলজিস্ট সুনন্দর এখানে অন্য চেহারা, অন্য খাতির। এক মুঠো হলুদ হলুদ মাটি তুলে ও বলে দিতে পারে কত পার্সেণ্ট রক্ ফসফেট আছে, কিংবা আছে কি না।

তাই সুনন্দ অপ্রতিভ হল, হল না ছোট্টু মিঞা। সে দাঁত বের করে হেসে বলল, সে আপনি হুকুম দিন না বাবু, আমার কুঠীতে চলেন, কোতো রেন্ডী আছে উখানে, দেখে পসন্দ করে লেবেন। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

বরেন বলল, উঁহু, একটা জীপ চাই।

অবিনাশ বলল, কানিযালুকা।

পরের দিন বিকেলেই একটা জীপ এসে হাজির।

ছোট্টু মিঞা বলেছিল, পারি হুজুর সোব পারি। লোকটা বোধ হয় সত্যি সত্যিই সব পারে।

আমরা তখন গেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে দূরের শালবন খয়ের আর হরিতকীর ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছি। তোয়ালে কাঁধে মৈনুদ্দিন খানসামা কে কি ব্রাণ্ডের সিগারেট খায় চোরা চোখে দেখে নিয়ে দু দু প্যাকেট সিগারেট সকলের সামনে রেখে দিয়ে গেছে।

তা দেখে বরেন বলল, শালার সত্যি নবাবী ব্যাপার রে।

অবিনাশ ক্ষোভের স্বরে বলল, নবাবী ব্যাপারের আসলটাই তো নেই। সাঁওতালী মেয়ে টেয়ে…

ঠিক সেই মুহূর্তে জীপের হর্ন শোনা গেল।

অবিনাশ লাফিয়ে উঠে বলল, কানিয়ালুকা!

মন চঞ্চল হয়ে উঠল আমাদের সকলেরই।

দূরে দূরে পাহাড়, ঘন পাহাড়ী বন, তামার খাদ, এদিকে একটা সাঁওতালী হাট, হাটে লালপাড শাড়ি, হাত-কাটা মহাজন মেওয়ালাল—ব্যস্। দেখে দেখে চোখ পচে গেল। পরিত্যক্ত রাখা মাইন্‌স্ এলাকায় ঝোপঝাড় জঙ্গলের মাঝে মাঝে এক একটা শ্যাওলা-ধরা নিঃসঙ্গ পাঁচিল, নয়তো মাটিতে মিশে যাওয়া কোন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ।

মৈনুদ্দিন এসে ফিস ফিস বিনয়ে বলল, জীপ আয়া হুজুর।

দূর থেকে উঁচু পাহাড—শুঁড়গি পাহাড় আর বন, আর শাড়ির পাড়ের মত টান টান শাঁখ নদীটা, গেরুয়া শ্লেট-হলুদে রাঙানো সাঁওতাল পল্লীর পরিপাটী বাড়িগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে উঠল।

মিহি শীত শরীরে চামরের বাতাস দিচ্ছিল এ কদিন। বিকেল থেকে সেটা যেন জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। অদূরের লাইসেন্সড্ ডিষ্টিলারী থেকে এক ঝল্‌কা রমরমে গন্ধ ভেসে আসতেই মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

গরম প্যাণ্ট আর ফুল হাতা সোয়েটারে শরীর ঢেকে আমরা এসে জীপে উঠলাম। পশ্চিমের লাল আকাশটা তখন ক্রমে ক্রমে মাটির ওপর ঝুলে পড়ছে।

ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে অবিনাশ ষ্টিয়ারিঙে বসল।

কয়েকটা হাট-ফেরতা সাঁওতাল মেয়ে সাদা ফটফট শাড়ির মধ্যে সিল্যুট ছবি হয়ে গিয়ে ছমছম হাসি ছিটিয়ে চলে গেল।

কিন্তু অবিনাশ স্টার্ট দিতেই মৈনুদ্দিন ছুটে এল। পিছন থেকে লাফিয়ে উঠে বসল।—আপকা ধন্দেমে…মুঝে ছোড়কে…

ওর সেবা থেকে পরিত্রাণ পাবার যেন উপায় নেই।

স্টার্ট দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বেশ জোর জার্ক খেল গাড়িটা। বেশ বোঝা গেল অবিনাশ রেগে গেছে।

মৈনুদ্দিন বলল, সাবধানে চালান হুজুর…বড়ি আফৎ কি রাস্তা…

অবিনাশ কানেও তুলল না ও কথা। মেঠো রাস্তায় মোড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহাড়ী পথটার দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

অন্ধকার নেমে আসছে ক্রমে ক্রমে। অন্ধকার, শীতের রাতের অন্ধকার আরেকটু জমাট হতেই পূর্ণিমার বিশাল লাল হলুদের চাঁদটা কোন ফাঁকে হঠাৎ ছোট হয়ে গেল, রুপো হয়ে গেল, এতক্ষণ নজরে পড়ে নি। এখন আকাশ-ছোঁয়া শাল গাছের মাথার ওপর সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এদিকে গোঁয়ারের মত গাড়ি চালাচ্ছে অবিনাশ।

আঃ, লাভলি। চাঁদটার দিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম।

বরেন বলল, লাভলি কিছু পেলে তো!

পাহাড়ের ঢল বেয়ে কাশ ঝোপের মধ্যে দিয়ে জীপ ছুটছে তখন।

সুনন্দ বলল, এবার কানিয়ালুকা গ্রাম!

—কানিয়ালুকা? স্টিয়ারিঙে বসে অবিনাশ বলে উঠল।

কিন্তু কি শান্ত, স্তব্ধ নির্জন গ্রাম। মানুষ আছে বলে মনেই হয় না। যেন একটা বোবাদের গ্রাম। দু পাশে ঝোপ ঝাড়, মাঝখানের সরু ধুলোর রাস্তাটা যেন গ্রামটাকে দু ভাগ করে দিয়ে গেছে।

নির্জীব পড়ে আছে। মাটির দেয়ালে চাঁদের আলো পড়েছে। মাঠে, ক্ষেতে। ঝিঙের ক্ষেত, চালের ওপর কুমড়ো আর সীম উঠেছে লতিয়ে।

ধুলোয় চাকা ডুবে যাচ্ছে। পিছনে ধুলো উড়ছে।

—গ্রামটা মরে গেছে নাকি? আমি প্রশ্ন করলাম।

মৈনুদ্দিন হাসল। সব খাদে কাজ করতে গিয়েছে হুজুর, রাতে ফিরবে।

সুনন্দ বলল, চল ওই দূরে পাহাড়ের ওপর। রিয়েল ফরেস্ট দেখে আসবি।

অবিনাশ অ্যাকসেলারেটারে পা চাপাল। গোঁ গোঁ আওয়াজ করে জীপ গতি বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছাগলের চীৎকার শোনা গেল।

—শালার ছাগল চাপা দিয়েছি রে! অবিনাশ ব্রেক কষে বলে উঠল।

—ছাগল! যেন কিছুই নয় এমন ভাবে হেসে উঠল বরেন।

কিন্তু মৈনুদ্দিনকে মুহূর্তে বড় চঞ্চল দেখাল। ওর চোখে মুখে গলার স্বরে আতঙ্ক। পালান হুজুর, পালান।

অবিনাশ স্পীড বাড়িয়ে দিল।

আমরা শুধু বুঝতে পারলাম না এত আতঙ্কের কি থাকতে পারে। কিন্তু

মৈমুদ্দিনের নড়েচড়ে বসায়, তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, যা আমাদের ভয় ধরিয়ে দিল।

আমরা ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। না, কেউ ছুটে আসছে না, কেউ চীৎকার করছে না।

অনেকখানি এসে তবে আমরা নিশ্চিন্তে হাসাহাসি করলাম।

বরেন বলল, ধরা পড়লে ঠ্যাঙাত নাকি রে!

মৈমুদ্দিন চুপচাপ, গম্ভীর। ও ধীরে ধীরে বলল, এদিকে ফিরবেন না হুজুর।

—মৈমুদ্দিন বলল, ওদিক দিয়ে নামলে শাঁখ নদী, এখন পানি বহুৎ কম, ওদিক দিয়ে রাস্তা আছে।

—রাস্তা আছে? জীপ চালাতে চালাতে অবিনাশ আশ্বস্ত হল।

কিন্তু আমরা আশ্বস্ত বোধ করতে পারলাম না। মনে হল, কেবলই মনে হল, সড়কি বল্লম টাঙি নিয়ে যেন সাঁওতাল পল্লীটা ধাওয়া করে আসছে।

পাহাড়ের উপর উঠে ঘোরান সিঁড়ির মত আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে বুনো ফুলের গন্ধ, দৈত্যের মত ছায়া ছায়া জংলা গাছ, লতা-ঝোপ চিংকি-চাক, চিংকি-চাক পাখির ডাক আর ভায়ের কান্না চাপিয়ে মরা ছাগলটার ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো আতঙ্ক জাগাল থেকে থেকে।

চিংকি-চাক! চিংকি-চাক! আর একটা ডাক শুনলাম।

সেই নিঃশব্দতার মধ্যে ঐ রহস্যজনক শব্দটায় শরীরে কেমন যেন একটা শিরশিরানি বয়ে যায়।

বেশ খানিকটা এসে একটা ছোট্ট পাহাড়া গ্রাম দেখে তবে আশ্বস্ত হওয়া গেল।

একটা জঙ্গল-চৌকি ঘিরে কয়েকটা মাটির ঘর। লম্ফ হাতে একটা সাঁওতাল মেয়ে একটা ঘর থেকে অন্য ঘরে গেল।

সুনন্দ একটা চিমটি কাটল।

মৈমুদ্দিন চুপচাপ বসেছিল, বলল, বাঁয়ের রাস্তা নদীর দিকে গেছে।

অবিনাশের হয়তো থামার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু থামতে পারল না। শুধু বলল, ধুৎ, মিছিমিছি আসা।

মৈমুদ্দিন হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠল নাকি। ধীরে ধীরে বলল, জিন্দগী মে কুছ ভি বেফায়দা নেহি হোতা হুজোর!

জীবনে কিছুই নাকি অকারণ নয়। নয়ই তো। এই শীতের সুন্দর রাতটা, এই নিঃশব্দ আতঙ্কের ঘন বনের পথ, এই চাঁদ কি আর কখনও দেখেছি?

দেখার তখনও বোধ হয় বাকী ছিল।

আমরা সকলেই তখন নিশ্চিন্ত। দূরে, পাহাড়ের ঢল থেকে নামতে নামতে নদীর ওপরের বালি দেখতে পাচ্ছি। একটা আনকোরা শাড়ি যেন চাঁদের আলোয় কেউ বিছিয়ে রেখেছে।

—লাভলি! লাভলি! কে বলল যেন।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই আমাদের দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়তে হবে কে জানত।

বালি নয়, জল।

নদীর জল শুকিয়ে যায় নি, বেশ স্রোত রয়েছে কোমরডোবা জলেও।

আমরা বিমূঢ় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

অবিনাশ শুধু বলল, তা হলে?

সুনন্দ হেসে উঠে বলল, জীপ ঘুরিয়ে নে।

বরেন বলল, এখন রাত নটা! ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে।

আমি বলল, ফেরার পথে, ভয় কি আমাদের রোস্ট বানিয়ে দেবে।

কেউ হাসল না। কেউ হাসল না দেখে আমিও ভয় পেলাম।

ফিরে চলেছি। ফিরে চলেছি। উঃ, আবার এই পাহাড়টাকে সরু ঘোরান সিঁড়ির মত ঘুরপাক খাওয়া রাস্তা ধরে ওপরে উঠতে হবে। তারপর আবার নামতে হবে, নামতে হবে সেই ফেরার পথ ধরে।

কিন্তু এবার আর কারও মুখে কোন কথা নেই।

আমি সাহস দেবার জন্যে বললাম, এত চুপচাপ কেন সব। অ্যাঁ? আমরা যে চাপা দিয়েছি তার প্রমাণ কি? কেউ তো দেখে নি।

বরেন বলল, ঠিকই তো, তাছাড়া হয়তো কেউ দেখেও নি এখনও।

মৈনুদ্দিন কোন কথা বলল না। মনে হল ঐ সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছে।

সুনন্দ বললে, আরে দূর, ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা হয়ে যাবে, ঘুমিয়ে পড়বে সব।

ঠিক তো! মাঝ রাত অবধি কে আর জেগে থাকবে।

সুনন্দর কথায় সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করল। সুনন্দ যখন এখানকার মাটি চেনে, তখন নিশ্চয় মানুষও চেনে।

আমরা আবার রসিকতা করতে শুরু করলাম। গলা ছেড়ে গান ধরল বরেন।

এদিকে পথ যেন আর ফুরতে চায় না। পাহাড়টাকে পাক দিয়ে দিয়ে আমরা যেন তার সাত পাকের বন্ধনে আটকে গেছি, ছাড়া পাবার উপায় নেই।

সেই বন, সরু ধুলোর রাস্তা, চিংকি-চাক চিংকি-চাক…

অবিনাশ হঠাৎ বলল, গান থামা বরেন।

সুনন্দ বলল, এসে গেছি।

জীপটা তখন পাহাড়ের ঢল বেয়ে সেই সাঁওতাল গ্রামের সরু রাস্তাটার দিকে মোড় নিয়েছে।

না! কেউ কোথাও নেই মনে হচ্ছে। মশাল হাতে, কিংবা সড়কি বল্লম টাঙি হাতে কেউ হৈ হল্লা করছে না। মাদল বাজিয়ে আগুন ঘিরে কেউ আমাদের জীবন্ত রোস্ট করার জন্যে আনন্দে নাচছে না।

অবিনাশ হেসে উঠে বলল, মিথ্যে ভয় পেয়েছিলি।

আমরা কলরব করে হাসতে গিয়ে মৈনুদ্দিনের কথায় থমকে গেলাম।

মৈনুদ্দিন চাপা গম্ভীর গলায় বলল, হেডলাইট বুজা দিজিয়ে!

ঝপ করে হেডলাইট নিভিয়ে দিল অবিনাশ।

তারপর চাঁদের আলোয় ফুটফুট করা সাদা ধুলোর শীর্ণ রাস্তা ধরে নিঃশব্দে এগোতে শুরু করল জীপটা।

আর আধ মাইল। দূর থেকে নির্জন নিস্তব্ধ গ্রামটা দেখা যাচ্ছে। না, একটাও লোক দেখা যাচ্ছে না। আলো জ্বলছে না।

নিশ্চিন্ত বোধ করছি সবাই। নিশ্চিন্ত হয়েই হয়তো স্পীড বাড়িয়ে দিল অবিনাশ।

আর রাস্তাটা মোড় ঘুরতেই দূর থেকে—সবাই আমরা সোজা হয়ে বসলাম।

রাস্তার ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। চাঁদের আলোয় সাদা সাদা—
—থোকা থোকা যুঁই ফুলের মত ফুটফুট করছে কি যেন!

অবিনাশ নাকের ভেতর দিয়ে একটা শব্দ করে হঠাৎ হেডলাইট জ্বালল। আর আমরা সবাই আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

জীপ থামিয়ে দিল অবিনাশ।

রাস্তা রোধ করে রাস্তার ওপর অগুন্তি মানুষ। কালো কালো মানুষ। সাদা শাড়ি আর ধুতি ফুটফুট করছিল এতক্ষণ, হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

জীপ এক চাকাও এগোল না।

পঁচিশ গজ দূরেই অসংখ্য মানুষ রাস্তা জুড়ে বসে আছে। নিঃশব্দ নির্বাক। গাড়ি দেখেও তারা নড়ল না, এগিয়ে এল না, চিৎকার করল না। কথা বলল না।

সে এক অদ্ভুত আতঙ্ক। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা।

এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছে জীপ, আবার থমকে থামছে।

আমরা চাইছি ওরা কিছু বলুক। ওরা বলুক ছাগল চাপা দিয়েছ তোমরা। তাহলে আমরা একটা অজুহাত দিতে পারব, বলতে পারব, আমরা নির্দোষ।

কিন্তু না, জীপ এগিয়ে আসতে দেখেও তারা নড়ে বসল না। যেমন রাস্তা জুড়ে বসেছিল, তেমনি বসে রইল।

মানুষ, মানুষের মাথা। কত মানুষ তার হিসেব নেই। হয়তো একশো, হয়তো দুশো। কিন্তু হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে তাদের হাতে কোন সড়কি বা বল্লম নেই, একটা লাঠিও নেই।

নিরস্ত্র নির্বাক একটি জনপদ যেন প্রতিবাদের মূক মুখে চুপচাপ বসে আছে।

জীপ একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু কোন কথা বলছে না তারা। কেউ দাড়িয়ে উঠছে না।

বাধ্য হয়েই আমরা তাদের উঠতে বললাম, পথ দিতে বললাম।

এবারও নির্বাক।

—কি হয়েছে কি? মৈনুদ্দিন নেমে দাঁড়াল। আমি মৈনুদ্দিন, চিনিস না আমাকে?

কোন জবাব নেই।

ভয়ে ঘাম দিচ্ছে সারা শরীর। সারা রাত কি এখানেই কাটাতে হবে নাকি? কিংবা আরও সাংঘাতিক কিছু!

—এই বুধন! চেনা লোক দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল মৈনুদ্দিন।

কিন্তু ছোকরা বুধন চোখ তুলে তাকাল না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

এবার বুড়ো গোছের মোড়লটাকে দেখতে পেল মৈনুদ্দিন।

এগিয়ে গেল তার কাছে।

আর বুড়োর সামনে গিয়ে মরা ছাগলটা দেখতে পেল।

ছাগলটা সামনে ফেলে রেখে বসে আছে সমস্ত গ্রামের লোক।

মৈনুদ্দিন হেসে হাল্কা হবার চেষ্টা করল। —আমি মৈনুদ্দিন। ভাটিখানার মৈনুদ্দিন। কাল যাবি তোরা। নেশা করবি, দারু পিয়ে ফুর্তি করবি··· রাস্তা ছাড়।

বুড়ো মোড়ল এবার জোরে মাথা নাড়ল। না, না, না।

আমরা এবার সাহস করে জিগ্যেস করলাম, কি চাস তবে?

এক মুখে হেসে বুড়ো হাতের দশটা আঙুল দেখাল।

দশ টাকা!

যার পকেট থেকে যা বের হল, নিয়ে দশটা টাকা দিয়ে দিলাম বুড়ো মোড়লের হাতে।

আর সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে দাঁড়িয়ে উঠল সকলে। ফুর্তিতে চিৎকার করে পথ ছেড়ে দিল।

অবিনাশ আবার স্টার্ট দিতে যেতেই বুধন মরা ছাগলটা নিয়ে ছুটে এল। এটা লিয়ে যা বাবুরা, তুরা দাম দিয়েছিস!

আতঙ্কের পারাটা তখন তরতর করে নেমে গেছে।

বললাম, না রে, ওটা তোরাই খাবি। রেখে দে।

উঁহু, সে চলবে না, তুরা দাম দিয়েছিস!

বুধন জোর করল। ই তো মহিমবাবু, ভাটিখানার মহিমবাবু, আমরা তো তোকে চিনি বটে. ই লিয়ে যা তোরা।

চিনি বটে! এতক্ষণে চিনতে পারছে বুধন।

আমি বুড়ো মোড়লকে বললাম, তোরা রেখে দে ভোজ করবি।

—ভোজ!

বুড়ো মোড়ল কি বলল সকলকে। আর সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল সকলে। ভিড় করে জীপের কাছে এসে হাত ধরে টেনে নামাতে চাইল। যেতে দিব নাই তুদের, তুরাও ভোজ খাবি!

আরেকটা বুড়ো বললে, আয়, মাংস খাবি, মদ খাবি আমাদের সঙ্গে।

আমরা তখন পালাতে পারলে বাঁচি।

অনেক করে তাদের বুঝিয়ে কোন রকমে পরিত্রাণ পেলাম আমরা। আর রাস্তা ফাঁকা পেতেই জোর স্পীডে জীপ ছুটিয়ে দিল অবিনাশ।

আমরা ফিরে এলাম।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই মৈনুদ্দিন গম্ভীর বিনয়ের কণ্ঠে বললে, ছোট্টু মিঞা ভেট পাঠিয়েছে হুজুর।

বলে দরজার দিকে তাকাল।

আমরা ফিরে তাকিয়ে দেখলাম দরজার সামনে হাসি হাসি মুখে একটা সাঁওতাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা চমকে উঠলাম। আরে, এ যে হাটে দেখা সেই কানিয়ালুকার মেয়েটা!

কানিয়ালুকা।

সঙ্গে সঙ্গে, কেন জানি না আমাদের চোখের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা মিশে গেল। মেয়েটার দিকে, তার উদ্দাম যৌবনের শরীরটার দিকে আমরা লম্পটের চোখে তাকাতে পারলাম না।

অবিনাশ তার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, না রে, তুই ফিরে যা!

আসলে তাকে তো আমরা ফিরিয়ে দিলাম না, আমরা নিজেরাই ফিরে এলাম।

বয়স

নিভার সঙ্গে একটি কি দুটি কথা। ব্যস্ আর তো কিছুই আমি চাই নি। তখন মনে হত শুধু আলাপ করতে পেলেই ধন্য হয়ে যাব। তখন মনে হত শুধু মুখোমুখি দু চারটি কথা বলতে পেলে আর কিছুই চাই না।

নিভাকে আসলে আমি একদিন আবিষ্কার করেছিলাম। পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে পড়ি তখন, গলির মোড় থেকে বের হয়ে বাসস্টপের দিকে যেতে হলে দু দুটো ব্যাফল ওয়ালের আড়াল। জাপানী বোমা পড়ার আতঙ্ক চলে গেছে, কিন্তু ব্যাফল ওয়ালগুলো তখনও বাড়ির দরজায় দরজায়, যেখানেই দু এক ফালি ঘাস ছিল, স্লিট ট্রেঞ্চের দাপটে খানাখন্দ হয়ে দুর্গন্ধ জমিয়ে রেখেছে। আর বিশাল বিশাল মিলিটারি ট্রাক ছুটছে রাস্তা কাঁপিয়ে, থেকে থেকেই, কিন্তু তা তখন সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে। মিলিটারির ট্রাকের মত চেহারা, আমেরিকান নিগ্রোদের অশ্লীল হাসি কিংবা শিস, সাদা আমেরিকানদের এক হাত ট্যাঁশ রঙে মেয়ে নিয়ে লোফালুফিও।

প্রেম তখন ব্যাফল ওয়ালের আড়ালে চলে গেছে। প্রেম আছে তা আমরা জানতাম না, কিংবা ভুলতে বসেছিলাম।

সুকুমার বলেছিল, পাঁচ টাকায় কাল একটা দিব্যি সুন্দর মেয়ে পেয়েছিলাম আমরা, তুই ছিলি না।

সব জিনিসের দাম তখন বাড়ছে হু হু করে, চাল চিনি কেরোসিন উধাও, শুধু একটা জিনিস শুনতাম খুব সস্তা, খুব সস্তা।

যুদ্ধ আমাদের দেশটার সর্বনাশ করে দিল বলে আমরা সব কজন বন্ধু হা-হুতাশ করতাম, দুঃখ পেতাম, তর্ক করতাম রাজনীতি নিয়ে। আবার অজিত কিংবা সুকুমার সন্ধেবেলায় লেকের ঘাসে বসে আধা অশ্লীল রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে খবর বিনিময় করত। ভট্চাযকে ধরে চল না একদিন, বাড়িটা দেখে এসেছি, কালীবাবুর মাসির বাড়িতে।

অজিত বলেছিল, দারুণ। ভট্চায নিয়ে এসেছিল। তুই ছিলি না।

সত্যি বলতে কি, ঐ একটা দিন ওদের আড্ডায় না যাওয়ার জন্যে আমার

অনুশোচনা হয়েছিল। জীবনের, আমার একুশ বছরের জীবনের প্রচণ্ড একটা অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেন বঞ্চিত হয়েছি।

সুকুমার ব'লছিল, অম্লান, ভাবিস না আবার একদিন

আমি হয়তো ভিতরে ভিতরে সেই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম। প্রেম কি তা আমি জানতাম না। শুধু জানতাম, নারীর শরীরের মত রহস্য আর কিছুই নেই, কোথাও নেই। শুধু জানতাম, এই যুদ্ধের বাজারে একটি জিনিসই খুব সস্তা, খুব সস্তা।

সুকুমার, অজিত আর আমি, আমি অম্লান বসু, তখন পোস্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্র। কলকাতার মানুষগুলোকে তখন আমরা দু ভাগ করে নিয়েছি। একদিকে আমরা, যারা চাল চিনি কেরোসিনের জন্যে এতটুকু চিন্তিত নই। আপিস থেকে যাদের থলিভর্তি সস্তার র‍্যাশন আসে। কিংবা ব্ল্যাকের দামে তা যোগাড় হয়ে যায়। আরেক দল—যাদের র‍্যাশন আসে কি না আসে আমরা জানতাম না।

—অম্লান, আমরা আসলে *কজন ডক্টর জেকিল আর মিস্টার হাইড। সুকুমার বলেছিল।—আমরা যখন একা তখন আমরা ভাল, আমরা যখন ঐ আমেরিকান সৈনিকগুলোর মত একজোট হই আমরা তখন অন্য মানুষ।' অজিত বলেছিল।

আমরা যখন একা তখন আমরা ভাল।

নিভাকে প্রথম যেদিন আবিষ্কার করলাম সেদিনও আমি একা। কলেজ যাবার মুখে র‍্যাফল ওয়াল পার হয়ে বাসস্টপের দিকে যাব হঠাৎ সমস্ত শরীরে মনে কি যেন ঘটে গেল। আমি তাকে দেখলাম। আমি তাকে আবিষ্কার করলাম।

তখন নিভার নাম জানতাম না।

কাছেই একটা মেয়েদের মর্নিং কলেজ ছিল। তাদের তখন ছুটি হয়েছে। ঠিক এই সময়েই তাদের ছুটি হত। কিন্তু কোনদিন নিভাকে দেখি নি।

সেই প্রথম দেখলাম। ওর সঙ্গে আরেকটি মেয়ে ছিল। দুজনে হেসে হেসে হেলেদুলে হাঁটছিল। একবার বুঝি চোখাচোখি হল।

—সুকুমার, আমার আজ আর কিছু ভাল লাগছে না। চোখ বুঁজলেই কেবল সেই মুখ, সেই হাসি মনে পড়ছে।

—অজিত, বিশ্বাস কর, মেয়েটা আমার দিকে যখন তাকাল একবার, একবারই চোখাচোখি হয়েছে, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে কি যেন বিঁধে গেল।

মনে হল, আমি যেন এতদিন ধুলোচাপা একটা গ্রামোফোনের রেকর্ড ছিলাম। কে যেন এসে সেটা চালিয়ে দিয়েছে, আমি গান হয়ে গেছি।

পরের দিন, ঠিক পরের দিন। আমি বারবার ঘড়ি দেখলাম। ঠিক একই সময়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তা না হলে দেখা পাব না। শুধু একবার চোখের দেখার নেশায় আমাকে পেয়ে বসল।

ছিপছিপে সুন্দর শরীর, কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর মুখ। টিকলো নাকে, চোখের তারায়, ফর্সা মুখে একটা অসাধারণ লাজুক লাজুক ভাব। তার হাঁটার ভঙ্গিটি সপ্রতিভ, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে যেন লাজুকতা ঝরে পড়ছে।

কোনদিন দেখা হত, কোনদিন হত না। যেদিন ও চোখ চেয়ে একবার অন্তত আমার দিকে তাকাত না, সেদিন আর কিছুই ভাল লাগত না।

আমার কেবলই মনে হত হঠাৎ ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে কিছু একটা কথা বলি। আমি কেবলই সুযোগ খুঁজতাম কোনদিন ও একা হবে। কোনদিন ওর সঙ্গের বন্ধুটি থাকবে না।

আমি যে ওকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছি তা ওর চোখ এড়ায় নি। একদিন আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে পাশের মেয়েটিকে কি যেন বলল। সে ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখল, হাসল। আমি ভিতরে ভিতরে সেদিন বোধ হয় ওর ওপর খুব রেগে গিয়েছিলাম, কিংবা লজ্জা পেয়েছিলাম।

—অম্লান, তুই একটা বোকা, বোকা। ডেকে কথা বললেই তো পারিস। অজিত বলেছিল।

আমি বড় ভীতু ছিলাম, কথা বলতে সাহস পেতাম না।

ঠিক এমনি সময়ে আমাদের গলিতে একটা বাড়ি খালি হল। আর দিন কয়েক পরেই দেখি খাট-আলমারী-আসবাবে ঠাসা একটা লরী এসে দাঁড়িয়েছে সেই বাড়িটার সামনে। ও বয়সে পাড়ায় কোন নতুন ভাড়াটে এলেই মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসাই উঁকি দেয়। একটাই প্রশ্ন।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেই নতুন ভাড়াটেদের দরজাটা খুট করে খুলে গেল। আমাদের ডিকশনারীতে দুটো শব্দ ছিল 'ভোর' আর 'সকাল'। কিন্তু ছাপা অভিধানে আরেকটা শব্দ

দেখতাম—'ঊষা'। 'ঊষা' বলতে ঠিক কি বোঝায় আমি জানতাম না। সে কি শুধুই আঁধার কাটানো রূপের ঝলক?

নতুন ভাড়াটেদের রাস্তার দিকের একতলার দরজা খুট করে খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাব মন বলল, ঊষা, ঊষা।

সমস্ত শরীরে একটা খুশীর বিদ্যুৎ বয়ে গেল, একটা আনন্দের চমক। আরে, এ যে সেই মেয়েটি!

সেও তখন অবাক হয়ে আমার দিকে তা।কয়েছে। তার এলোমেলো সুন্দর চুল, ঘুম-জাগা চোখ, শাড়ির ভাঁজে নরম ঘুম জড়ানো আটপৌরে সজীবতা।

অবাক হয়ে সে আমার দিকে তাকাল, পরক্ষণে সজল চোখ মাটির দিকে নামিয়ে সহজ হল, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসি এক পলকের জন্য কাশফুলের মত দুলে উঠল।

তারপর সে আবার দরজার আড়ালে চলে গেল। কপাট বন্ধ হল। আর খুট করে আবার শব্দ হল খিল তুলে দেওয়ার।

প্রেম বোধ হয় একটা নেশা। তা না হলে একটা ঘোরের মধ্যে আমার দিনগুলো কেটে যাবে কেন। ভোরবেলায় ওঠা আমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়াল, কারণ প্রতিদিন ভোরে একবার ও দরজা খুলে দাঁড়াত। যেন আমার নির্বাক পুষ্পার্ঘ্য নেবার জন্য এই সময়টিতে দেখা দিত। তারপর একসময় দেখতাম বইখাতা হাতে নিয়ে ও কলেজে চলেছে।

আমার যখন কলেজ, ওর তখন কলেজ ছুটি। ঠিক সময়টাতে ওরা দু বন্ধু গম্ভীর মুখ করে আমাকে দেখতে না পা ওয়ার ভান করে. পায়ের নখ দেখতে দেখতে পার হয়ে যেত।

একদিন দেখি ফুটপাতের দোকান থেকে ও কি যেন কিনছে। আর সঙ্গের বন্ধুটি আমাকে দেখতে পেয়েই বলল, এই নিভা তাড়াতাড়ি আয়!

নিভা। বাঃ, সুন্দর ছোট্ট নাম তো। নিভা নামটা আমি মনে মনে বার বার উচ্চারণ করলাম। আর নিভা ত:ন দোকান থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে দেখে হেসে ফেলে বন্ধুটিকে কানে কানে কি যেন বলল।

আমি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আরেকবার ফিরে তাকালাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিভাও ফিরে তাকাল।

সুকুমার শুনে বলল, ডেকে কথা বললেই তো পারিস।

অজিত বলল, আমি একজনকে চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছিলাম, সে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

আমি ভেবে পেতাম না তার বন্ধুর সামনে কি করে ডেকে কথা বলব। আমি বুঝতে পারতাম না, কথা বলতে গেলে নিভা রেগে যাবে কিনা। তাই রাত জেগে আমি অনেক কাগজ নষ্ট করে একটার পর একটা চিঠি লিখলাম। পরের দিন ভোরবেলায় দরজা খুলে নিভা এসে দাঁড়াতেই চিঠিটা গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলাম তার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে নিভার মুখে কেমন একটা কঠিন রূঢ়তার ছাপ পড়ল। ও দরজা বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে গেল। আর চিঠিটা একটু পরেই হোস পাইপের জলে কাগজের নৌকা হয়ে ভেসে ভেসে গিয়ে এক সময় টুপ করে ডুবে গেল।

আমার বুকের মধ্যে তখন একটা বিষাদের কান্না।

আমি অজিতের উপর খুব চটে গিয়েছিলাম। আমি নিজের ওপর আরও বেশী ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একটি সুন্দর স্বপ্নকে আমি নিজেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছি।

কিন্তু সন্ধেবেলায় কলেজ থেকে ফিরে দেখলাম ওর পড়ার টেবিলের সামনের জানলা প্রতিদিনের মতই খোলা। টেবিল ল্যাম্পের কড়া আলোয় ওর ফর্সা মুখ তেমনি উজ্জ্বল। প্রতিদিনের মতই বইয়ের পাতা খুলে ও বারবার আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাল।

আমি আবার যেন নতুন করে আশা দেখতে পেলাম।

কিন্তু, আমি ভীতু, আমি ভীতু। কোনদিনই আর সাহস করে আমি এগিয়ে যেতে পারলাম না। কোনদিনই এগিয়ে গিয়ে দু একটি কথা বলতে পারলাম না।

—প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস লস্ট।

ওরা দুজনে হেলেদুলে কলেজ থেকে ফিরছিল। বন্ধুটি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে বলল, প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস লস্ট।

দোতলা বাসের সামনের সীটে বসে আছি, হু হু হাওয়ায় চুল উড়ছে। আমি রহস্যের চাবি খুঁজছি। কেন বলল ও ঐ কথা দুটি? নিছক মিলটনের কোন কলেজ-পাঠ্য কাব্যের নাম? না কি গূঢ় কোন অর্থ বোঝাতে চাইল বন্ধুটি? তবে কি ওকে সেদিনের সেই চিঠি ছুঁড়ে দেওয়ার কথা বলেছে নিভা?

আমার মন কেবলই বলতে চাইল···কি বলতে চাইল আমি জানি না, শুধু জানি, আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে তখন একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছিল।

পরের দিন কানে এল নিভা তার বন্ধুকে বলছে, প্যারাডাইস লস্টের পর কি রে?

—প্যারাডাইস রিগেন্‌ড্‌। বন্ধুটি বলল।

সুকুমার শুনে বলল, বেশ আছিস তুই, আমার কিন্তু ওসব বাল্যপ্রেম ভাল লাগে না।

অজিত বলল, ইস্কুলে পড়ে নাকি রে?

আমি রেগে গেলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, আমার গোপন দুঃখ, গোপন আনন্দ আমি শুধু আমার নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখব।

আমার ভাবতে ইচ্ছে করল, নিভা সেদিন সেই চিঠিটা কুড়িয়ে নেয় নি, কিংবা তার তাৎক্ষণিক রাগ আসলে একটা অভ্যাসের সংকোচ। ও হয়তো তার জন্যে অনুশোচনা বোধ করছে. হয়তো মনে মনে চাইছে আমি এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি।

কিন্তু আমি নিজেই যে তখন সঙ্কুচিত। এতদিন সে দূরে দূরে ছিল, কথা বলতে গেলে সে যদি কোন অপমান ছুঁড়ে দিত তা হলেও লজ্জা ছিল না। কিন্তু এখন সে আমাদের পাড়ায় উঠে এসেছে। একদিন রীতার সঙ্গে দু চারটে কথা বলতেও দেখেছি। রীতা আমার ছোট ভাগ্নী। রীতার কাছে, বাড়ির সকলের কাছে সেই অপমানের কথা যদি পৌঁছে যায়···

না, তার চেয়ে আমি আমার মনের গভীরে ভালবেসে যাব। কোনদিন নিভাকে চিঠি লিখে জানাতে যাব না, কথা বলতে চাইব না। তবু কেবলই ইচ্ছে হত নিভার সঙ্গে একটি কি দুটি কথা বলি।

কি বোকা আমি, কি বোকা আমি। হঠাৎ একদিন রাস্তায় নিভার সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে হাসল, যেন বহুদিনের পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে এমনিভাবে। আমিও হেসে ফেললাম। তারপর কি হল কে জানে. আমি এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ তাকে বললাম, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

মেয়েটি চোখ কপালে তুলল, শ্রাগ করার মত করে উন্নাসিক হেসে বলল, আমার সঙ্গে?

কথা বলতে গিয়ে আমার গলার স্বর গাঢ় হয়ে গেল। আমি বললাম, আমি শুধু নিভার সঙ্গে একদিন দেখা করতে চাই।

মেয়েটির চোখে একটু সহানুভূতি নামল।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, দেখব, বলে দেখব।

পরের দিন আমি আর নিভার মুখোমুখি হতে পারলাম না। অদ্ভুত একটা ভয় আমাকে তার কাছে যেতে দিল না। আমি অপেক্ষা করলাম, অপেক্ষা করলাম। নিভা গলির মোড়ে বাঁক নিল, আর তার বন্ধু সীতা ধীরে ধীরে একা একাই হেঁটে আসছে দেখতে পেলাম। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটে গেলাম।

সীতার গলার স্বরে সমবেদনা ঝরে পড়ল।—ও একটা·· জানেন, ওর মত দাম্ভিক আমি খুব কম দেখেছি। আপনি দুঃখ পাবেন না। সীতা আমাকে সান্ত্বনা দেবার মত করে বলল।

সমস্ত শরীর তখন লজ্জায় দুঃখে থরথর করে কাঁপছে। মাথা ঘুরছে আমার। মনে হল আমি তক্ষুণি টলে পড়ে যাব।

সীতা ধীরে ধীরে বলল, ও শুনে আমার ওপরই রেগে গেল। রেগে যাবার কি আছে আমি জানি না। সে তো দেখা করে বললেও পারত কিছু। আমি হলে বরং দেখা করে সান্ত্বনা দিতাম।

সীতার একটা কথাও তখন আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে না। সীতার কাছেই যেন আমার সবচেয়ে বেশী লজ্জা।

তারপরও মাঝে মাঝে সীতার সঙ্গে দেখা হত। দু একটা কথা সে নিজেই বলত আমি সাড়া দিতাম।

এমনিভাবে চলতে চলতেই কি করে জানি না একদিন সীতার সঙ্গে দেখা করার, কথা বলার নেশায় পেল আমাকে। আমি হয়তো সীতাকে ভালবেসে ফেললাম। সীতাকে?

আমি জানি না। তাই যদি হবে তা হলে হঠাৎ যেদিন দেখলাম নিভাদের বাড়ির ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছে, যেদিন শুনলাম, নিভার বিয়ে, সেদিন আমি আবার নতুন করে লজ্জা পেলাম কেন! কেন আমি সানাইয়ের শব্দ শুনে সারাটা দিন ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলাম।

জানি না, জানি না।

হয়তো প্রতিশোধ নেবার জন্যেই সীতাকে একদিন বিয়ে করে বসলাম।

নিভা তখন অনেক দূরে চলে গেছে, সীতার সঙ্গে তার আব কোন যোগাযোগও নেই। নিভার কথা সে কোনদিন আর তোলে নি। সে হয়তো ভেবেছিল আমিও নিভার কথা একেবারেই ভুলে গেছি।

ভুলেই গিয়েছিলাম।

আজ এতদিন বাদে আবাব সব মনে পড়ে গেল।

এতদিন বাদে? হ্যাঁ, তখন আমার কতই বা বয়স ছিল, একুশ বাইশ।

দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। দুটি বড বড় মেয়ে আর একটি বছর পনেরর ছেলে ট্রাম লাইন পার হচ্ছিল, সঙ্গে বেশ বয়স্কা একজন মহিলা। মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। নিভা, নিভা। কানের পাশের চুল সাদা হয়ে গেছে, শবীরে বয়সেয় মেদ, কিন্তু মুখটি আজও সৌন্দর্যের স্মৃতি হয়ে আছে। শুধু চোখের দৃষ্টিতে সেই লাজুকতা নেই।

নিভা চোখ তুলে তাকাল, আমার মুখের ওপর দিয়ে তার দৃষ্টি একবার পিছলে গিয়েই আবার ফিরে এল। আর সঙ্গে একমুখ হাসি নিয়ে যেন বহুকালের পরিচিতেব মত এগিয়ে এল নিভা।—অম্লানদা আপনি? কি আশ্চর্য, কেমন আছেন?

আমাব সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। আনন্দে, বিস্ময়ে।

—তোমার কথা বল। কেমন আছ?

অনর্গল কথা বলে গেল নিভা। ছেলেমেয়েদের কাছে পরিচয় দিল:— অম্লানদা, প্রণাম কর।

তারপর হঠাৎ বলল, চলুন, চলুন, এখানেই আমার বাড়ি।

আমার অনিচ্ছার যেন কোন দাম নেই। জোর করেই যেন টেনে নিয়ে গেল নিভা। জানি না, জানি না। হয়তো ভিতরে ভিতরে ওর সুন্দর বাড়ির সুন্দব ঘরগুলো আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ আমরা বসে বসে গল্প কবলাম। বাইরে তখন ভীষণ বৃষ্টি। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পডছে।

মাঝে মাঝে নিভা উঠে গিয়ে সংসারের কাজ করছিল। ছেলেমেয়েদের শাসন করছিল। বৃষ্টি থামতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল নিভা। পাশে পাশে। এক মুহূর্ত চুপ করে

থেকে ও আমার চোখের দিকে তাকাল। হঠাৎ হাসল। তারপর বলল, আমরা কেউই ভুল করি নি, না অম্লানদা।

আমি কি জবাব দিয়েছিলাম, জবাব দিয়েছিলাম কিনা জানি না।

আমার সমস্ত জীবনের বঞ্চনার ঘর যেন হঠাৎ ভরে উঠেছিল। কিন্তু নিভার সঙ্গে দেখা হয়েছে, নিভা আমার সঙ্গে কথা বলেছে, সীতাকে একবারও তা বলতে পারলাম না।

শেষরাত্রি

খসখস করে প্যাডের কাগজে বারকয়েক নিজের নাম লিখল জয়ন্তী। তারপর বার দুই পিঠে হেলান দিয়ে চেয়ারটাকে দোলনার মত দোলাল। মন আজ ওর বেশ ফুর্তি ফুর্তি। নিজের টেবিলে ফাইল-টাইল আজ অনেক আগেই গুটিয়ে ফেলেছে। না, আসলে আজ ওর মন ফাইল পুত্তর খোলেই নি।

জয়ন্তী। জয়ন্তী আবার একটা নাম না কি। কোনদিনই ওর কাছে বেশ পছন্দসই মনে হয় নি, প্যাডের কাগজে লেখা নামটার দিকে তাকিয়ে এখন, আজ, আরও খারাপ লাগছে।

মা তো তখন বেঁচে ছিল, ও ইস্কুলে, ক্লাশ নাইনে বোধ হয়, একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, ক্লাশের সবারই কত সুন্দর সুন্দর নাম, আমার কি না জয়ন্তী। বলে বোধ হয় ঠোঁট উল্টে ছিল ও। তখন ও সব ব্যাপারেই ঠোঁট ওল্টাত।

ছোটদা কাছেই ছিল, বলেছিল, কেন রে, জয়ন্তী তো বেশ ভাল নাম।

মা বলেছিল, আমাকে বলছিস কেন, তোর সেজমাসীর কাণ্ড, কোন একটা উপন্যাস ঘেঁটে বের করেছিল।

ছোটদার কথাটা এখন মনে পড়তেই ভাবল, না, জয়ন্তী নামটা খারাপ হবে কেন। কিন্তু ছোটদা কি সেলফিশ। বিয়ে করে বউ নিয়ে রাউরকেলায় চলে গেল, এখন আর খবরও নেয় না চিঠি লিখে, আর মা কি না ভেবেছিল কেউ না ছাখে, ছোটদা দেখবে আমাকে, বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

মা মারা গেছে অনেকদিন, তবু আজকাল হঠাৎ এক এক সময় মার ওপর খুব রাগ হয় ওর। মা অত খুঁতখুঁতে, অত সাবধানী ছিল বলেই তো ও এমন জবুথবু হয়ে গেছে। ছেলেদের সঙ্গে বেপরোয়া হয়ে মিশতে ভয় পায়। তা না হলে কলেজে পড়ার সময় সেই যে ছেলেটা, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকত

· জয়ন্তী একবার অতীশের দিকে তাকাল। দূরের একটা টেবিলে মাথা গুঁজে টেবিল-জোড়া পে শীটের পাতায় টিক দিয়ে যাচ্ছে অতীশ।

জয়ন্তীর বাঁদিকে আরও তিনখানা ছোট ছোট টেবিল, তারপর একটা

বিশাল জানলা। বাড়িটা অনেককালের পুরোন তো, তাই জানলা দরজা বেশ বড় বড়। কিন্তু তার ওপাশেই একটা ম্যাচবক্স প্যাটার্নের নতুন বাড়ি উঠে জানলার প্রায় সবটুকুই ঢেকে দিয়েছে। তার ছাদের ওপব থেকে মাত্র এক ফুট বাই চার ফুট চৌকো আকাশ দেখা যায়। আকাশের দিকে জয়ন্তী একবার তাকিয়ে দেখল। আজ বারবার দেখছে।

দুপুর থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। টিপটিপ বৃষ্টিকে ওর অবশ্য ভয় নেই। টেবিলেব ওপর রাখা ফোল্ডিং ছাতাটার দিকে তাকিয়ে ভরসা পেল। বেগুনী রঙের ছোপ ছোপ নক্শার ফোল্ডিং ছাতা'টা অনেক কষ্টে কিনেছিল। তেত্রিশ টাকা বলেছিল নিউ মার্কেটে, দরদস্তুর করে শেষ অবধি উনত্রিশ টাকায় পেয়েছিল। আপিসের তৃপ্তিদি দাম জিগ্যেস কবেছিল, ও বলেছে সাঁইত্রিশ। উনত্রিশ আসল দাম হলেও সে মাসে ওব খুব টানাটানি গিয়েছিল।

ছাতাটা একবার হাত দিয়ে ছোঁবাব ইচ্ছে হল বলেই হয়তো সেটাকে বাদিক থেকে এনে ডান দিকে রাখল। ছাতাই এখন ওর একমাত্র ভরসা। মারাঠী না কারা যেন স্বামীকে ছত্রপব বলে। না, ছাতা টাতা এখন আর হবে না, একটা সঙ্গী, মানে বন্ধু · ঠিক কি যে চায ও জয়ন্তী নিজেই জানে না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছে ও এখন বিয়ে কবতে চায। তার একটা সম্ভাবনা আবাব এসেছে বলেই মনটা আজ বেশ খুশী খুশী।

দিদি জামাইবাবু একটা সম্বন্ধ এনেছে, আজ সন্ধে সাতটায় দিদির বাড়িতে আসবেন ভদ্রলোক। জয়ন্তীকে দেখতে। খুঁটিযে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করেছিল ও, জামাইবাবুব সব কথাই তো রহস্য, ভদ্রলোকের চেহারাটা ওর কাছে কিন্তু একটুও স্পষ্ট হয় নি। তবে নামটা খুব ভাল লেগেছে— আলোক। তার নামটা ভাল লেগেছে বলেই নিজের নামটা পুরোন মনে হচ্ছিল।

খবরটা ও কাউকেই জানায় নি, জানায় না। তৃপ্তিদিকেও না।

তৃপ্তিদি জানে না বলেই জিগ্যেস করেছিল, কি রে জয়েন, এমন উড়ু উড়ু কেন আজ, অতীশের সঙ্গে কিছু এগিয়েছে না কি ?

তৃপ্তিদি ঠিক ধরেছেন, আর ওর মন সত্যি উড়ু উড়ু। হাল্কা এক পোঁচ পাউডার মুখে লেগে থাকার মত একটু হাসি লেগে আছে। চোখ দুটো এক ফাঁকে দূরে বসা অতীশকে ছুঁয়ে হাতলাট্টুর মত ফিরে আসতেই ওর হাসি

গেল। অতীশের কালো টুথব্রাশের মত গোঁফ অবশ্য এখন আর তেমন খারাপ লাগে না। দেখে দেখে সহ্য হয়ে গেছে।

আচ্ছা, অতীশ ওকে সেদিন কি বলতে চেয়েছিল? বলে ফেললেই তো পারত। জয়ন্তী অবশ্য রাজী হত না। কেরানীকে বিয়ে করার কথা ও ভাবতেই পারে না। তবু, শুনতে ভালই লাগত।

একবার টিপটিপ বৃষ্টির ঘষা কাঁচ আকাশের দিকে তাকিয়ে অলকার দিকে তাকাল ও। কেন যে অলকাকে সকলে সুন্দরী বলে ও বুঝতেই পারে না। আসলে বয়স তো কম, অত রঙচঙে শাড়ি পরে তাই। স্মার্ট! স্মার্ট না ছাই, আসলে চালু খুব, অতীশের সঙ্গে কেমন ন্যাকা ন্যাকা কথা বলে। আর অতীশেরই বা ওর সঙ্গে অত কথা বলার কি দরকার! বলুক গে, অতীশ সম্পর্কে ওর তো আর বিশেষ কোন দুর্বলতা নেই।

—আচ্ছা, তৃপ্তিদি, ছেলেদের নাম আপনার কি রকম পছন্দ বলুন তো।

দুপুরে মাদ্রাজী রেস্টুরেণ্টে কফি খেতে যায় ওরা সব কটা মেয়ে। সেখানে গল্প করতে করতে জয়ন্তী হঠাৎ জিগ্যেস করেছিল।

তৃপ্তিদি হেসে বলেছিলেন, অতীশ নামটা তো গ্র্যাণ্ড।

অতীশকে নিয়ে সকলে এত ঠাট্টা করত বলেই নিজের অজান্তে দু চারদিন অতীশ সম্পর্কে ও ভাবতে শুরু করেছিল। অথচ অতীশ ওর দিকে তাকালে, কিংবা কারও সঙ্গে ওকে নিয়ে কিছু আলোচনা করেছে শুনলে ও ভিতরে ভিতরে ভীষণ রেগে যেত। আবার তৃপ্তিদির কাছে সে কথা শুনতেও ভাল লাগত

কিন্তু আজ আর ওসব কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। আজ ওর সমস্ত মন পড়ে আছে দিদির বাড়িতে, ঘড়ির কাঁটায়। সন্ধে সাতটায় আলোক আসবে। আলোকের চেহারাটা ও একটু ভেবে নিতে চেষ্টা করল। আচ্ছা, ভদ্রলোকের বয়স তো বত্রিশ, জামাইবাবু বলেছিলেন, কিন্তু বয়স শুনে চেহারা কেমন হবে ভাবা যায় না কি। মার তো সবেতেই আপত্তি ছিল, জামাই-বাবুকে আর সকলের মত সঞ্জয়দা বলাতেও আপত্তি। মা মারা যাওয়ার পর একদিন বলেও ছিল, এই জামাইবাবু, এবার থেকে আপনাকে সঞ্জয়দা বলব। ব্যস্, দিদি কপাল কুঁচকে এমন ভাবে তাকিয়ে ছিল। জামাইবাবুর সঙ্গে রসিকতা দিদি একদম পছন্দ করে না। তাই রসিকতা করেও যে জিগ্যেস করবে আলোক নামের লোকটি কালো না ফর্সা তারও উপায়

ছিল না। কালোয় অবশ্য জয়ন্তীর এখন আর তেমন আপত্তি নেই। ছেলেবেলায় সকলেই তো বোকা থাকে, তা না হলে মামাবাবু যখন একবার সম্বন্ধ এনেছিলেন, কলো শুনেই ও বেঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। কি ভুলই না করেছে।

—মিস্ দাস, আমার সেই ক্রেডের দরখাস্তটা চেপে বসে রইলেন, দিন না আজ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে। দীননাথ এসে দাঁড়াল জয়ন্তীর টেবিলের সামনে।

জয়ন্তী হেসে বলল, আজ না, কাল নিশ্চয় দেব। নিজে গিয়ে সই করিয়ে আনব।

আসলে ফাইল পত্তর ছুঁতেই ভাল লাগছে না জয়ন্তীর। সমস্ত শরীর মন জুড়ে ওর এখন শুধুই একটা উৎকণ্ঠা। জানে শেষ অবধি কিছুই হবে না, তবু কেমন নার্ভাস নার্ভাস লাগছে। জয়ন্তী আবার একবার আকাশের দিকে তাকাল, বোধ হয় বৃষ্টির শব্দ শুনে। আরে, এর মধ্যে টিপটিপ বৃষ্টি বেশ চেপে এসেছে, বড বড় ফোঁটা পডছে। সেদিকে তাকিয়ে ওর কেমন ভয় ভয় করল। আরও জোরে আসবে না তো। ভয় ভয় করল, হাতের ঘডিটাব দিকে তাকাল, বৃষ্টি দেখল ঠায় তাকিয়ে থেকে, আর বৃষ্টি দেখতে দেখতে গুন গুন করে উঠতে ইচ্ছে হল। কিন্তু আপিসে বসে গুন গুন করলে আর রক্ষে আছে না কি।

বাবার অসুখের সময় পিসামা এসে মাকে বলেছিল, জয়ন্তীর আর বিয়ে টিয়ে দেবে না, না কি। কিন্তু জয়ন্তার সমস্ত শরীর চিডবিড় করে উঠেছিল সেদিন। বিয়ের কথা কেউ বললেই ও রেগে যেত। যাবে না কেন, ওর নিজেরই তো তখন বিয়ে করতে খুব ইচ্ছে হত। অথচ বাডিতে কেউ কোন আলোচনাই করত না। কিংবা ওকে এডিয়ে বাবা মা চেষ্টা করত। কিন্তু পিসীমা এমন ভাবে কথাটা বলেছিল যেন জয়ন্তীর দোষ।

—সে-সব দিনে কেউ বিয়ের কথা বললে ওর কান্না পেত। হাঁা, একবার কারা যেন দেখতে এসেছিল, সেটা বোধ হয় তৃতীয়বার, ছেলেটার মুখ দেখেই বুঝেছিল ও, ওর সেদিন রাত্রে কান্না পেয়েছিল। তারপর মা মারা গেল, বাবার অসুখ, চাকরিটা না পেলে কি যে হত জয়ন্তী ভেবেই পায় না।

—বেশ বর্ষার দিন, আজ দল বেঁধে একটা সিনেমা দেখতে যাই চল জয়েন। দুপুরে একবার তৃপ্তিদি বলেছিলেন।

জয়ন্তী এড়িয়ে গেছে। বলেছে, বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তৃপ্তিদি। আরেকদিন যাব···

আসলে কিছু একটা অজুহাত তো দিতেই হত, ও তো বলতে পারত না, আমাকে আজ দেখতে আসবে।

অতীশকে নিয়ে ঠাট্টা শুরু হওয়ার পর থেকে আজকাল ওর কেবলই ইচ্ছে হয় আপিসসুদ্ধ লোককে ও হঠাৎ একদিন অবাক করে দেয়। আচ্ছা এমন হয় না? নিজের মনকেই যেন প্রশ্ন করল। আলোক নাম তো বেশ সুন্দর, ভদ্রলোক দেখতেও যদি খুব সুন্দর হন, যদি···এখন তো পাঁচ ছশো টাকা পায়, জামাইবাবু বলেছিলেন, কিন্তু বিয়ের আগেই হঠাৎ খুব বড় অফিসার হয়ে গেলেন···বিয়ের দিন তাহলে সব কটা মুখ কালো হয়ে যাবে। তৃপ্তিদি, অলকা —অলকা খুব জব্দ হবে। আর অতীশ বুঝবে কার দিকে ও হাত বাড়াতে গিয়েছিল।

দূর ছাই, কিছু হোক আর নাই হোক, আজ জয়ন্তীর ভীষণ ভাল লাগছে। আগে কেউ দেখতে এসে পছন্দ না হওয়ার মত মুখ করে যখন চলে যেত, কিংবা বলত পরে জানাব, তখন ওর খুব খারাপ লাগত, বাড়িতে সবাইকে শাসাত এরপর কেউ এলে, দেখ, ঠিক বেরোব না। খুব রাগারাগি করত। কিন্তু এখন···জয়ন্তীর এখন আর মনেই পড়ে না কতদিন ওকে কেউ দেখতে আসে নি। সে-কথা ভেবে ওর বুকের ভেতরটা এক একদিন খাঁ-খাঁ করে উঠত। এক একদিন মনে হত আর বুঝি কেউ কোনদিন ওকে দেখতে আসবে না।

কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে, ঝরঝর বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর মনের ভিতরটা বিরক্তিতে ভরে উঠছে। আজকের দিনটা বৃষ্টি না হলেই কি চলত না। কতদূর থেকে আসবেন ভদ্রলোক—ভদ্রলোক কি, আলোক, আলোক—বেচারা বৃষ্টিতে ভিজে যাবে না তো! না, ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেল ও। এখনও পাঁচটা বাজতে অনেক দেরী, তার আগে নিশ্চয়ই বৃষ্টি থেমে যাবে। তাছাড়া জয়ন্তী বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই নয় যাবে, ওর ফোল্ডিং ছাতাখানা কতটুকুই বা বৃষ্টি বাঁচাবে। কিন্তু আলোক তো আসবে সেই সন্ধে সাতটায়। আচ্ছা, আলোকের সঙ্গে কি কেউ আসবে? কোন বন্ধু-টন্ধু কিংবা দাদা ভগ্নীপতি—তার বৌদি-টৌদি কেউ আসবে না তো! মেয়েরা কেউ এলেই বড় অস্বস্তি লাগে, বড্ড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখে, নানান কথা জিগ্যেস করে, কত সাবধান হয়ে উত্তর দিতে হয়, কোন কথার কি মানে বের করবে কে জানে !

হঠাৎ এক দমকা বাতাস ঢুকে ঘরের কাগজ পত্তর ধুলোবালি সব উড়িয়ে দিল সেই মুহূর্তে, আর আপিসসুদ্ধ সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। বাতাসটা ঝড়ো, ঠাণ্ডা। জয়ন্তী তাকাল জানলার দিকে, জানলার ছোট্ট আকাশের দিকে। আকাশে কালো কালো মেঘ, জয়ন্তীর মুখেও নামল। কি আশ্চর্য, আজকের দিনটায় এমন বৃষ্টি না নামলে কি চলত না। ভীষণ জোরে যদি বৃষ্টি আসে, রাস্তায় জল জমে যদি জ্যাম হয়ে যায়—না, জয়ন্তীকে যেমন করে হোক সাঁতটার আগে পৌঁছতেই হবে। ও ওর হাতঘড়িটার দিকে আবার তাকাল।

আলোক দেখতে যেমনই হোক, যত সাধারণ চাকরিই করুক, যদি জয়ন্তীকে পছন্দ করে, ও রাজী হয়ে যাবে। মনে মনে ভাবল জয়ন্তী। সুনন্দা ওর পাড়ার বন্ধু, সুনন্দার মা একবার একটি ছেলের কথা বলেছিলেন, হাতে পাত্র আছে একটি, বয়স একটু ···এমন কি বেশী, বল তো দেখে যেতে বলি। ব্যস্, জয়ন্তী কি স্পষ্ট করে বলবে না কি, কিন্তু সুনন্দার মা আর কোন কথা বলেন নি। অনেকদিন পরে বলেছিলেন, তোমাকে তো বলেছিলাম, তুমি সাড়া দিলে না। কি যে ভাবে সকলে, জয়ন্তী কি মুখ ফুটে সকলকে বলবে না কি !

জামাইবাবু একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আমার তো ধারণা ছিল নিজেই ঠিক করে রেখেছ।

নিজেই তো ঠিক করে রেখেছ ! যখন বয়স কম ছিল, তখন যদি মা একটু ঢিলে দিত তাহলে যেন পারত না জয়ন্তী। ছোটদাও একদিন ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বৌদির সঙ্গে গল্প করতে করতে বলেছিল, নিজে বিয়ে করাই ভাল ! শুনে সমস্ত শরীর জলে উঠেছিল ওর।

আজ কিন্তু কারও ওপর ওর কোন রাগ নেই। আজ কেমন যেন একটু একটু আশা পাচ্ছে। এখন, হ্যাঁ এখন তো ওর বয়স আটাশ, মধুপুরে যেবার বেড়াতে গিয়েছিল, সেই সদানন্দ না কি নাম, হাত দেখার ছল করে বারবার ওর হাত ধরত···সে-কথা মনে পড়তেই ফিক্ করে নিজের মনেই হেসে ফেলল ও। সদানন্দ বলেছিল, আটাশ বছর বয়সে আপনার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। বিয়ের কথা জিগ্যেস করতে পারে নি। তখন তো ও

মাত্র বাইশ, জীবনের মোড় ঘোরানোর জন্যে ও তখন ব্যস্ত ছিল না। এখন মনে হচ্ছে ওটাই বোধ হয় বিয়ে।

নিশ্চয় ওর জন্যে একটা কিছু, সুন্দর কিছু অপেক্ষা করে আছে। তা না হলে এত বছর বাদে হঠাৎ একটা সম্বন্ধ আসবে কেন।

—মিস্ দাস, বাড়ি যাবেন না, না কি! অনন্তবাবু হাঁক দিলেন, হাতে ছাতা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী উঠে দাঁড়াল। এখনও আধ ঘণ্টা বাকী পাঁচটা বাজতে। তবু বৃষ্টির জন্যে সকলেই যখন উঠে পড়েছে···জয়ন্তীর তো আজ আপিসে আসারই ইচ্ছে ছিল না।

এ কদিন খুব অস্বস্তিতে কেটেছে ওর। কেবল ভয় হয়েছে, আপিসের কারও যদি আত্মীয় হয় ঐ আলোক। যদি কোনরকমে এরা কেউ জানতে পারে! এখন ভয় হচ্ছে, যদি আলোকের ওকে পছন্দ না হয়, আর তারপর এরা কেউ জানতে পারে! জামাইবাবু ওর আপিসের নাম বলে নি, কিন্তু আজ দেখতে এসে আলোক যদি জিগোস করে।

সকলের পিছনে পিছনে জয়ন্তীও নেমে এল। ফোল্ডিং ছাতটা খুলে কাঁদা বাঁচিয়ে কোন রকমে বাসস্টপে এসে দাঁড়িয়েছে, দেখল অতীশ ওকে দূর থেকে লক্ষ্য করছে।

একদিন এই বাসস্টপেই অতীশ এসে হাজির হয়েছিল, হঠাৎ কাছে এসে বলেছিল, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

তখন কে কোথায় তৃপ্তি কি অলকা ওরা দেখে ফেলে, জয়ন্তী ভয়ে কাঠ, বলেছিল, আজ আমি ভীষণ ব্যস্ত। বলেই বাসে উঠে পড়েছিল।

অতীশ কি বলতে চেয়েছিল ওর শোনা হয় নি। তার জন্যে ওর বুকের মধ্যে এক একদিন কেমন কেমন করে। এক একদিন ইচ্ছে হয় ডেকে জিগ্যেস করে। কিন্তু আজ সে সব কোন ইচ্ছেই নেই। আজ আলোক ওর সমস্ত মন জুড়ে বসে আছে। শুধু আলোক নামটা। ও কল্পনার মধ্যে যার চেহারা আনতে পারছে না। আচ্ছা, ভদ্রলোকের কথাবার্তা কেমন? খুব সপ্রতিভ! না কি লাজুক লাজুক!

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকতেই ঝড়ো বৃষ্টি এল। আরেকটু হলেই হাতের ছাতাটা উড়ে যেত। ঐ ছোট্ট ছাতায় বৃষ্টি আটকাতে পারছে না ও। জলের ঝাপটায় সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। কি বৃষ্টি, কি বৃষ্টি!

জয়ন্তী ভেবেছিল আগে বাড়ী যাবে, তারপর বৃষ্টি থামলে সেজেগুজে দিদির বাড়িতে আসবে। কিন্তু বাসে উঠতে এত দেরী হবে, সমস্ত রাস্তা জ্যাম হয়ে এতখানি সময় পার করে দেবে ও ভাবতেই পারে নি।

দিদির বাড়িটা পার হয়ে যেতেই ও ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল ছটা বেজে গেছে। নাঃ, আর বাড়ি যাওয়া হবে না। বৃষ্টি বোধ হয় থামবে না। তাই পরের স্টপে ও নেমে পড়ল। কাদা জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ফিরে আসতে আসতে চটিটা ছিঁড়ে গেল। বিরক্তিতে সমস্ত মন ভরে উঠল জয়ন্তীর।

না, নেমে পড়ে ও ভালই করেছে। বাড়ি হয়ে দিদির বাড়ি আসতে পারত কি না তার ঠিক নেই। হয়তো দেরী হয়ে যেত। সাতটা, সন্ধে সাতটায় আলোক আসবে কথা আছে।

—ছোটমাসী, তোমার না কি আজ ইণ্টারভিউ? দিদির মেয়ে স্বপ্নি এখন ক্লাশ এইটে পড়ে। সে জয়ন্তীকে দেখতে পেয়েই হেসে উঠে বলল।

তার মা ধমক দিল। জয়ন্তী অপ্রতিভ ভাবটা হেসে ঢাকা দিল। বলল, আসব না ভেবেছিলাম জামাইবাবুর প্রেস্টিজ রাখার জন্যে আসতে হল।

জামাইবাবু কাছেই ছিলেন, হতাশ ভাবে বললেন, এই বৃষ্টিতে কি আজ আর আসবে তারা!

জয়ন্তীর হাসিটা দপ্ করে নিভে যাচ্ছিল, ও চেষ্টা করে হেসে উঠল। বলল, জানি, তবু আসতে হল। ভদ্রলোকরা যদি এসে ফিরে যান, তখন তো আমাকে আপনিই গালাগালি দিতেন।

কিন্তু জয়ন্তীর মন বলল, ওরা যেন আসে, ওরা যেন আসে।

তারপর সমস্ত ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দিয়ে ও দিদিকে বলল, চল চল চা করি আগে, জলে ভিজে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছি।

দিদি বলল, আগে কাপড়টা ছেড়ে ফেল।

একখানা আটপৌরে শাড়ি আলনা থেকে নিয়ে কলঘরে চলে গেল ও। একবার ইচ্ছে হল দিদিকে বলে তোর আলমারীর চাবিটা দে, ভাল শাড়ি একখানা বের করে রাখি।

ফিরে এসে ও রান্নাঘরে চা করতে বসল, কিন্তু মন কেবল বলতে লাগল, ওরা আসবে, ওরা আসবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে উঠে এল জয়ন্তী, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরল

আজেবাজে কথা বলল, কিন্তু ওর চোখ বরাবর ড্রেসিং টেবিলটার ওপর দিয়ে ঘুরল। মনে মনে ভাবল, দিদির ভায়োলেট শাড়িখানা পরব, ভায়োলেট টিপ আছে কি না জিগ্যেস করতে লজ্জা হল বলে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে টুকিটাকি সব তন্নতন্ন করে দেখল। তারপর হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে টেবিলের টাইম পিসটার সঙ্গে মিলিয়ে নিল।

জামাইবাবু রেডিওটা খুলে দিয়ে বললেন, কনে তো এসে হাজির এখন··

জয়ন্তী হেসে বলল, আমি তো বৃষ্টি দেখে আসব না ভেবেছিলাম, শুধু আপনার কথা ভেবে হঠাৎ নেমে পড়লাম।

জয়ন্তী এক সময় দেখল ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘরে। কাঁটায় কাঁটায়। ওর বুকের মধ্যে তখন যেন কি একটা তোলপাড় হচ্ছিল।

একটা ট্যাক্সি দাঁড়ানোর শব্দ হল, মিটারের ফ্ল্যাগ তোলার ক্রিং ক্রিং শব্দ। ওর বুকের মধ্যে আনন্দ উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল।

ও অনেকক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করল। না, জামাইবাবু ফিরলেন না। তবে কি ওদের দেখে জামাইবাবু রাস্তা অবধি এগিয়ে গেছেন!

জয়ন্তী বলল, দিদি তোর ভায়োলেট শাড়িটা দিস।

দিদি বলল, ওরা আসে কি না দ্যাখ।

জামাইবাবু ফিরে এসে বললেন, না, পাশের বাড়ির তারপর নিজেই বললেন. এলেও এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না।

জয়ন্তী তখন একটা পত্রিকার পাতায় ডুবে গেছে, ভান করল এমন যেন জামাইবাবুর কথা কানেই যায় নি কিন্তু কান সজাগ, রাস্তায় একটা হর্ন কিংবা রিকশার ঠুনঠুনও একবার আশা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

আটটা, সাড়ে আটটা বেজে গেল। বারান্দা থেকে দেখল বৃষ্টি থেমে গেছে. কিন্তু চারদিকের অন্ধকার জলে ভিজে যেন আরও অন্ধকার হয়ে গেছে।

দিদি বলল, আর রাত করিস নে জয়েন, বাবা ভাববেন।

জয়ন্তী বলল, হ্যাঁ, এইবার যাব। কিন্তু যাওয়ার কোন ইচ্ছেই হল না। এতক্ষণই যখন অপেক্ষা করেছে, আরেকটু অপেক্ষা করাই তো ভাল। যদি আলোক না, এখন আর আলোক নয়—ভদ্রলোকরা যদি এসে পড়েন। আলোক নামের ওপর এই কদিন ধরে তিল তিল করে ও একটা সত্যিকারের মানুষকে গড়ে তুলেছিল। প্রায় চোখে দেখতে পাওয়ার মত, হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পাওয়ার মত। এখন সে আবার নিছক একটি লোক—আলোক নয়।

নটার সময় জয়ন্তী বলল, চলি রে দিদি। কাল শাড়িটা পাঠিয়ে দেব।

অন্ধকারে রাস্তায় নেমে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল ও। একবার থমকে দাঁড়াল হেডলাইট জ্বলা একটা গাড়ি আসতে দেখে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে চেয়ে রইল দিদির বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়ায় কি না। না, গাড়িটা যেমন স্পীডে আসছিল তেমনি স্পীডে বেরিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল সামনেব বাসস্টপের দিকে। সমস্ত মন ভেঙে পড়েছে।

ওর হঠাৎ অতীশের কথা মনে পড়ল। অতীশ নিশ্চয় আবার একদিন ওর কাছে এসে বলবে, আমার কথাটা শোনার সময় হবে না আপনার!

আরে দূর। 'এসব কি ভাবছে ও। বাবা নিশ্চয় বসে আছে, অপেক্ষা করে আছে, কি খবব নিয়ে যায় ও তা জানবার জন্যে। বাসটা আসছে দেখে হাত তুলল, কিন্তু বাড়ি ফিরতে ওর একটুও ইচ্ছে নেই।

ফিরে গিয়ে বাবাকে কি বলবে ও। আলোকরা আসে নি, সেই কথা? বাবা শুনে নিশ্চয় ভীষণ কষ্ট পাবেন। বাবার জন্যে জয়ন্তীর ভীষণ কষ্ট হল। ওর মনে হল বাবার সামনে গিয়ে ও দাঁড়াতে পারবে না।

ওব মনে হল ও তো কিছুই চায় না, চাইবার বয়েস পার হতে চলেছে। ও শুধু সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল।

নোনা জল

অচেনা পাড়ার এই নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসে অনীশের তখনও কেমন চোর চোর ভাব। তার মত মিশুকে মানুষটারও।

দুখানা ক্ষুদে সাইজের ঘর, আর তার সামনে দু ফুট ঝুল বারান্দা, বারান্দা থেকে থুতু ফেললে রাস্তার লোকের মাথায় পড়ে। ঋণা একদিন অভ্যাসবশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গামছা নিঙড়ে কি লজ্জায় যে পড়েছিল! ছুটে পালিয়ে এসেছিল ঘরের মধ্যে। রাস্তার লোকটা উপরের দিকে চোখ তুলে কি গালাগাল দিয়েছিল কে জানে।

কিন্তু পাড়াপড়শির সঙ্গে ঋণার দু দিনেই বেশ আলাপ হয়ে গেছে। অনীশ এখনও মাথা নিচু করে রাস্তা হাঁটে, আপিস-ফেরতা কারও কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ নামিয়ে নেয়। পাড়ার দু একজন যেচে আলাপ করতে এলেও অনীশ দুটো কথা বেশী বলার চেষ্টা করে নি।

দরকার হয় নি। টুয়া একাই একশো। চার পাঁচটা দাঁত বেরিয়ে গেছে। দু একটা শক্ত শক্ত কথাও হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলে। আর অনীশ-ঋণা দুজনেই চমকানো খুশীতে হেসে ওঠে।—ওমা, কি বললি রে টুয়া? বল, আবার বল।

অনীশ হাতঘড়িটায় দম দেওয়া হয়েছে কিনা জিগ্যেস করবে বলে ডাকল, ঋণা!

অমনি টুয়া টলমল টলমল পায়ে ছুটে গেল চৌকাঠের দিকে, তারপর দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল, ইনা ডাকছে!

'ডাকছে' কথাটাও তো স্পষ্ট বের হয় না, 'ডাচ্ছে' হয়ে সেটা বেরিয়ে এল ওপর পাটির দুটো আর নীচের পাটির দুটো দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

আরেকদিন ঋণা হাঁক দিল বাচ্চা চাকরটাকে, আনন্দ, কাপটা দিয়ে যা তাড়াতাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে টুয়া বলে উঠল, আন্দ তাতাড়ি।

অনীশ আর ঋণা তো হেসে লুটোপুটি। টুয়াকে জড়িয়ে ধরে বুকে চেপে, গালে গাল ঘষে আদরে আদরে ডুবিয়ে দিল।

অনীশ আপিস থেকে ফিরলেই একটা না একটা খবর তার জন্যে অপেক্ষা করে।—এই, জান আজ কি করেছে? ঐ মোড়াটা নিয়ে দু হাতে তুলে এ-ঘর থেকে ও-ঘর অবধি গিয়েছে।

অনীশ হেসে বলছে, গামা পালোয়ান। কি রকম হাঁটে দেখ না।

—আজ কি হয়েছে জান, তৃপ্তিদি এসেছিলেন···

অনীশ আবার একটা নতুন চমকের অপেক্ষায় চোখ তুলেছিল, হঠাৎ ভোল্টেজ বেড়ে গেলে বাল্‌বের যেমন হয়, চোখে ঔৎসুক্য ফুটে উঠল—তৃপ্তিদিটি আবার কে!

ঋণা হাসল।—বাঃ রে, রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যান। বাঁদিকের শেষ ফ্ল্যাটে থাকেন···

অনীশ নিরুৎসাহ গলায় বলল, এসেছিলেন বুঝি?

—রোজই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হয়। আজ ডাকলাম।

ঋণা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, টুয়া খেলা করতে করতে বলে উঠল, মাসী কৈ।

ব্যস্, ঐ এক কথা, মাসী কৈ।

ঋণা হেসে বলল, খুব আদর করেছেন তো ওকে, বললাম, টুয়া, তোমার মাসী হয়, মাসী। সেই থেকে মাঝ মাঝেই 'মাসী কৈ'।

বলে হেসে উঠল ঋণা, অনীশও। টুয়াকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে খাটে গড়িয়ে পড়ল অনীশ, বুকের ওপর টুয়াকে দাঁড় করাল।

টুয়া অমনি বলে উঠল, পয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ পড়ে যাচ্ছি।

সেদিনও এমনি আপিস থেকে ফিরে টুয়াকে কাঁধে বসিয়ে ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে অনীশ, একটা ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

—আরে বাবুল! বলেই তার দিকে ছুটে গেল ঋণা, বলল, একা এসেছ?

পর্দার ওপার থেকে প্রথমে চটির শব্দ, তারপর গলা।—ইস্, মাকে ছেড়ে আসার ছেলে কিনা!

পর্দা সরিয়ে তৃপ্তিদিকে দেখে একটু অপ্রতিভ হয়েই সারা মুখ হাসিতে উছলে উঠল ঋণার। বলল, আসুন, আসুন।

তৃপ্তির মুখ। অনীশ দেখল, সঙ্কোচ কাটিয়ে হাসল।

—নমস্কার। আপনার সঙ্গে তো আলাপই হয় না। তৃপ্তি হাসল মিষ্টি করে।

তারপর ঋণার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাবলাম বিনা নোটিসে এসে পড়ে একটু সিনেমা টিনেমা দেখে ফেলব…

ঋণা হেসে উঠল।—সিনেমা-থিয়েটার আপনাদের, সেদিন রিক্সায় যাচ্ছিলেন কর্তার সঙ্গে…

—তোমাদের তো সব সময় গ্রীনরুম, ওঁকে তো রাস্তায় দেখি পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটেন। আরে বাবা, আমরাও এমন কিছু কুচ্ছিত না।

ঋণা আর অনীশ দুজনেই শব্দ করে হেসে উঠল।

ঋণা বলল, ইস্, আপনি তো রীতিমত সুন্দরী।

তৃপ্তি ঠোঁট ওলটাল।—ছাই! এতদিন তবু একটা গর্ব ছিল, কিন্তু এই যে যেচে আলাপ করতে এলাম, সুন্দরী হলে তো ওঁরই এতক্ষণ যেচে কথা বলার কথা।

ঋণা হেসে বলল, আমি রয়েছি যে।

তৃপ্তি ততক্ষণে টুয়াকে কোলে তুলে নিয়েছে, আর ঋণা যত হাত বাড়িয়ে বলছে, টুয়া এস, ততই সে ঘাড় নাড়ছে জোরে জোরে।—নান্না, নান্না।

তৃপ্তি চলে যাওয়ার সময় সে কি কান্না টুয়ার!

রাত্রে খেতে বসে অনীশ বলল, ভদ্রমহিলা বেশ। খুব মিশুকে।

ঋণা হেসে উঠে বলল, বেশী মেলামেশা কর না বাপু! যা মুখফস্কা কথাবার্তা ওঁর!

অনীশ বলল, ছেলেটাও বেশ শান্তশিষ্ট, কি নাম যেন?

বাবুলের নামটা ঠিকই মনে ছিল, তবু অকারণেই ও ভুলে যাওয়ার ভান করল।

ঋণা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, ভদ্রমহিলার নামটা ভুলে যাও নি তো!

প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগত। এমন সাদা মন, তার ওপর ফুর্তির তুবড়ি যেন। কিছুক্ষণ কাছে থাকলে ঋণার মনটা খুশী হয়ে ওঠে। টুয়াকে সত্যি সত্যি খুব ভালবেসে ফেলেছেন তৃপ্তিদি। কিন্তু অনীশের সঙ্গে এত ঠাট্টা ইয়ার্কির কি দরকার।

অবশ্য ঋণাই বা বলতে ছাড়বে কেন। অনীশকে ওর সন্দেহ হয় নি, তবু

যে-লোকটা ট্রাম বাসের ভিড়ের দোহাই পেড়ে সাতটার আগে ফিরত না, সে হঠাৎ সাড়ে-পাঁচটায় এসে হাজির হল যে। আর এলই যদি তো সিনেমার টিকিট কেটে আনলেও বুঝত।

অনীশ তখনও জুতোর ফিতে খুলছে, ঋণা হেসে বলল, কি ব্যাপার ?

অনীশ বুঝল, তবু হেসে বলল, মুশকিল হল দেখছি, তাড়াতাড়ি ছুটি পেলেও এখন আর বাড়ি ফেরা যাবে না। শরীর খারাপ হলেও···

—তাই বলেছি! ঋণার মুখে উৎকণ্ঠার প্রলেপ পড়ল।—সত্যি, শরীর খারাপ ?

—ও কিছু না। কথাটা গ্রাহ্য করল না অনীশ। শুধু ক্ষণিকের জন্যে মনে পড়ল বিয়ের পর কতদিন ঋণা ওর জুতোর ফিতে খুলে দিয়েছে জোর করে, শরীর খারাপ বললেই কপালে হাত ছুঁইয়েছে।

ও তাই ইচ্ছে করেই একটু শরীর খারাপের ভান করল। কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল ঋণার ওপর। ওকে এত খারাপ ভাবছে কেন ঋণা! তৃপ্তি এলে সমস্ত ঘরখানা চঞ্চল খুশীতে ভবে ওঠে, মন রজনীগন্ধা হয়ে ওঠে—এইটুকুই। আর কিছু নয়।

তৃপ্তিদি, তৃপ্তিদি, তৃপ্তিদি! চেনে বাঁধা চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তার মাঝেই থমকে থেমে পড়বে, আরে অশোক যে! আজকাল নাকি খুব এমব্রয়ডারি করা রুমাল নিয়ে ঘুরছ? কিংবা পাড়ার বাচ্চা ছেলে তমালকে : মর্নিং সেকশন ছুটি হবার সময় হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি যাও, মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে।

সুন্দর শরীর জুড়ে উচ্ছলতা। এক এক সময় তৃপ্তিদির এই গায়ে-পড়া স্বভাব ভীষণ খারাপ লাগে ঋণার, এক এক সময় হিংসে হয়। ও নিজে কেন এমন উচ্ছল হতে পারে না ?

এদিকে অনীশের তখন চোখ পড়েছে দেয়ালে ঠেসান জিনিসটার দিকে। —ওটা আবার কি রেখেছ ?

—আজ্ঞে আমি না। ঋণা জবাব দিল। আপনার ফ্রেণ্ড রেখে গেছেন।

একটু থেমে অনীশের অপ্রতিভ মুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।—ক্যারামবোর্ড। তৃপ্তিদি রেখে গেছেন।

বলতে না বলতে এসে হাজির। হাতে ফ্রেঞ্চ চকের টিন।

ক্যারাম খেলার আড্ডা বসল। সন্ধেবেলায় এসে হাজির হবে প্রতিদিন।

বেচারা ঋণার কাজ হয় না, টুয়াকে খাওয়াতে দেরি হয়ে যায়, অনীশ উঠতে চায় না।

—ভদ্রলোক সেলস্‌ম্যানের চাকরি করেন, অর্ধেক দিন কলকাতার বাইরে। ঋণা একদিন বলেছিল।

অনীশ তাই বলেছিল, বেচারা তৃপ্তিদির দোষ নেই. সময়ই বা কাটাবে কি করে।

—সময় কাটাবার জন্যে কি তুমি ছাড়া লোক নেই?

শুনে কখনও রাগে চুপ করে থাকে অনীশ, কখনও হেসে ওঠে।

কিন্তু ঋণার কাছে ক্রমশই যেন অসহ্য হয়ে ওঠে ব্যাপারটা। সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা হচ্ছিল কদিন ধরে, হঠাৎ তৃপ্তিদির সামনে অনীশ ফস করে বলে বসল, আপনিও চলুন না।

—বেশ তো, নিয়ে গেলে আব যাব না কেন।

সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠল ঋণাব, ক্রুদ্ধ চোখে একবার তাকাল অনীশের মুখের দিকে, তাবপর বলে উঠল, বাঃ রে, উনি গেলে কি করে হবে।

চমৎকার অভিনয়ে হেসে উঠল ঋণা। টুয়াকে তো ওঁর কাছেই রেখে যাব ভেবেছিলাম। উনি তো বলেছিলেন ·

তৃপ্তিও ততক্ষণে হেসে উঠেছে।—ওমা, আমিও তো বাবুলের কথা একদম ভাবি নি।

কিন্তু কতটুকুই বা বাধা দেবে ঋণা, কতবার? মাঝে মাঝে একটা বাটি হাতে এসে হাজির হত তৃপ্তি, বলত, আজ কচুর শাক রান্না করেছি ঋণা, নিয়ে এলাম তোমার জন্যে।

ইস্‌, 'তোমার জন্যে'! মুখে হাসি মাখিয়ে সমস্ত শরীর তার ভিতরে ভিতরে বিষের তীর হয়ে উঠত।

কিন্তু যেদিন অনীশের খাবার সময়ে একবাটি মাংস নিয়ে এল তৃপ্তি, অনীশের সামনে বাটিটা রেখে বসে রইল. খান মশাই খান, আপনার জন্যে স্পেশাল রান্না, সেদিন ঋণা দম আটকে ভাবল, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তৃপ্তিদির কাছ থেকে।

—কোথায় কাপড় শুকোতে দিই বল তো? বারান্দা নামেই, বর্ষাকালে এ-বাড়িতে থাকা যায় না। ঋণা মাঝে মাঝে অনুযোগ করে।

শুধু কি বারান্দায় রোদ আসে না? অনাশ বুঝতে পারে এ-পাড়ার এ-বাড়ির কিছুই যেন পছন্দ নয় ঋণার। হয়তো অনীশকেও।

অনীশ বেশ বুঝতে পারে ঋণা অসুখী হয়ে উঠছে। সন্দেহ ঢুকেছে ওর মনের মধ্যে, তাই দিনে দিনে শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে।

—শীতকালে এ-বাড়িতে থাকতে হলে দেখ, আমি ঠিক মরে যাব, টি. বি. হবে আমার। ঋণা বলে।

অনীশ কপাল কুঁচকে বলে, কি আজেবাজে বলছ! বেশ, পছন্দ না হয়, বাড়ি খুঁজে দেখি।

—তুমি যাবে এ-বাড়ি ছেড়ে? ম্লান হাসি দিয়ে অনীশকে বিদ্ধ করতে চাইল ঋণা।

ঋণাকে সত্যিই মাঝে মাঝে বড় বিষণ্ণ দেখায়। মনে হয়, ওর মাথার মধ্যে কি যেন ঘুরছে, কি যেন ঘুরছে। অসহ্য একটা যন্ত্রণা। বিষাক্ত একটা ভীমরুল।

সেদিন আপিস থেকে ফিরে চুপচাপ বসে রইল অনীশ। কান সজাগ হয়ে রইল, কখন বাবুলের আধো-আধো কথা শোনা যাবে, কিংবা তৃপ্তিদির চটির আওয়াজ। একবার ইচ্ছে হল ক্যারামবোর্ডটা পেতে ঋণাকেই ডাকে, তাহলে ঋণা অন্তত বুঝবে নেশাটা খেলার। কিন্তু একটুও ইচ্ছে হল না।

কিন্তু কৈ, আটটা তো বেজে গেল, তৃপ্তি তো এল না। তবে কী সেলস্‌ম্যান স্বামী তার ফিরে এসেছে?

—আজ তৃপ্তিদিকে খুব শুনিয়ে দিয়েছি। খাবার টেবিলে বসে কথাটা না-বলে পারল না ঋণা।

অনীশ চমকে চোখ তুলল।

ঋণা চোখ না তুলেই থালার ওপর মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল, পাড়ায় যা বদনাম তৃপ্তিদির, শেষকালে আমারও হয়তো···

অনীশের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। চোখ বুজে রাগ চাপার চেষ্টা করল। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে ছুরির ফলার মত ধারালো কণ্ঠস্বরে বলল, না বললেও পারতে।

ঋণা চুপ করে রইল।

অনীশ হঠাৎ বলল, দুর্গাপুরে ট্রান্সফার নিচ্ছি, প্রায় ঠিক হয়ে গেছে, তোমাকে বলি নি।

মুহূর্তে ঋণার সমস্ত মুখ খুশীতে ভরে উঠল, দু চোখ ঝিকমিক করে উঠল।
—সত্যি? দুর্গাপুর? উঃ, চমৎকার, মামীমা আছেন সেখানে, ব্যারেজের ধারে রোজ বেড়াতে যাব!

অনীশ হাসি হাসি মুখে তাকাল ঋণার দিকে।

তারপর বলল, বাড়িটায় সত্যি—এখানে আলো নেই, হাওয়া নেই। মুখার্জী সাহেবকে বললাম, তোমার শরীর খুব খারাপ হচ্ছে···

—সত্যি? আমার, আমার জন্যে? ঋণার দু চোখের ঝকঝকে হাসি দু ফোঁটা জল হয়ে গেল।

কিন্তু এ কি হল? এমন তো চায় নি ঋণা!

গর্বে ওর বুক ভরে গিয়েছিল সেদিন। নিজের ওপর নিজেরই রাগ হয়েছিল। অনীশ অবশ্য এমনিই একটু চাপা স্বভাবের। তাই মুখে কিছু বলে নি, অথচ ঋণার কথা বিশ্বাস করে ট্রান্সফারের চেষ্টা করেছে। ট্রান্সফার নিয়েছে।

দুর্গাপুরে এসে সেই মানুষটাই কি করে এমন বদলে গেল, ঋণা বুঝতে পারে না।

—তোমার কি হয়েছে বল তো? আপিসে কিছু? নির্বোধের মত একদিন প্রশ্ন করেছিল।

—কি আবার হবে! এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল অনীশ, এমন মুখভঙ্গী করেছিল যে, সেদিন আর কোন কথাই বলে নি ঋণা। অপমানে চোখ ঠেলে জল এসেছিল।

তবু মনকে স্তোক দিয়েছিল ঋণা, ভেবেছিল, হয়তো আপিসের কাজের চাপেই এমন বিরক্ত হয়ে থাকে অনীশ। কিন্তু দিনের পর দিন লোকটা এত দূরে সরে যাচ্ছে কেন! টুয়াকে বুকের ওপর দাঁড করিয়ে আর তো কই আদর করে না। ঋণাকেও কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। যেচে দু একটা কথা বলতে গিয়েছে ও, আর অনীশ 'হুঁ' 'হ্যাঁ' করে দু এক কথায় উত্তর দিয়েছে। আপিসের পর আপিসের বন্ধুদের নিয়ে সেই যে বেরিয়ে যায়, রাত দশটা অবধি একবারও যেন ঋণার কথ মনে পড়ে না।

টুয়ার জন্যে একটা নতুন সোয়েটার বুনতে বুনতে নিজের মনে মনেই ঋণা বলল অনীশকে শুনিয়ে শুনিয়ে, তখন ভেবেছিলাম রোজ ব্যারেজের দিকে বেড়াতে যাব!

—গেলেই পার।

যেন একটা অচেনা অজানা মানুষের প্রশ্নের জবাব দিল অনীশ।

অভিমানে অপমানে মুখ সাদা হয়ে গেল ঋণার। ও কি একা বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছে? ও কি শুধু নিজের কথাই ভাবে? অনীশের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্যে কি এক মাস কম চেষ্টা করেছে ও! তবু বোঝে না কেন অনীশ।

দমবন্ধ হওয়া কষ্ট লুকিয়ে ঋণা বলল, কান্না-কান্না গলায় বলল, কি হয়েছে তোমার বলবে তো? কেন তুমি আজকাল এত খিটখিটে হয়ে উঠছ?

উত্তেজিত হয়ে উঠল ঋণা।—কতদিন তোমাকে হাসতে দেখি নি বল তো?

অনীশ গম্ভীর আক্রোশের গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, সেকি! আমায় হাসতে দেখলেই তো তুমি হিংসেয় জ্বলে যাও।

বলেই উঠে চলে গেল অনীশ। আর সঙ্গে সঙ্গে ঋণার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অনীশের চলে যাওয়ার দিকে, সংসারকে লাথি-মারা ভঙ্গিতে ফেলা তার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল ঋণা।

কি আশ্চর্য! এতদিন এই সত্যটুকু ওর চোখে ধরা পড়ে নি?

সমস্ত রাত বিছানায় ছটফট করল ঋণা। অসহ্য এক কষ্টে। ভুল, ভুল, ভুল করেছে ও। নোংরা ঈর্ষায় জ্বলেছে ও তখন, অথচ বুঝতে পারে নি তৃপ্তিদি ওদের সংসারে এক ঝলক আনন্দ এনে দিয়েছিলেন। আর অকারণ সন্দেহে নিজেকে কষ্ট দিয়েছে ঋণা, অনীশকে কষ্ট দিয়েছে।

তৃপ্তিদি কি অনীশকে ভালবেসে ফেলেছিল? কই, চলে আসার দিনে তো মুখ দেখে মনে হয় নি। অনীশও বিচ্ছেদ-ব্যথা পেয়েছে বলে মনে হয় নি। আর তাই যদি সত্যি হত তাহলে কি অনীশ নিজেই চেষ্টা করে ট্রান্সফার নিত!

তৃপ্তিদির মধ্যে কি এক জাদু আছে, এক একজনের মধ্যে থাকে, তাই তার সংস্পর্শে এসে ঋণা নিজেও তো প্রথম প্রথম সুখী হয়ে উঠেছিল। অথচ অনীশ খুশী হয়ে উঠলে কেন সন্দেহে জ্বলেছে ও?

'আমায় হাসতে দেখলেই তো তুমি হিংসেয় জ্বলে যাও।' কথাটা কদিন ধরেই ঋণার মাথার মধ্যে ভীমরুল হয়ে ঘুরল। সত্যি। অনীশের ওপর

সত্যি অবিচার করেছে ও। কিন্তু কি লাভ হয়েছে ঋণার? তৃপ্তিদি ছিল, তবু সুখ ছিল, আনন্দ ছিল ওদের দুজনের জীবনেই। সেখান থেকে সরিয়ে এনে যেটুকু সম্বল ছিল তাও হারিয়ে ফেলেছে।

তার চেয়ে আগের জীবনে ফিরে যেতে পেলে বেঁচে যাবে ঋণা। সেই একটু সন্দেহ, একটু ভয়, কিন্তু অসীম আনন্দ। খাটে শুয়ে রবিবার দুপুরে হয়তো অনীশ আবার আগের মতই ওর চুল এলোমেলো করে দেবে। টুয়া কখন কি নতুন কথা বলল তা নিয়ে দুজনে মিলে চমকে উঠতে পারবে, হাসতে পারবে প্রাণ খুলে। অনীশ আবার টুয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরবে।

আঃ কি যন্ত্রণা! কি করে সে কথা মুখ ফুটে বলবে ও! কি করে ফেলে আসা জীবনে, ছেড়ে আসা ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে পারবে।

—শুনছ! হাত বাড়িয়ে অনীশের তন্দ্রাঘোরের শরীরটা ছুঁল ঋণা।

অনীশ বুঝতে পারল, তবু উত্তর দিল না।

—এই, এই, শোন না। বলেই কেঁদে ফেলল ঋণা. অনীশের বুকের ওপর মাথা রাখল।

অনীশ ঘুম-ভাঙা হাতখানা তুলে ঋণার মাথায় রাখতে গেল বুকের ওপর ভিজে ভিজে ঠেকতেই। কিন্তু হাতটা নামিয়ে নিল, সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে হল না।

ঋণা তবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, আমি—আমি এখানে থাকলে মরে যাব, শুনছ, তুমি আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে চল।

—কলকাতায়? অনীশ বিস্ময়ের দুটি চোখে অন্ধকার ঠেলে সিলিঙের দিকে তাকাল।

ঋণা ওর বুকের ওপর মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, আমাদের সেই ফ্ল্যাটে।

সেই ফ্ল্যাটে নয়। চিঠি লিখে দু মাস অপেক্ষা করে সেই পাড়াতেই আরেকটা ফ্ল্যাট যোগাড় হল। ট্রান্সফার নিল অনীশ অনেক চেষ্টা করে।

আর ঋণা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর হিংসেয় জ্বলবে না ও, সন্দেহের আগুনে নিজেকে পোড়াবে না।

—কি মশাই, কি অত ভাবছেন?

ঋণা ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল। অনীশ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল তাকে? না কি অন্য কিছু ভাবছিল?

চুলের কালো ফিতেটা দাঁতে চেপে, ঋণার ফর্সা গালে সেটা চেপে বসেছে, ঋণা চুল বাঁধছিল। তৃপ্তিদির গলা শুনে ফিরে তাকাল।

দেখ কাণ্ড! কপাল কুঁচকে উঠল ঋণার।

তৃপ্তিদি পিছন থেকে এসে অনীশের চুল এলোমেলো করে দিলেন।—কি, সেই ফিরে আসতে হল তো আমার টানে! জানি আসতে হবে।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলেন ভ্রূ কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

ঋণা তাকাল অনীশের দিকে, দেখল অনীশের সারা মুখ হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। অসহ্য কষ্টে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে রইল ঋণা।

কপাল আরও কুঁচকে উঠল।

ঋণা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আব বাধা দেবে না, হিংসেয় জলবে না, সন্দেহে পুড়বে না। তা হলেই ওর নিজের জীবন সুখে সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু পাবল না। ধীবে ধীবে তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় বিষাক্ত তীরের মত কথাটা ছুঁড়ে দিল।—না। আপনার ভয়েই পালিয়েছিল ও, আপনার ভয়ে!

অপেক্ষায় আছি

আরে ভাই, সে, এক অভিজ্ঞতা। এমন অদ্ভুত ঘটনা যে ঘটতে পারে ভাবি নি কোনদিন। আমার নিজের কাছেই মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্ন, স্রেফ দুঃস্বপ্ন। একটি মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলাম সেদিন রাত্তিরে, রাত বারটায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হবে না তোর। হয়তো ভাববি বানিয়ে বানিয়ে বলছি। একে মেয়ে, তার ওপর রাত বারটায়?

না, না, দুঃস্বপ্ন ঠিকই, কিন্তু, স্বপ্ন নয়। একেবারে রিয়েল ঘটনা।

তুই তো জানিস, আমার বিছানার পাশেই টেলিফোনটা থাকে। রাত্রেও আমাদের কখনও কখনও আর্জেন্ট কল আসে, তেমন ঘটলে ট্রাঙ্ক কলও। সেইজন্যেই টেলিফোনটা মাথার কাছে থাকে একটা টুলের ওপর, যাতে ঘুম-ভাঙা চোখের পাতা না মেলেই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানের কাছে আনতে পারি।

হয়েছে কি, সেদিন সারাদিন খুব খাটুনি গেছে, শরীর ক্লান্ত। খাওয়া-দাওয়ার পর শুতে না শুতে ঘুম, গাঢ় ঘুম। রাত কত তারও হিসেব ছিল না, জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তার মোড়ে যে লাইট পোস্টটা দেখা যায়, লাইট পোস্টের আলো, সেটাও পাহারা দিতে দিতে যেন লাঠিতে ভর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সমস্ত বাড়ি নিঝুম, সমস্ত পাড়া। শুধু দূরে কোথাও একটা লরী সারাচ্ছিল কেউ, বার বার স্টার্ট বন্ধ হচ্ছিল, আর মিস্ত্রীদের ঠকঠাক আওয়াজ আসছিল।

আসলে এ সবের কিছু আমি শুনতে পাই নি, কিছু দেখতে পাই নি। কারণ আমি তো তখন ঘুমে অচেতন।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল!

ঘুম ভেঙে যেতেই আমি হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

—হ্যালো।

অপর প্রান্তে মিষ্টি মেয়েলী কণ্ঠ। গলার স্বরে তার অল্প বয়সের আমেজ।

মেয়েলী গলা আমার নাম বলল।—আছেন?

আমি একসঙ্গে অনেক কথা ভাবলাম। কে হতে পারে? এই গভীর মধ্যরাতে কে ফোন করতে পারে!

বললাম, হ্যাঁ, আমিই। আপনি কোত্থেকে বলছেন?

মেয়েটির গলার স্বরের সঙ্গে ঈষৎ হাসি মিশল।—বালীগঞ্জ স্টেশন থেকে।

বিশ্বাস কর, একটুও বানিয়ে বলছি না। আমার মাথা তখন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। কারণ আমি তখন বেড স্থইচ টিপে আলো জেলেছি, উঠে বসেছি। ভাবছি, নিশ্চয়ই চেনাজানা কেউ, নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে। মানে, চোখ তখন দেয়ালে গিয়ে পড়েছে, দেয়ালঘড়িটায়। ছোট কাঁটা বড় কাঁটা তুই-ই তখন বারর ঘরে।

তুই জাস্ট একটু ভেবে দেখ অনন্ত। এ রকম কেস যদি তোর হত!

রাত বারটা, কাঁটায় কাঁটায় বারটা। চারপাশ নিঝুম, বাড়িতে সবাই ঘুমচ্ছে। হঠাৎ টেলিফোন এল। মেয়ের গলা। বুক তো এমনিতেই ধড়াস ধড়াস করে উঠবে।

—আপনি কে বলছেন? আমি গলার স্বরটাকে চেনাজানা কারও কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মেলাতে না পেরে জিগ্যেস করলাম।

মেয়েটি বলল, আমি গৌরী।

গৌরী? গৌরী নাম তো বাংলা দেশের ঘরে ঘরে, অন্তত সতেরজন, তোকে এক্ষুনি বলতে পারি অন্তত, যাদের নাম গৌরী।

আমি ভাবলাম, কোন গৌরী?

তার আগেই মেয়েটি বলে উঠল, খুব আশ্চর্য হচ্ছেন তো?

ততক্ষণে বুঝে গেছি, সাংঘাতিক কিছু হয় নি, সাংঘাতিক কিছু হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

গৌরীর গলা হেসে উঠল। বলল, দেখুন···আচ্ছা আপনি কি খুব বিরক্ত হচ্ছেন?

অনন্ত, তুই বল, রাত বারটায় ঘুম ভাঙিয়ে কেউ যদি অকারণ ফোন করে, বিরক্ত হবার কথা নয়? কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার ভয় হল, যদি বলি, তা তো একটু হচ্ছি দিদি, তাহলেই তো টুক করে লাইন কেটে দেবে। ব্যস্ তারপর সারা জীবন বুকের মধ্যে একটা রহস্য পুষে রাখ।

আমি তাই তাড়াতাড়ি উঠলাম, না না, বিরক্ত হব কেন!

গৌরী বলল, তা হলে ব্যাপারটা বলি আপনাকে। আমার না একটুও ঘুম আসছিল না।

—বাঃ, আপনার ঘুম আসছিল না বলে আমার ঘুম কেড়ে নিলেন? আমি বললাম।

আমিও তো কম যাই না, কি রকম কথাটা বললাম বল তুই? ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন না বলে বললাম ঘুম কেড়ে নিলেন।

গৌরী নামের মেয়েটি অন্যপ্রান্তে হাসল।—না, মানে হয়েছে কি জানেন, ঘুম আসছিল না তো, তাই টেলিফোন ডিরেক্টরী দেখে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আপনার নাম পেলাম…

—আর অমনি ফোন করে বসলেন? আমি বললাম।

নারীকণ্ঠ আহত ভাব দেখাল।—আপনি রাগ করছেন!

—আরে না না। ভালই লাগছে। তবে কিনা রাত বারটায়?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, বাঃ, থ্রিল্। চিনি না, জানি না, হঠাৎ রাত বারটার সময় একজনের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করছি, আমার তো ভীষণ মজা লাগছে। আপনাব বুঝি ভাল লাগছে না?

আরে শোন্ শোন্ অনন্ত, ভাল লাগছে না আবার। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ লোক, পাশের ঘরে মা, রাত্রে ঘুম হয় না, নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনছে। আর এত রসিয়ে রসিয়ে উত্তর দিচ্ছি, বুঝতেই পারছিস, কি অবস্থা। ছাড়তেও পারছি না, মন খুলে যে একটু রসিকতা করব তারও উপায় নেই।

কিন্তু একটা অশরীরী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তো বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। কৌতূহল চেপে রাখব কি করে।

বললাম, নাম কি বললেন না তো আপনার?

—আমার নাম? আমার নাম অঞ্জনা।

নাম যে এর আগে বলেছে তাও বোধহয় ভুলে গিয়েছিল। তা না হলে আবার একটা নতুন নাম বলবে কেন। অথচ আমি তখন আসল নামটা জানতে চাইছি। জানতে চাই বলেই তো আবার জিগ্যেস করলাম। যেন আসল নামটা জানলেই আর হারানো চাবি হাতড়ে বেড়াতে হবে না। কি বোকামি ছাখ। আমরা না, অনেক জিনিস জানতে চাই, জেনে কোন লাভ হবে না তবুও।

অঞ্জনা বলল, নাম জেনে কি লাভ হল বলুন।

আমি বললাম, এবার ঠিকানা বললেই জানা যাবে লাভ হয়েছে কিনা।

—ঠিকানা? মানে কোত্থেকে ফোন করছি? গোলপার্ক থেকে।

আমি হাসলাম।—বাঃ বালীগঞ্জ স্টেশনের গৌরী এবার হল গোলপার্কের অঞ্জনা।

মেয়েটি হেসে ফেলল।—আচ্ছা, আপনি কেমন লোক তাই জান না. আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি কি না বুঝতে পারছি না, আর সত্যি সত্যি নাম ঠিকানা দিয়ে দেব?

আমি বললাম, তা যদি না দেন, শুধু শুধু ফোন করেই বা কি লাভ। নাম ঠিকানা দেবেন, দেখাসাক্ষাৎ হবে…

—উঁহু, দেখা হলেই তো সব শেষ। এই যে ফোন করছি, চেনা নেই জানা নেই। মাঝরাত্তিরে…

আমি জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, আপনার কোন বয় ফ্রেণ্ড নেই? তাদের ফোন করলেই তো…

—নেই? কত। ভাবী বরই রয়েছে · বলে হাসল।

আমি বললাম, তাকে ফোন করলেই তো পারতেন।

—উরিব্বাস্, তাহলে তো রেগে গিয়ে এক্কেবারে নট্। রাত বারটায় ঘুম ভাঙিয়ে তাকে?

আমি হেসে ফেললাম।—তার ওপর এত দয়া, অথচ আমার ওপর নির্দয় হতে বাধল না?

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল।

তারপরই কট্ করে লাইনটা কেটে গেল।

আমি তখন, তোর কাছে লুকিয়ে কি লাভ বল, অনন্ত, আমি তখন একটা ভাঙা মাস্তুল। আমাদের ছাখ, এমনিতেই জীবনে কোন মজা নেই। কারও সঙ্গে আলাপও হয় না। একজন যেচে আলাপ করছে। নিজেকে বেশ একটু রোমান্টিক রোমান্টিক লাগছিল, তার মধ্যে একেবারে ভাবী বর এসে নিরাশ করে দিয়েছিল। তবু প্রাণপণে মেয়েটিকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, কট্ করে লাইনটাই কেটে গেল। কেটে দিল।

যাক, ঝামেলা চুকেছে ভেবে শুয়ে পড়তে যাচ্ছি আবার ক্রিং ক্রিং। হাত উদ্বাহু ছিলই, রিসিভার ধরলাম।

—আবার কি হল? মুখে বললাম। মনে কি বললাম, তুই তো বুঝতেই পারছিস অনন্ত।

অঞ্জনা হাসল।—কেটে দিয়েছিলাম। একটা ক্রশ কানেকশন হল, অমনি টুক করে কেটে দিলাম। আফটার অল, রাত বারটার সময় কথা বলছি, আর আমার একটা প্রেষ্টিজ আছে তো···

আমার তখন মনে হচ্ছে কি জানিস? সমস্ত কথাগুলো বানানো। আসলে কয়েক বন্ধু মিলে এ-সব করছে, কেউ ইয়ার্কি করে কেটে দিয়েছিল।

বললাম, আমার তো মনে হচ্ছে আপনার পাশে যিনি রয়েছেন তিনি কেটে দিয়েছিলেন। মেয়েটির গলা সীরিয়স হয়ে উঠল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না? আমি একা, সত্যি একা, কেউ নেই এ-ঘরে।

—ফোন কি আপনার ঘরেই থাকে? জিগ্যেস করলাম।

—না, মানে রাত্রে এনে রাখি। সব ঘরেই কানেকশন আছে। বাবা মা তো ঘুমচ্ছে, অন্য ঘরে। আমার পাশের ঘরে আমার বোন।

বললাম, যদি শুনতে পায়, কিছু বলবে না?

মেয়েটি হাসল।—শুনতেই পাবে না, তা ছাড়া বোনও তো মাঝে মাঝে করে। হঠাৎ ডিরেক্টরীতে কারও নাম দেখে ইচ্ছে হল···জানেন এভাবে আমার অনেক বন্ধু হয়ে গেছে।

অনন্ত, আমি তখন ভিতরে ভিতরে মরীয়া হয়ে উঠেছি, মেয়েটির নাম ঠিকানা জানার জন্যে, মানে সত্যি নাম ঠিকানা। কিচ্ছু লাভ নেই জেনেও, আবার হয়তো একটা মিথ্যে নাম ঠিকানাই বলবে, তবু ইচ্ছে হল জানতে।

বললাম, হাওয়ার সঙ্গে কথা বলে কি লাভ বলুন, দেখা না হলে···

মেয়েটি হঠাৎ গলার স্বর গাঢ় করল। বলল, বাঃ, কথা বলতে বলতে একদিন দেখা করতে ইচ্ছেও তো হতে পাবে। জানেন আমি যখন পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিচ্ছি, সিক্সটি ফোরে···

বললাম, সিক্সটি ফোরে পার্ট ওয়ান? বলে চুপ করে রইলাম।

—কি ভাবছেন? অন্য প্রান্ত প্রশ্ন করল।

—ভাবি নি, হিসেব করছি। মানে এখন বয়স কত,···

অঞ্জনা হেসে উঠল।—হিসেব করার কি আছে, জিগ্যেস করলেই তো বলে দিতাম। উনিশ পার হয়ে এখন কুড়ি চলছে···

আবার কট্। বুঝলি অনন্ত, কুড়ি বছর বয়েস যখন গল্পটার মধ্যে বেশ

সাসপেন্স ক্রিয়েট করেছে, তখনি আবার লাইন কেটে দিল। কিন্তু একবার যখন লাইন কেটে দিয়ে আবার রিং করেছে, তখন এবারেও নিশ্চয় করবে। আশায় আশায় বসেই রইলাম। কিন্তু লাইন কেটে দিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই কাছে কেউ আছে, খুব হাসাহাসি করছে।

অতএব, সমস্ত ব্যাপারটায় স্রেফ ফান্। কোথাও এগোবে না, গল্প হয়ে উঠবে না। মিছিমিছি ঘুম নষ্ট।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল, টেলিফোন বাজল না। আমার তখন কি খারাপ যে লাগছিল কি বলব তোকে, অনন্ত। ভাব তুই। ঘুম নষ্ট হয়েছে, এদিকে মনের মধ্যে কৌতূহল। রোমাঞ্চও বলতে পারিস। চেষ্টা করলেও তখন আর ঘুম আসবে না। কি করি, একটা সিগারেট ধরালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

—কি, শুয়ে পড়েছিলেন নাকি? আবার সেই রহস্যের গলা।

আমি হেসে বললাম, আজ আর ঘুম আসবে না। আর কোন দিনই হয়তো ঘুম আসবে না।

একটু বোধহয় বঁড়শির সুতো ছাড়তে চাইলাম।

—চমৎকার। আমারও তো ঘুম আসছে না।

বললাম, একটা স্লিপিং পিল্ খেয়ে নিন।

অঞ্জনা চটে গেল যেন।—ঘুম আসছে না বলে ফোন করছি? কক্ষনো না, আমি শুয়ে পড়লেই ঘুম আসবে। আপনি কি ভাবছেন, আমার ইনসমনিয়া আছে? ইচ্ছে হল, ফোন করলাম। ভাল লাগছে, কথা বলছি। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, তাই না?

বললাম, একটুও না। মাঝরাত্তিরে কুড়ি বছরের একটি তরুণী, সুন্দরী নিশ্চয়ই

খিলখিল হাসি।—সুন্দরী না ছাই, আমার ছোট বোন আমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী।

—আচ্ছা, দাঁড়ান, আপনার চেহারাটা ভেবে নিই। আমি বললাম।

প্রশ্ন এল একটু পরে।—ভাবলেন? কি রকম দেখতে, বলুন?

বললাম, খুব সুন্দর চুল। ঠিক বব্ নয়, কাঁধ অবধি কোঁকড়ান···

—একদম না। ঈস্, আমার সুন্দর চুল, আমি কেটে ছোট করব। বেশ, আমি ফর্সা না কালো, বলুন তো দেখি?

হাসলাম। অনন্ত, তুই হলে কি বলতিস? ছাখ, ফর্সা বলতেই ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু ভয় হল, যদি ফর্সা না হয়। কালোর মধ্যেও তো অনেক মেয়েকে খুব সুন্দরী মনে হয়। আমি যদি ফর্সা বলি, অঞ্জনা কি ভাববে? ওর ধারণা হবে আমি ফর্সা মেয়েদের পছন্দ করি। ও তখন টুক করে লাইনটা কেটে দেবে।

বললাম, কালো, কিন্তু খুব সুন্দরী।

—ঈস, কালো আমি একদম দেখতে পারি না।

আমার অবস্থা তুই বুঝতেই পারছিস। আমি বললাম, সে কি, আমি কিন্তু বেজায় কালো।

অঞ্জনা অল্পক্ষণ চুপ করে রইল! বেচারী, মনে হল বেশ ধাক্কা খেয়েছে।

বললাম, আমি কি রকম কালো জানেন?

—কার মত? জিগ্যেস করল।

আমি বললাম, এক বন্ধুর দাদার সঙ্গে কফি হাউসে দেখা করার কথা, তিনি চিনতেন না। বললাম, দেখবেন বেজায় কালো একটা ছেলে বসে আছে চিনতে অসুবিধে হবে না। তারপর কফি হাউসে বসে দেখছি এক ভদ্রলোক একটু আধটু কালো কাউকে দেখলেই তাকে কি জিগ্যেস করছেন। না পেয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে নিজেই গিয়ে বললাম, আপনি কি···তিনি কি বলে উঠলেন জানেন? বললেন, তুমি! আমি তো তোমাকে দেখেছি, ভাবি নি এত কালো।

অঞ্জনা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, আপনি না, আমার মনে হচ্ছে, ভীষণ ভাল লোক।

বললাম, তাতে কি লাভ। আপনি তো নাম ঠিকানাই দিলেন না, দেখা করা দূরের কথা।

—আপনার সত্যি খুব···

কট্। লাইন আবার কেটে গেল। আর কি বলব তোকে, অনন্ত, সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরুষ গলা শুনলাম।

ভদ্রলোক বললেন, ম্যানিয়াক মশাই, ম্যানিয়াক। রাত বারটা থেকে তিনটে অবধি সকলকে জ্বালিয়ে মারে।

আমি অবশ্য তার আগেই আঁচ করে নিয়েছি।

বেশ বুঝতে পারছি, মেয়েটির নেশা ডিরেক্টরী দেখে নাম খুঁজে খুঁজে ফোন করা। তা করুক না, আমার তো বেশ মজাই লাগছিল।

ভাবলাম, টেলিফোন অফিসে নিশ্চয় অনেকে কমপ্লেন করেছে। তাই মেয়েটি কোত্থেকে ফোন করে ধরবার চেষ্টা করছে। জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। আসলে কেউ হয়তো ট্যাপ করছে নম্বর খুঁজে বের করার জন্যে। আর ট্যাপ করলেই তো টক করে একটা শব্দ হয়, ভয়েস ভাল শোনা যায় না, তাই বারবার লাইন কেটে দিচ্ছিল অঞ্জনা। আর বলছিল, ক্রশ কানেকশন হয়েছিল

যাক্, আর নিশ্চয় ফোন করবে না। ও হয়তো জানেও যে টেলিফোন অফিস থেকে এ-ভাবে সাবধান করে দেয়। কিংবা, পুরুষ গলার কথাগুলো হয়তো শুনতে পেয়েছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছি, আবার ক্রিং ক্রিং ক্রিং। রিসিভার তুলে নিলাম।

ও প্রান্ত থেকে অঞ্জনা বলল, কি হল বলুন তো?

আমি যেন কিছুই জানি না, কিছুই শুনি নি। বললাম, কেটে দিলেন তে' আপনি।

—না না, আমি কাটি নি। কেটে গেল।

—ও।

অঞ্জনা জিগ্যেস করল, শুয়ে পড়েছিলেন?

বললাম, না। রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম, যদি আবার রি' করেন।

অঞ্জনা হেসে উঠল।

বললাম, নাম ঠিকানা দিলেন না তো?

—আচ্ছা, আপনি কাউকে গল্প করে বলবেন না বলুন।

আমি গলায় সিনসিয়রিটি ঢাললাম।—কথা দিচ্ছি।

অঞ্জনা বলল, না, বলবেন তো নিশ্চয়ই। এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার, রাত বারটায় একটি মেয়ে ফোন করছে, কিন্তু বলবেন, একটি মেয়ে···সত্যি নাম ঠিকানা আপনাকে বিশ্বাস করে দেওয়া যায়, কাউকে বলবেন না কিন্তু। মানে, আমার তো একটা···বিশেষ করে বাবাকে বহু লোক চেনে···

বললাম, কথা দিচ্ছি।

—আমার নাম রীতা। আমার বোনের নাম সীতা।

—ঠিকানা?

অঞ্জনা ঠিকানাও বলল।

অনন্ত, তুই কিছু মনে করিস না। আমি যাকে যা কথা দিই, রাখি। তুই তো জানিস। তোর কথা, আমি কোনদিন বুবুনকে বলেছি? অতএব বুঝতেই পারছিস, রীতা সীতা নাম নয়, ঠিকানাটাও ভাই বলতে পারব না।

আমি বললাম, প্রথমে ছিলেন গৌরী, বালীগঞ্জ স্টেশন। তারপর হলেন অঞ্জনা, গোলপার্ক। এবার দেখছি···

—বিশ্বাস করছেন না? প্রমাণ চাই?

বললাম, কি প্রমাণ আর দেবেন। দেখা করে অবশ্য ··

রীতা বলল, বেশ। ফোন নম্বর দিচ্ছি।

ফোন নম্বর দিল ও, আমি লিখে রাখলাম।

তারপর রীতা বলল, কাল সকালে এই নম্বরে ফোন করবেন, আমি ধরব। না থাকলে, যে ধরবে আমার নাম বলবেন, ডেকে দেবে।

আমি বললাম। আমার কিন্তু সত্যি ঘুম পাচ্ছে।

—গুড নাইট। খুব মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখবেন। বলেই হাসল, বলল, আমি কিন্তু আপনাকে একটু ঠকিয়েছি।

ব্যস। লাইন কেটে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত তিনটে।

রাত্রে তো ঘুম হলই না, পরের দিন সকালে শরীর খারাপ। সারারাত ঘুম হয় নি, তার ওপর এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

সকালে, ভাই, বিশ্বাস কর, কেবল ইচ্ছে হচ্ছিল ফোন করি। মানে যোগাযোগ রাখি, সত্যি নাম ঠিকানা কিনা প্রমাণ নিই।

টেলিফোন অফিসে নম্বর জানিয়ে খোঁজ নিতেই ঠিকানা মিলে গেল, পদবীটাও মিলে গেল। তবু ভাবলাম, সত্যি নাও হতে পারে তো। হয়তো কোন বন্ধুর নাম ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে। ফোন করলেই সে আকাশ থেকে পড়বে। অবশ্য তা হলেও ফোন করে দেখা যেত। কিন্তু ভয় হল, ফোন করলেই যদি রোজ রাত্তিরে বারটার সময় টেলিফোন বাজতে শুরু করে!

'ম্যানিয়াক মশাই ম্যানিয়াক, রাত বারটা থেকে তিনটে অবধি জ্বালিয়ে খায়।' পুরুষ গলার কথাগুলো মনে পড়ছিল বলেই সকালে ফোন করতে সাহস হল না। আবার এক একবার কি মনে হচ্ছিল জানিস, 'আমি কিন্তু আপনাকে একটু ঠকিয়েছি,' এ কথা বলল কেন? তার মানে কাছে কোন পুরুষ ছিল, সেই রিসিভার কেড়ে নিয়ে বলেছিল, টেলিফোন অফিস থেকে নয়?

রহস্য শেষ অবধি রহস্যই রয়ে গেল, ফোন করে যাচাই করতে পারলাম না।

কিন্তু আমার কেবল ভয় হচ্ছিল আবার রাত বারটায় ফোন আসবে, টেলিফোন বাজবে।

পরের দিন সত্যি বলছি, বারটা অবধি ঘুমতে পারলাম না। সে এক আতঙ্ক।

ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে বারটার ঘরের দিকে এগোচ্ছে, আর আমার বুক দুরদুর করছে। ভয় কেন, বুঝতে পারছিস না? এরকম অবস্থায় না পড়লে বুঝতে পারবি না।

আসলে মা নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিল, সারারাত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছি, বারবার ফোন বেজেছে, শুনতে তো পাবেই।

মা সেদিন বলে বসল, তোর ঘরে শোব মেঝেতে, ও-ঘরে হাওয়া নেই।

বোঝ ব্যাপার।

ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে। এক মিনিট এক মিনিট করে এগোচ্ছে, আর আমি তন্ময় হয়ে বই পড়ার ভান করে বসে আছি। এই বুঝি বেজে উঠল, এই বুঝি বেজে উঠল। আরে, রিসিভার তুলে পাশে নামিয়ে রাখলেও শান্তি আছে নাকি? একটু পরেই কি রকম ঘর্ঘর আওয়াজ হয়। সারা বাড়ির লোক ছুটে আসবে তখন।

বারটা যখন বাজল, তখন বুকে থ্রম্বসিস।

তারপর প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ব ভেবেছিলাম। ভাবলাম, আজকের রাতটা কেটে গেল।

কেটেই গেল, কিন্তু ঘুম এল না। নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না।

মনে মনে ভাবলাম, প্রতিদিনই কি আর ফোন করবে। আজ করে নি হয়তো কাল করবে।

কাল, কাল, কাল। প্রতিদিন রাত বারটা অবধি ঘুম আসে না। বসে থাকি। আতঙ্ক চেপে ঘড়ির দিকে তাকাই। রিসিভারটার দিকে তাকাই।

সে কি ভয়।

না রে, অনন্ত, মিথ্যে কথা।

প্রথম প্রথম খুব ভয় হত। মা শুনতে পাবে, কিছু ভাববে। ভয় হত রাত্রে ঘুম না হলে সকালে শরীর খারাপ লাগবে। আরও কত কি। হয়তো চেনাজানা কেউ স্রেফ নাচাতে চাইছে।

কিন্তু একটু একটু করে ভয় চলে গেল। বিশ্বাস কর অনন্ত, এখন মনে হয় বোকামি করেছি। পরের দিন একটা ফোন করলেই হত। সত্যি বলছি, অনন্ত, এখন মনে হয়, আহা, মেয়েটা আবেকবাব ফোন করুক না।

দাম

অনন্ত এবার যেন সুইচ অফ করে দোকান বন্ধ করবে কিনা ভাবছিল। আশপাশের দোকানে আলো নিভছে, তালা পড়ছে, কাঠের পাল্লাগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার বা খাঁজে খাঁজে বসানোর শব্দ, আর কর্মচারীদের দু একটা চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। অনন্ত জানে এখন আর নতুন কেউ আসবে না, বড় জোর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চেনা কেউ জিগ্যেস করবে, আমার ছবি কটা প্রিন্ট হয়েছে অনন্তদা?

দোকান নয়, স্টুডিও। অর্থাৎ ফটো তোলার দোকান। আঠাবো বর্গফুট পরিমাণ জায়গায় কাউন্টার, শোপ্লেট, স্টুডিও। ডার্করুম এক বন্ধুর বাড়ির নীচেতলাব একফালি ঘবে। মডার্ন স্টুডিওব যা কিছু চাকচিক্য আলোয় ছবিতে, কাচে আর কাঠের দেয়ালের মোলায়েম রঙটুকুতে।

কিন্তু খদ্দেবের অপেক্ষায় ছিল না অনন্ত। আসলে এই রাত আটটায় দোকানে তালা লাগিয়ে মেসে ফিরতে ইচ্ছে হয় না ওর। রাতটা অনেক বড মনে হয়। বন্ধুবান্ধব দু একজন জুটে গেলে তবু আড্ডা দিযে কিংবা নটার শোয়ে সিনেমা দেখে দিব্যি কেটে যায়। না জুটলে মেসের তক্তপোষটা অসহ্য লাগে। একটা চটুল মুখ, উদ্ধত যৌবনের শরীর।

সকালটা তবু আশায় আশায় কাটে কিংবা ডার্করুমেব কাজে।

জীবনে আছে অথচ বাত্রির বিছানায় নেই, এর চেয়ে দুঃসহ কষ্ট আব কি আছে।

উঠি উঠি করেও তাই বসে ছিল অনন্ত। হঠাৎ চোখ পডল রাস্তার ওপারে। আলো নিভে যাওযা আবছা অন্ধকারে দেখল ভদ্রলোক এদিকেই আসছেন। প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে রাস্তার দু দিক দেখলেন, গাডিটাডি আসছে কিনা, তারপর এগিয়ে এলেন।

অনন্ত প্রথমে ভেবেছিল, পাসপোর্ট সাইজ ছবি চাই হয়তো। পি এল ফর্ম, ফরেন একচেঞ্জ, ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্সের জন্যে ছোটাছুটি করার মত চেহারা। কিন্তু কাছে আসতেই তার নিজের দোকানের আলোটা ভদ্রলোকের

মুখে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কেমন যেন ভয় পেল, অস্বস্তি বোধ করল।

অনন্ত একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, এভাবে চললে কোনদিন শেষ হয়ে যাব।

নিজের অজান্তেই তাই ভদ্রলোকের প্যান্টের পকেটে ঢোকান হাতটার দিকে তাকাল, তারপর অস্বস্তিতে মেমোবুকের পাতা ওলটাতে লাগল।

পুরুসোল জুতোর চপ্ চপ্ আওয়াজটা কাউণ্টারের কাছে এগিয়ে আসতে মুখ না তুলে উপায় রইল না।

চোখ তুলে তাকাল। কান সজাগ রেখে ঠাহর করতে চেষ্টা করল পাশের দু একটা দোকানও খোলা আছে কিনা, রাস্তায় লোক আছে কি না।

—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল। নিরঞ্জন বলল।

বিস্ময়ের ভান করে অনন্ত নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকাল।—আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ। হাতটা তখনও পকেটে।

অনন্তর ভয় করতে লাগল। তবু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বলল, বলুন।

এর আগেও নিরঞ্জনকে ও কয়েকবার দেখেছে দূর থেকে, একবার বুঝি সামনা সামনি হয়েছিল এখানেই। কিন্তু এখন, এখন নিরঞ্জনের কাছে ওর নিজেকে বড ছোট মনে হল। ও নিজে ভোঁতা বাটালি দিয়ে বানানো শালকাঠের শরীর। রুক্ষ। মুখটা পাকা আতার মত কালচে আর এবড়ো খেবড়ো। নিরঞ্জন বেশ ফর্সা আর নরম। এখন ফ্যাকাশে, বিষণ্ণ—একটা চাপা রাগ, ঘৃণা, ব্যথা আব বিব্রতভাবকে অহঙ্কারের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা।

তবু কথাগুলো নিরঞ্জন এত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছিল যে, অনন্ত ভয় পেল।

নিরঞ্জন বোধহয় চেয়ারটেয়ার খুঁজল তারপর বলল, একটু সময় লাগবে।

বলে হালকা কাঠের দরজাটা ঠেলে ভিতরের ফটো তোলার জায়গাটা দেখল।—আসুন, এখানেই বসি।

যেন নিরঞ্জন ওর দোকানে আসে নি, অনন্তই আগন্তুক।

এখানে, বাইরে, রাস্তা থেকে দেখা-যাওয়া কাউণ্টারে ও তবু কিছুটা নির্ভয়

ছিল। এবার বুক তুরতুর করল। আড়চোখে একবার নিরঞ্জনের প্যান্টের পকেটটা দেখল।

কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। অনন্ত একবার ভাবল দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে।

পারল না। ধীরে ধীরে ছোট্ট কুঠরিটার ভিতর গিয়ে ঢুকল নিরঞ্জনের পিছনে পিছনে।

নিরঞ্জন কাঠের দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল। ঘরখানার চার দেয়াল, টাঙান ছবি, ক্যামেরা স্ট্যাণ্ড, ফোকাস-লাইট, দেয়ালের অগুন্তি সুইচ দেখল। তারপর ফোল্ডিং শোফা—সেটার ভাঁজ খুলে দিলে বেড্। ওটার দিকে তাকিয়ে নিবঞ্জন মুখের ক্রুর কুটিল নৃশংস হাসিটুকু চাপল।

দুখানা টুল নিয়ে মুখোমুখি বসল দুজনে।

এই লোকটার শান্তি নষ্ট করেছি আমি, হয়তো প্রতিশোধ নিতে এসেছে। অনন্ত ভাবল নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

'লোকটার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, চেহারা বদখত্, এ আমাকে অপমান করেছে', নিরঞ্জন ভাবল অনন্তব মুখের দিকে তাকিয়ে।

আজ অনন্ত ভয় পাচ্ছে, কিন্তু এতদিন নিরঞ্জনের ওপব রাগে গুমরেছে ও। দাতে দাঁত চেপে একদিন বলেছে, বল তো শালাকে সাফ করে দিই।

নিরঞ্জন সহ্য করেছে, বিকৃত হাসির আড়ালে জ্বালা লুকিয়েছে। ভেবেছে, এই বন্য মানুষটা বড় বড নখ দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড আঁচড়ে দিয়েছে।

ওরা দুজন দুটো টুলে মুখোমুখি বসে কথা খুঁজল।

অনন্ত একবার নিরঞ্জনের প্যান্টের পকেটের দিকে তাকিয়ে হাতের কাছে কিছু আছে কিনা খুঁজল। অকারণেই ক্যামেরার স্ট্যাণ্ডটা কাছে টেনে আনল হাত বাড়িয়ে।

দুটো ক্ষুধার্ত, প্রচণ্ড রাগী বাঘ যেন পরস্পরের দিকে ওৎ পেতে বসে আছে। কে আগে লাফ দেয় তারই আশঙ্কায়।

ফোল্ডিং শোফাটার দিকে তাকিয়ে অনন্তর মনে মুহূর্তের জন্যে একটু হাসি খেলে গেল, বিজয়ীর হঠকারি হাসি। পরক্ষণেই নিরঞ্জনের লুকানো হাতটার দিকে তাকিয়ে ও ভয় পেল।

নিরঞ্জনের চাপা উত্তেজনার মুখটা এক পলক দেখল অনন্ত, উদ্দেশ্যটা আঁচ করার চেষ্টা করল। এই লোকটিকে এক সময় ও ঈর্ষা করত, মনে মনে ওর

সামাজিক, আর্থিক, এমন কি দৈহিক মূল্য কষে নিয়ে নিজের চেহারা আর প্রতিষ্ঠার দারিদ্র্য সম্পর্কে লজ্জিত বোধ করত। এখন মনে মনে করুণা করে, উপহাস করে, ক্রুদ্ধ হয়, কখন কখন লুব্ধতায় উত্তেজক একখানা শরীরকে রাত্রিব নির্জনতায় না পাওয়ার ক্ষোভে সারা দেহ তার নিরঞ্জনের বিরুদ্ধে আক্রোশে চিড়বিড় করে ওঠে।

নিরঞ্জন সব জানে, সব বোঝে। তবু অক্ষম প্রতিহিংসায় শুধু দাঁতে দাঁত ঘষে। পরিত্রাণ খোঁজে, এই নিত্যদিনের যন্ত্রণা থেকে পালাবার পথ খোঁজে।

তাই, কোন ভনিতা করল না নিরঞ্জন। অপমানে লাজুক আর অসহায় চোখ দুটো তার হঠাৎ দৃঢ়তায় স্থির হল।

বিজয়ীর হাসিটা নিভে গেল অনন্তর চোখ থেকে। ও অস্বস্তিতে চোখ নামাল, ভয় সরিয়ে এক বুক দুঃসাহস নিয়ে একটা আকস্মিক কোন ঘটনার জন্যে তৈরী হল। কিংবা বজ্রাঘাতের মত কোন কথা শোনার জন্যে।

নিরঞ্জন চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, আপনার কাছে মাধবীর একটি চিঠি আছে।

অন্য সময় হলে অনন্ত বিস্ময়ের ভান করতে পারত। হয়তো চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করতে পারত, মাধবী কে? কিংবা ঘাড় বাঁকান বিস্ময়ে: চিঠি!

কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ আশঙ্কা করছিল, হঠাৎ এত সাধারণ প্রশ্নে সে নিশ্চিন্ত বোধ করল। পরক্ষণেই ভাবল, একখানা চিঠির কথা কেন জানতে চাইছে নিরঞ্জন। মাধবীর লেখা অনেক চিঠি, অনেক চিরকুটই তো তার কাছে আছে।

—আমার স্ত্রীর—কথাটা বলেই শুধরে নিল নিরঞ্জন…মানে মাধবীর লেখা একটা চিঠির কথাই বলছি। 'একটা চিঠি' বলতে গিয়ে নিরঞ্জন বোধ হয় ঈষৎ হাসল।

অনন্ত চকিতে ভাবল, কোন্ চিঠিটার কথা বলছে নিরঞ্জন। নিশ্চয় অনুপমকে যে চিঠিটা সগর্বে দেখিয়েছিল, সেই চিঠিটাই। মুখে মুখে সেই খবরটা ওর কাছে পৌঁছে গেছে? সর্বনাশ।

অনন্ত মরীয়া হয়ে উঠল।—হ্যাঁ আছে।

—আমি চিঠিটা কিনতে চাই।

অনন্ত চমকে উঠল। কিনতে চায়? চিঠি, একটা সামান্য চিঠি কিনতে চায় নিরঞ্জন?

নিরঞ্জন স্টুডিও-ঘরের এপাশ ওপাশ চোখ বুলিয়ে দেখল। না, তেমন সাজ-সরঞ্জাম বিশেষ নেই। ব্যবসা জাঁকিয়ে তোলার মত বিশেষ কিছুই নেই। অর্থাৎ এই বর্বর অশিক্ষিত লোকটার ক্যাপিটেল বলতে যদি কিছু থাকে তা শুধু ওর ভিউ-ফাইণ্ডারে আঁটা চোখ। সুতরাং টাকার লোভ আছে নিশ্চয়।

নিরঞ্জন হাসল।—মনে হচ্ছে আপনার টাকার প্রয়োজন।

অনন্ত ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝতে পারছে না। মাধবীর লেখা একটা প্রেমপত্র টাকা দিয়ে কিনতে চাইছে কেন লোকটা? মাধবীর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারার জন্যে? কিন্তু ইদানীং তো তেমন গোপনতা রাখে না মাধবী। স্পষ্টভাবে নিরঞ্জনকে বলে নি অবশ্য, কিন্তু জানতেও কিছু বাকী থাকে নি তার।

নিরঞ্জন ধীরে ধীরে প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ধরুন হাজার পাঁচেক টাকা যদি পান, শুধু একটা চিঠির জন্যে···

কথার শেষে নিরঞ্জন হাসল। —মাধবী অবশ্য জানবে না।

মাধবী জানবে না? অথচ পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাবে অনন্ত?

—পাঁচ হাজার? টাকার অঙ্কটা সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হবার জন্যেই বিস্ময় প্রকাশ করল অনন্ত।

—হ্যাঁ, পাঁচ হাজার। আমি তা হলে·· সোমবার, সোমবারেই আসব।

নিরঞ্জন উঠল। পুরুসোল জুতোর চপ্ চপ্ ধ্বনি মিলিয়ে গেল রাস্তার অন্ধকারে। মডার্ন স্টুডিওর আলো নিভে গেল।

উল্লাসের আলোটা শুধু জ্বলে উঠল মনের গোপনে। মাধবীকে ও চায় পরিপূর্ণভাবে, এমন চোরাপথে নয়। তার জন্যে আরেকটু প্রতিষ্ঠা চাই, আরেকটু স্বচ্ছল অবস্থা। দোকানটাকে তা হলে সত্যি মডার্ন করতে হবে। টাকা ঢালতে হবে কিছু।

অদ্ভুত যোগাযোগ, সেই টাকা কিনা জুগিয়ে দিতে চায় নিরঞ্জন। কিন্তু কেন? আজ আর কিছুই তো বোধ হয় জানতে বাকী নেই তার। এখন আর নিছক সন্দেহে জ্বলছে না সে।

রাত্রের সেই দৃশ্যটা ভাবতে ভাবতে হাসি পায় অনন্তর। অকারণ ভয় পেয়েছিল, ভেবেছিল মৃত্যুর মুখোমুখি বসে আছি, তার বদলে দুর্বোধ্য এক জীবনের আশা দেখতে পেয়েছে সে।

মাধবীকে বলতে হবে সমস্ত ব্যাপারটা। মাধবীও হয়তো হাসবে।

মাধবী। দুপুর বারটার পর থেকে অসহ্য অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়। কে বলে শরীর দিয়ে ভালবাসা যায় না। অনন্ত তার সমস্ত শরীরকে তখন সহস্র প্রদীপের মত জ্বালিয়ে রাখে। সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে থাকে।

মাধবী আসছে। কাউন্টারে বসে দেখতে পেল অনন্ত। অবৈধ প্রণয়ের শঙ্কিত বিব্রত পায়ে কি অদ্ভুত দুঃসাহস।

শ্লেট পাড় সাদা সিল্কের শাড়িখানায় চমৎকার লাগছে। একবার চোখা-চোখি হতেই মৃদু হাসল মাধবী। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল।

বাচ্চা নিমু টুলে বসে বসে ক্যানসেল করা ছবিগুলো বেছে পৃথক করে রাখছে।

মাধবী এসেই নিঃশব্দে কাঠের দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল।

অনন্তর সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। আগ্রহে অধৈর্য। অথচ মাধবীকে ঠিক এভাবে চায় না ও। এই বাধা, ভয়, দ্রুততা ছিন্ন করে নিঃশঙ্কভাবে পেতে চায়।

—নিমু।

নিমু ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ 'ঠিক হ্যায়'! এসে কাউন্টারে বসল।

নেহাৎই যেন নিরুদ্দেশ ঔদাসীন্যে রাস্তার এপাশ ওপাশ দেখল অনন্ত, তারপর শোপ্লেটের আড়ালে এসে কাঠের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। কাঠের দরজা বন্ধ হল।

এ-সময়টা উত্তেজনায় আগ্রহে কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ে অনন্ত। অথচ নিশ্চিন্ত দুঃসাহসিক মাধবীর শরীরের কাছে এসে দাঁড়ালেই সব ভয়, সব আশঙ্কা অস্বস্তি মুহূর্তে সরে যায়।

পাখাটা চালিয়ে দিয়ে মাধবী তখনও মাথায় ঘোমটা টেনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনন্তর অপেক্ষায়।

মাধবী হাসল, অনন্ত হাসল। তার পর—এই এই, তুমি কি বল তো? চাপা গলায় ভর্ৎসনা।—কাছে পেয়েও কেবল খাই-খাই। আকৃষ্ট মৌমাছির মত হাসল অনন্ত। মাধবী কাঠের দরজার খিলটার দিকে তাকিয়ে নিল।

অনন্ত একবার ভাবল মাধবী পর নয়, পরস্ত্রী। একবার ভাবল নিরঞ্জনের উদ্ভট প্রস্তাবটার কথা বলি। উঁহু মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে মাধবীর।

—কি কুক্ষণে যে ছবি তোলাতে এসেছিলাম। মাধবী কৌতুকে হাসল।

—তার আগে থেকেই তো ছবিটা বুকের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। অনন্ত নেহাৎই কথার পিঠে কথা বলল।

—হাতটাকে একটু ভব্য করতে শেখ। মাধবী কপট ক্রোধ দেখাল। আমি অন্যের বউ, তোমার নই।

অনন্তর মনে হল মাধবীকে ডাইনীর মত দেখাচ্ছে।

—আমার হতে তোমারই অনিচ্ছা। অনন্ত অনুযোগ করল।

—তোমার সাহস নেই। মাধবী অভিযোগ তুলল।

—তুমি সাতশো টাকা মাইনের সঙ্গে বাঁধা পড়েছ। অনন্ত বলল।

—আঃ কি হচ্ছে কি। এবার সত্যিই অনন্তকে ঠেলে সরিয়ে দিল মাধবী।

অনন্ত একটুক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর খসখসে চাপা গলায় বলল, তুমি কষ্ট পাবে।

—আমি স্বচ্ছলতা চাই না, স্বস্তি চাই। তুমি, তুমি জান না… হঠাৎ চোখে জল এল মাধবীর, জলে ভাসা দুটো বড় বড় চোখ মেলে তাকাল সে অনন্তর মুখের দিকে—আমি, আমি পারছি না ·এভাবে বাঁচতে—তুমি আমাকে বাঁচাও।

অনন্ত ওর অন্যমনস্কতায় খুশি। গুন গুন করে অস্পষ্ট ঠোঁট চাপা একটা শব্দে কি যেন বলল ও, স্তোক দিল।

—আমি, আমি ওখানে থাকতে পারব না। মাধবী চোখের জল মুছল।

অনন্ত প্রকৃতিস্থ হল, মাধবীর যন্ত্রণার স্পর্শে ওর মন নরম হল। কপালের ঘাম মুছে বলল, বেশ কিছু টাকা পাচ্ছি, ব্যবসাটা জঁাকিয়ে তুলে…দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনন্ত, বলল, আমার দিন· ·দিনরাত্রি কিভাবে কাটে তুমি জান না।

—খুব জানি। তোমাকে আমার জানতে বাকী নেই। মাধবী এতক্ষণে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কৌতুকে হেসে উঠল ও। মাথার ওপর ঈষৎ ঘোমটার আভাস দিয়ে চোখে অনুনয় আঁকল। —চলি।

—এখনই?

—এই, না। কাঠের দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে এসে এক নিমেষ থমকে দাঁড়াল মাধবী, তারপর দ্রুতপায়ে ফুটপাথে নেমে হারিয়ে গেল।

নিজের ফ্ল্যাটটায় ফিরে এসে—নিজের? —মাধবী নিশ্চিন্ত বোধ করল। বুকের দাপানিটা এতক্ষণে থেমেছে। মুখে যত দুঃসাহসের নিঃশঙ্ক ভাব

ফোটাক না কেন, এই ছোট্ট সুন্দর ফ্ল্যাটের নির্ভাবনার আশ্রয়ে ফিরে এসে তবেই হৃৎপিণ্ডের দ্রুততা স্বাভাবিক হয়।

ঘরে ফিরেই ঝি আন্নার মার খোঁজ করল, বিছানা দেখল। না, টুনু তেমনি ঘুমোচ্ছে, ক্ষুদে ক্ষুদে ফর্সা নরম হাতের মুঠিতে তোয়ালের একটা প্রান্ত ধরে। দেখে মনটা খুশি হল, হাসি পেল, ফুর্তিতে টুনুর ঘুমন্ত গালে চুক্ক করে একটা চুমু খেল, নিজের মনেই এক পাক ঘুরে নিয়ে গুন গুন করে একটা গানের কলি ভাঁজল, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নায় নিজেকে ভালবাসল। টানটান করে শাড়িটা পরল, আয়নায় দেখল, হাসল।

তারপর আবার টুনুর কাছে এসে তার হাতের মুঠো থেকে তোয়ালেটা টেনে সরাতে গিয়ে হেসে উঠল। টুনুর সমস্ত শরীরটা ঘুমের মধ্যেই ধড়মড করে নড়ে উঠেছে। মজা পেল মাধবী। টুনুটা কি বোকা। মার শাড়ির আচলটা চেপে ধরে ঘুমোয়, কিছুতেই ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না। কতদিন তাই শাড়ির ভেতর থেকে নিজেকে বের করে আনতে হয়েছে। মুঠোর মধ্যে আঁচলটা ধরা থাকলেই ভাবে মা আছে।

মাধবী একবার ভাবল, আমরা সবাই কি তাই? নিরঞ্জন ওর সিঁথির সিঁদুরটার দিকে তাকিয়ে ভেবেছে, মাধবী আছে। নিরঞ্জনের কাছ থেকে মাসের মাইনেটা নিয়ে মাধবী ভেবেছে, নিরঞ্জন আছে।

অনন্তটা বুনো বুনো। একটা বাক্স। নিজের মনেই খিলখিল করে হেসে উঠল ও। দুর্ভিক্ষের খিদে। বনমানুষ, বনমানুষ। একটু পেয়েছ কি গোগ্রাসে গিলতে চাও, আচ্ছা কি দেখে এমন নেশায় পেল মাধবীকে? মাধবী কিছুতেই বুঝতে পারে না। অথচ···ও নিজেও হয়তো বন্য, বাঘিনী। 'তোমার স্টুডিও-ঘরের এই খাটো দরজাটা···মনে হয় কি জান? একটা পাহাড়ি জঙ্গলের কাঠের পাটা সরিয়ে গুহায় ঢুকছি। আদিম মানুষদের গুহা, বড় বড় নখ, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ···' খিলখিল করে হেসে উঠল আবার।

সুযোগ পেলেই মুঠোয় ধরা শাড়ির খোলস থেকে সুরুৎ করে সরে পড়ি। আমরা সবাই। উহুঁ অনন্ত তা না। অনন্ত সরে পড়বে না। আচ্ছা, অনন্ত কি সত্যি কিছু টাকা পাচ্ছে? ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলবে?

না, অনন্তকে অবিশ্বাস করে না ও। কিন্তু এক এক সময় ঐ গোঁয়ার আর মানুষটাকে বড় ভয় হয় মাধবীর। কি সাহস বাবা। ছবি ভাল হয়

নি, ভাল হয় নি বলে কতবার যে ঘুরিয়েছিল। তখন কে জানত। না, ওর নিজেরও বারবার যেতে ইচ্ছে হত। তা না হলে যেদিন ওকে শোফায় বসিয়ে শাড়ির পাড়টা ঠিক করে দিতে গিয়ে ওকে আলতো ভাবে ছুঁল, লজ্জায় কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলেও রাগতে পারল না কেন?

আচ্ছা, ডিভোর্স নেব? ডিভোর্স? তারপর কি অনন্তকে ও···না, না, অনন্তকে ও ভালবাসে ঠিকই, তা বলে নিরঞ্জনের বদলে অনন্ত?

—তুমি, তুমি একটা ছোটলোক। ছোটলোকের মত সন্দেহ তোমার। প্রথমদিন ক্রোধে ফেটে পড়েছিল মাধবী। অথচ ও জানত নিরঞ্জনের সন্দেহটা অকারণ নয়। শুধু মনে হয়েছিল, কি এমন দোষ করেছে ও। না, কোন পাপ তো করে নি। শুধু একটা নেশা।

এখন? এখন নিরঞ্জনকেই ও সহ্য করতে পারে না। ওর একটুখানি স্বপ্নকে বাধা আর নিষেধের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছে নিরঞ্জন। তবু সহ্য করেছে। অথচ সহ্য করতে করতে কখন দূরে সরে গেছে। তারপর যেদিন আবিষ্কার করল, নিরঞ্জন একটা হিপোক্রীট, সেদিন ওর জীবন থেকেই মুছে গেল সে। না, যতক্ষণ নিরঞ্জন বাসায় না থাকে ততক্ষণই শান্তি। বিয়ের পর এক ছাদের নীচে আছি দুজনে, তাতেই কত আনন্দ ছিল। এখন চার দেয়ালের মাঝে নিরঞ্জন ফিরে এলেই নিজেকে বন্দী মনে হয়। হাঁপিয়ে ওঠে মাধবী।

হ্যাঁ, পায়ের শব্দে বুঝতে পারছে মাধবী, নিরঞ্জন ফিরছে। ঘড়ির দিকে তাকাল।

এখন মাধবী একটা হৃদয়হীন যন্ত্র। যন্ত্রের মত দু একটা কথা বলবে, প্রায় টেপ রেকর্ডের গলায়, চিঠিগুলো এগিয়ে দেবে, খাবার টেবিলে ভাতের থালা নামিয়ে দিয়ে শুষ্ক স্বরে বলবে, আচার আছে বাটিতে। কিন্তু খাবার টেবিলে বসে নিরঞ্জন উসখুস করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমাদের একটা ফয়সালা করে ফেলা উচিত।

ভাতের ওপর ডালের বাটিটা উপুড় করে ভাত মাখতে লাগল মাধবী। চোখ তুলল না।

—আমি এভাবে চলতে দিতে পারি না। স্পষ্টভাবে প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করল নিরঞ্জন।

—অর্থাৎ? মাধবী মুখ না তুলেই বলল।

—আমি ন্যাকামি পছন্দ করি না, তুমি সবই বুঝতে পারছ। ধীর স্থির কণ্ঠে বলল নিরঞ্জন।

চারপাশের ফ্ল্যাট, সামনের রাস্তা—সব নিশ্চুপ হয়ে গেছে। আলো নিভে গেছে সব জানালায়। শুধু বড় রাস্তায় ট্রামের হুস্‌-স্‌ একটানা একটা শব্দ এল। নিস্তব্ধতার মাঝে তাই নিরঞ্জনের ঠাণ্ডা উত্তাপহীন চাপা গলার কথাগুলো ভীষণ নৃশংস ঠেকল মাধবীর কানে।

ও নিজেও ভিতরে ভিতরে নৃশংস হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল কি চাও তুমি ?

—অসতী স্ত্রীকে সকলেই যা করতে চায়।

দপ্‌ করে জ্বলে উঠল মাধবী। জ্বলন্ত দুটো চোখ তুলে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নিরঞ্জনের দিকে। ওর মুখেব ওপর নিরঞ্জন যেন একটা অপমানের থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে। মাধবীর গলার স্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পেল।—তুমি, তুমি একটা নীচ, ইতর·· তুমি, তুমি ভাবছ আমি কিছু জানি না ? আমি কিছু বুঝি না ? সুধা আমাব মাসতুতো বোন, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট···তোমার, তোমার নিজের ওপর ঘেন্না হওয়া উচিত।

—চুপ কর, পাশের ফ্ল্যাটে শুনতে পাবে।

—শুনুক। লজ্জা শুধু লোকে শুনবে।

—আমি ডিভোর্স চাই। নিরঞ্জন শান্ত গলায় বলল।

—তুমি সুধাকে বিয়ে করাব সুযোগ খুঁজছ।

—সুযোগ তুমিও কম পাবে না।

—আমি কোন ইতরেব সঙ্গে কথা বলতে চাই না। বলতে হয় কোর্টে গিয়ে বলব। সশব্দে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাধবী। বাসনের ঝনঝন শব্দ হল।

চেয়ার টানার শব্দে, বাসনের শব্দে টুনুর ঘুম ভেঙে গেল। কেঁদে উঠল ও।

মাধবী টুনুর কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, আমার আর টুনুর মাসোহারা দি[illegible] কত ফুর্তিতে থাক দেখব।

সলিসিটরের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ঐ একটা কথাই মাথার মধ্যে হুল ফুটিয়েছে। এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে চায় নিরঞ্জন।

এক সময় মাধবীকে ও ভালবাসত। মাধবী ওকে। তারপর তিল তিল

সন্দেহ থেকে অসীম ঘৃণা। মাধবীর কথা মনে পড়লেও সমস্ত শরীর রাগে রী রী করে ওঠে। মাধবীর উপস্থিতি একটা দম আটকানো বোবা কান্না। এই যন্ত্রণা থেকে চিরকালের জন্তে পালাতে চায় ও।

সুধাকে ওর নতুন করে ভাল লাগছে। তাকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়।

—অপরাধটা যদি স্ত্রীর না হয়, অ্যালিমনি গুণতেই হবে সারা জীবন।

—সারা জীবন?

হ্যাঁ, মাধবীকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে নিরঞ্জন, অত্যাচারে অত্যাচারে তাকে ডিভোর্স নিতে বাধ্য করতে পারে কিংবা খাবার টেবিলে বসে একটা বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে এই অসহ্য অবস্থা থেকে রেহাই পেতে পারে, কিন্তু…

মাধবী তার স্ত্রী, তার সন্তানের মা। অথচ মাধবীর শরীরটার দিকে, তার উগ্র বেশবাসের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লে মাধবীকে বিশ্রী নোংরা লাগে নিরঞ্জনের। গা ঘিন ঘিন করা ক্লেদাক্ত, আর অশুচি।

যাকে ঘৃণা করে, যার উপস্থিতিটুকু জ্বালা ধরায়, পাশের ফ্ল্যাটের ধূর্ত বেড়ালটার মত যাকে উপেক্ষা করেও চোখে চোখে রাখতে হয়, হৃদয়ের অনুভূতিতে কোথাও যার অস্তিত্ব নেই সেই নোংরা শরীরটার লোলুপতার কাছে মাসে মাসে মাসে একটা মোটা অঙ্ক তুলে ধরার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চায় নিরঞ্জন।

সব স্মৃতি মুছে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়।

সলিসিটর নির্বিকার কণ্ঠে বলেছেন, তা হলে একটা প্রমাণ চাই, ছাট শী ইজ নট ফেথফুল টু ইউ। আছে আপনার কাছে?

আছে। নিরঞ্জন জানে, নিরঞ্জন জানতে পেরেছে সে প্রমাণ আছে। অনন্তর কাছে। খবরটা কি অনন্তই কায়দা করে তার কানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল? বেশ একটা মোটা টাকা হাঁকবার জন্যে?

কাঠ-কাঠ ঐ বিচ্ছিরি চেহারার লোকটাকে মাধবী নিশ্চয় বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারে না। আর মাধবী! অনন্তর কাছে মাধবী নিশ্চয় অনেকের মধ্যে একজন। কয়েক হাজার টাকার চেয়ে দামী নয়।

অনন্তকাল ধরে একটা পাহাড়প্রমাণ টাকা গুণে দিতে পারবে না নিরঞ্জন। এই দুশ্চিন্তা, এই বিষাক্ত কাঁটাটা বুকের ভেতর বয়ে বেড়াতে পারবে না।

—সুধা, তুমি কি বল?

—লোকটা এক নম্বরের বজ্জাত। চাপ দিয়ে তোমার কাছে বেশী টাকা আদায় করতে চায়। কিন্তু সেও ভাল, অতীতকে মুছে ফেল তুমি, আমাদের সামনে ভবিষ্যৎ আছে।

—আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে চেয়েছি। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর ইনসিওরেন্স থেকে ধার করে ওকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। শুধু ঐ চিঠিটা পেলেই……

নিরঞ্জন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। না, আজ আরেকবার দেখা করবে অনন্তর সঙ্গে। শেষ কথা বলে আসবে। নিশ্চয় চিঠিটা বেচতে রাজি ও, তা না হলে মাধবীর কাছে সমস্ত গোপন রেখেছে কেন? না কি সব জেনেশুনেও চুপ করে আছে মাধবী। মজা দেখছে।

রাত আটটা বেজে গেছে। এই সময়টাই নির্জন। এখনই দেখা করার, ধীরে সুস্থে কথা বলার সুযোগ।

নিরঞ্জনকে দূর থেকে দেখতে পেল অনন্ত। উঠে পড়ল, ইশারায় নিরঞ্জনকে অপেক্ষা করতে বলে দোকানের আলো নেভাল, দরজা বন্ধ করল, তালা ঝোলাল। শালার ইন্সপেক্টরগুলোকে বিশ্বাস নেই, নগদা নগদি পাঁচটা টাকা দিয়ে বিদেয় করতে হবে হয়তো।

—চলুন কোথাও একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক্। অনন্ত বলল।

একজন প্রবঞ্চক, আরেকজন প্রবঞ্চিত। নিরঞ্জন ভাবছে, ভাগ্যের পরিহাস ছাখ, এই লোকটা আমার স্ত্রীকে অপবিত্র করেছে, ব্যভিচারিণী করেছে, আমার কাছ থেকে তার মন কেড়ে নিয়েছে। সে এখন আমার কাছে একটা ঠাণ্ডা জড়পদার্থ। আমার উচিত একটা ধারালো ছুরি এনে ওর পিঠে গেঁথে দেওয়া। কিংবা একটা একটা কার্তুজ নষ্ট করা। তার বদলে, আমি এখন হেসে, অনুনয় করে, লোকটার মন ভেজাতে চাইছি। আমি ওর বন্ধু হয়ে উঠতে চাইছি।

অনন্ত ভাবছে, মজা ছাখ, এই লোকটাকে আমি এখন আঙুলের ডগায় নাচাতে পারছি। এই লোকটা—অফিসে যার দাপট আছে, আইনে যার স্ত্রীর ওপর অধিকার আছে। এই লোকটাকে প্রথম প্রথম কি ভয়ই না পেতাম। এখনও পাই। মাধবী ভয় পায়, আমি ভয় পাই। এর ভয়েই মাধবীকে কোনদিন নিশ্চিন্তে পেলাম না, পেয়েছি শুধু বুক ছুরুছুরু আশঙ্কার মধ্যে। অথচ এখন আমরা দুজনে লেনদেনের ব্যবসায় বন্ধু হবার চেষ্টা করছি।

নিরঞ্জন আর অনন্ত একটা চায়ের দোকানে এসে ঢুকল। অন্য সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, অন্ধকার রাস্তা, রাস্তা কিছুটা নির্জন। চায়ের দোকানটাও বন্ধ হব হব। বয়গুলো কেউ বিরক্ত হল ওদের দেখে, কেউ নির্বিকার বসে রইল।

দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে খদ্দেরহীন দোকানটার এক কোণে গিয়ে টেবিলের দুপাশে মুখোমুখি বসল দুজনে।

অনন্তর হাসি পেল। প্রথমদিন ওর স্টুডিওর গুহাঘরে যেদিন মুখোমুখি বসেছিল ওরা, সেদিন কি ভয়ই না পেয়েছিল অনন্ত। বারবার নিরঞ্জনের পকেটে গোঁজা হাতটার দিকে তাকাচ্ছিল। সেদিনের কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে। আজও তেমনি পকেটে হাত গুঁজেই এসেছে নিরঞ্জন, যেন অনন্তর একটা কথায় ওই পকেট থেকে কয়েকটা হাজার টাকার নোট বের করে দেবে। আসলে পকেটে হাত রেখে হাঁটা নিরঞ্জনের অভ্যাস। অনন্ত এ কদিনে বুঝে গেছে।

—আপনি কি তাহলে ব্যাপারটা ভেবে দেখলেন? নিরঞ্জন ধীরে ধীরে জিগ্যেস করল।

—সামান্য একটা চিঠি নিয়ে আপনার কি লাভ বলুন তো। অনন্ত হাসল—যেন তার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোটা দাম দিয়ে একটা রিজেক্টেড ছবি কিনতে এসেছে।

অনন্ত ভেবেছে, ভেবেছে এ কদিন। মাধবীকে বলতে গিয়েও থেমে গেছে।

ওর কানের কাছে মাধবী যেন ফিসফিস করে বলে উঠেছে, সেকি, তুমি চিঠিটা বেচে দেবে? বেচে দেবে? তুমি তো আমাকেও কোনদিন···

—আমি মুক্তি চাই, আমি মাধবীকে ভুলে যেতে চাই। সারাজীবন ধরে প্রতি মাসে সে আমাকে কাঁটার মত একবার করে বিঁধে যাবে···

—টাকাটা খুবই কম। অনন্ত লোকটাকে যেন করুণার চোখে দেখছে।

—বেশ, ছ হাজার। ছ হাজার দেব। লোভে চকচক করল অনন্তর চোখ দুটো। তবু নিরঞ্জনের কাছে সেটা প্রকাশ করল না। মনে মনে এঁচে নিল, এই টাকাটায় স্টুডিওটা কিভাবে আরও আধুনিক করে তোলা যায়। একটা ভাল ক্যামেরা, বড় সাইজ এনলার্জার একটা, ডার্করুমের টুকিটাকি,

আর, হ্যাঁ, ডার্করুমা অ্যাসিস্টেন্ট একজন মাইনে করে রাখলে অর্ডার মত খেলাধুলো, সভা সমিতির ছবি তুলতেও ও বেরোতে পারবে।

—আমার কিন্তু আরও বেশি কিছু টাকার দরকার। অন্তরঙ্গ হাসি হাসল অনন্ত।

—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার বেশি টাকা দেওয়ার মত সঙ্গতিই নেই। অনুনয়ের স্বরে বলল নিরঞ্জন। ভিতরে ভিতরে ও জ্বলে উঠতে চাইল। ব্যাটাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাথির পর লাথি মারতে ইচ্ছে হল। প্রথম যেদিন সন্দেহ হয়, সেদিনও এমনি একটা ইচ্ছে হয়েছিল। অনন্ত না, মাধবীকে।

—সাত হাজার টাকা যদি দেন আমি ভেবে দেখতে পারি। অনন্ত উপেক্ষার গলায় বলল।

—সাত হাজার? নিরঞ্জন চমকে উঠল।

—হ্যাঁ, সাত হাজার। গলার স্বর কঠিন হল অনন্তর।

অনন্ত ভাবল, মাধবী যদি এ দৃশ্য দেখত, খুব মজা হত। ওর স্বামী, যে স্বামীর ভয়ে ওর এত লুকিয়ে লুকিয়ে আসা, থরথর করে কাঁপা, তার মুখটা যদি একবার দেখত এখন!

নিরঞ্জন ভাবল, সভ্য মানুষ মানে কি কাপুরুষ! সুধাকে নিয়ে একটা ভবিষ্যৎ গড়ার লোভ, আর আইনের ভয় আমাকে কত অসহায় করে দিয়েছে। তা নইলে আমি এখনই কিংবা অনেক আগেই লোকটাকে খুন করতাম। রাগে রী রী করে উঠল ওর সারা শরীর, আঙুলগুলো নিসপিস করল। এখনই ব্যাটার টুঁটিটা চেপে ধরলে···

—অনেক চেষ্টা করে তবে হয়তো ছ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারব। নিরঞ্জনের মুখটা করুণ দেখাল।

অনন্ত ফ্যাক ফ্যাক করে হাসল।—আরও এক হাজার নয় ধার করলেন।

অসহ্য কষ্টে, অসহ্য রাগে, অসহ্য অনুশোচনায় চোখ বুজে কপাল কুঁচকে বসে রইল নিরঞ্জন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।—বেশ তাই।

কদিন ধরে মাধবীকে বলি-বলি করেও বলতে পারে নি অনন্ত। কি জানি, লোভ দেখিয়ে শেষ মুহূর্তে নিরঞ্জন সরে পড়বে কি না।

কয়েকটা দিন সময় নিয়েছিল সে, টাকাটা জোগাড় করতে হবে তো।

আজ বিকেলে চিঠিটা নিয়ে উকিলের কাছে যাবার কথা, দেনাপাওনা সেখানেই মিটবে।

চিঠিটা প্রথম দিনই খুঁজে বের করে রেখেছিল, আজ বুকের কাছে রেখেছে। ঠিক সেই প্রথম যেদিন পেয়েছিল চিঠিটা—মাধবী তখন শিলং বেড়াতে গেছে—ওঃ, সে কি রোমাঞ্চ। বারবার চিঠিটা পড়েছে অনন্ত, যত্ন করে রেখেছে বুকপকেটে, আর মাধবীর জন্তে ছটফট করেছে।

আজ আবার চিঠিটা একবার পড়ল। কৌতুকে হাসল, মাধবীর জন্তে ছটফট করল, চোখ বুজে মাধবীর শরীরটা মনে মনে গড়ে নিল।

দুপুরে কাউণ্টারে বসে বসে ও বারবার রাস্তার দিকে তাকাল।

আজ সকাল থেকেই উত্তেজনায় কাঁপছে ও। সাত হাজার, সাত হাজার টাকা।

অনন্ত হাসল। মাধবীকে এবার একবার বলা দরকার। মাধবী শুনে বোধ হয় খুশিই হবে। এই টাকায় মর্ডান স্টুডিওর চেহারা পাল্টে যাবে।

মাধবী আসছে, চোখ পড়ল অনন্তর। তেমনি ভয়ে ভয়ে শঙ্কিত চাউনি। মনে মনে হাসল অনন্ত, এখন আর ভয় পাবার কি আছে। কাঠের দরজা ঠেলে গুহাটার ভেতরে ঢুকে পড়ল মাধবী। বাঃ, মাধবীকে আজ খুব সুন্দর লাগছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল অনন্ত। মাধবী হাসল।

চিঠির কথাটা, সাত হাজার টাকা, নিরঞ্জন—অনন্ত এক নিমেষ ভাবল, মাধবীকে এই মুহূর্তে বলব?

ছন্দিত লতার মত আবেশে শিথিল একটা শরীর একটা অসহায় কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলল, জান, ও আমাকে ডিভোর্স করব বলে ভয় দেখাচ্ছে।

অনন্ত হাসল।—ভয়ের কি আছে? আমরা বিয়ে করব।

—বিয়ে? তোমাকে? হঠাৎ দু হাতে অনন্তকে ঠেলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল মাধবী।—লোকে বলবে কি! বাবা মা···বন্ধুরা, ওরা··· কেন, তুমি তো সবই পেয়েছ—হাসল মাধবী। মনে মনে ভাবল, ঐ লোকটার···অনন্তর পাশে পাশে থাকবে ও ওর স্ত্রী হয়ে? না, না, প্রাণ থাকতে ও তা পারবে না, শুধু ভালবাসবে, গোপনে ভালবাসবে—

তার উচ্ছল হাসির মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনন্তর সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আলিঙ্গনের দুটো রূঢ় হাত কেমন অবশ হয়ে গেল।

অনন্ত একটু আগে ভেবেছিল চিঠির কথা, সাত হাজার টাকা, নিরঞ্জনের অনুনয় —সব বলবে, দুজনে প্রাণ খুলে হাসবে। বলবে, নিরঞ্জনের মুখটা কেমন দেখাচ্ছিল। এখন দেয়ালের আয়নাটাকে ভয় পেল অনন্ত। ওর মুখটা অপমানে কতখানি করুণ আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, দেখতে ইচ্ছে হল না।

—লোকে বলবে কি! কথাটা মাথার মধ্যে হুল ফোটাল।

এই কদিনে নিরঞ্জন—যাকে ওরা ভয় পেত, সে অনন্তর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিল। এখন অনন্তর মনে হল, নিরঞ্জন সব হারিয়েও অনন্তর বুকের ওপর পা দিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

না, মাধবীর ওপর লোভ হচ্ছে না অনন্তর। ওর মাংসল লুব্ধতার ওপর আর কোন আগ্রহ নেই। সাত হাজার টাকা, সাত হাজার টাকা চায় শুধু। মডার্ন স্টুডিওর চেহারাটা বদলে দিতে চায়।

—কই আপনি তো গেলেন না উকিলের কাছে?

একটা দোকানও তখন বন্ধ হয় নি। আলো—আলো। রাস্তায় ভিড়, দোকানে দোকানে। চিৎকার হট্টগোল।

নিরঞ্জনের মুখের ওপর আলো পড়েছে। নিরঞ্জনের হতাশ অসহায় মুখটার দিকে তাকাল অনন্ত।

প্যাণ্টের পকেটে হাত রেখে ঠিক তেমনি ভাবে এগিয়ে এল নিরঞ্জন।— কই, আপনি তো গেলেন না উকিলের কাছে?

অনন্ত হাসল।—চিঠিটা এনেছি। বুকপকেট থেকে দীর্ঘ সাতটা রঙিন পাতার চিঠিখানা বের করল।—এই চিঠিখানা। অনন্ত আবার হাসল, তারপর বলল, এটা আমি বিক্রী করব না।

বলে আস্তে আস্তে, নিরঞ্জনের চোখের সামনে চিঠিটা দু ভাঁজ করে ছিঁড়ল, আবার ভাঁজ করল, আবার ছিঁড়ল, আবার আবার।

———